গল্পের

সুব্রত চৌধুরী চিত্রিত

ভালবাসা

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

চিরন্তন মানব-মানবীকে

গল্পের ভালবাসা

কুড়িজন লেখক, কুড়িটি গল্প। আর, সব গল্পই ভালবাসার। এটুকু বললে অনেকটা বলা হয়, সবটা নয়। নয় এ-কারণে যে, বিষয় এক হলেও, তার বিভঙ্গ, বিন্যাস, পটভূমি একেবারেই আলাদা। 'ভালবাসা' শব্দটি দিয়ে যে প্রতিটি গল্পকেই ধরা যায়, তা-ও নয়। মানব-মানবীর সম্পর্ক, তার টানাপোড়েন, জটিলতা, গভীরতা অনেক ক্ষেত্রেই নিছক ভালবাসাকে অতিক্রম করে ডানা মেলেছে অন্যদিকে। কখনও ঈর্ষা, কখনও সন্দেহ, কখনও যৌনতা, কখনও একেবারে অশরীরী আবেগ, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা, শূন্যতা নানাভাবে আলো ও ছায়া ফেলেছে গল্পগুলির গায়ে। এবং, সব মিলে, গোটা সংকলনটি হয়ে উঠেছে এক অবিনশ্বর, রহস্যময় সম্পর্ক-সংকলন।

মানব-মানবীর প্রেম এবং প্রেমহীন সম্পর্ক শিল্প-সাহিত্যের শাশ্বত অবলম্বন। বাংলা গল্প একেবারে সূচনা থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে সেই সম্পর্কের ডালপালায়, বিচিত্র ও গভীরতর পরিকল্পনা ও তার সুবিন্যস্ত প্রকাশে। এই সংকলনে আমরা তার প্রতিভাস ঘটাতে চেয়েছি। সমরেশ বসু থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য পর্যন্ত প্রজন্মের দূরত্বে একটি চিরকালীন বিষয় চোখ, অনুভব ও বর্ণনায় কতটা বিস্তারিত হয়েছে, তা ধরে রাখতে চেয়েছি এক-মলাটের ভিতর। পাঠক-পরিচিত সংকলনস্থ এইসব লেখক যে একে অন্যের থেকে একেবারেই আলাদা, তা কুড়িজন লেখককে পাশাপাশি ছেপে আমরা বুঝতে চেয়েছি বাংলা গল্পের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতিও।

চির-পুরনো অথচ চির-নতুন এই প্রেম যে সময়, সমাজ, বয়স, শ্রেণী ও ব্যক্তি-বিশেষে একেবারে স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল হয়ে বার-বার জেগে ওঠে সুদূর লাইট-হাউজের মতো, তা পাঠক, আশা করি, এই সংকলনের ভিন্নমাত্রিক গল্পগুলিতে সবিশেষ টের পাবেন।

সংকলনস্থ সব গল্পই যে সংশ্লিষ্ট লেখকদের প্রতিনিধিস্থানীয়, তা নয়। কিন্তু চরিত্র ও শ্রেণীভেদের জন্য সে-সব গল্প এই সংকলনে, অন্য গল্পের পাশে, অন্যবিধ মাত্রা পেয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সম্পাদকের ইচ্ছাই দায়ী, লেখকের নয়—এ-কথা জানানো থাক।

প্রেমের উল্টোপিঠে থাকে প্রেমহীনতা, ঘৃণা, বিচ্ছেদ, বিষাদ যেমন; তেমনই প্রেম নিয়ে হাল্কা হাসির গল্পও হয়ে ওঠে মনোরম, ব্যঞ্জনাময়। একইভাবে শাস্ত্রবিরোধিতাও মিশে যায় শাস্ত্রসম্মত বিষয়ের গল্পে, পাঠককে আমরা তা-ও লক্ষ করতে বলব।

গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সম্পাদকের নির্বাচনে। লেখক-নির্বাচনও তারই ব্যক্তিগত পছন্দের। কিন্তু, তা যে শেষপর্যন্ত সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, এ-কথা সকলেই মানবেন। একটি সময় পর্যন্ত এই সংকলনের বিস্তার। যেহেতু কোথাও থামতেই হয়, সে-জন্য এই সংকলনও এক-জায়গায় শেষ হয়েছে। তবে, মধ্যবর্তী সময়ের কোনও-কোনও লেখক যে অসংকলিত থাকলেন, তার দায় সবটাই সম্পাদকের নয়। অনেক প্রিয় লেখকই সংকলনস্থ হতে আগ্রহী হননি।

গল্পের সঙ্গে সুব্রত চৌধুরীর আঁকা ছবিগুলি যে এই সংকলনকে মহিমান্বিত করেছে, তা দায়িত্ব নিয়েই বলা যায়।





ষষ্ঠ ঋতু

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দু-পাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। রাস্তার ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালিপাড়া। মালিপাড়ায় মালি আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফস্বলের ছোট শহর হলেও বেচা-কেনা হাট-বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ওইখান থেকে মালিপাড়ার শুরু বলা যায়।

পৌষের দুপুর। দেখতে-দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পুবের বাড়ির চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে। লেখা আছে : 'শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী, কীর্তন-গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।'

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা-মাজা রঙ, দোহারা গড়ন। মধ্য ঋতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো-ঢালা শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে তলে-তলে আর-একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারী, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথির সিঁদুর সামান্য। ডাগর চোখে এখনও সজাগ চাহনি, খরতা-ও আছে। কালো শাড়ি পরনে, গায়ে জামা নেই।

মুখে পান টিপে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোঁটে রাগ-রাগ ভাব। নাকছাবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পুব কোলের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিগ্যেস করল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে, কেষ্টদিদি!'

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না-তাকিয়ে বলল, 'দেখছি।'

—'কাকে?'

—'মরণকে।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'বুঝিছি। তোমার খোলঞ্চিকে তো? তা সে-মিনসেকে তো দেখলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে-ফুঁকতে রিকশা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল

কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিকশাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা-পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। এসব মানুষ একটু বয়সচোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধুলো লেগে রুক্ষ দেখাচ্ছে। সদ্য রিকশা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হয়ে হাসলে তাকে বোকা-বোকা দেখায়।

ভ্রূ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করল কৃষ্ণভামিনী, 'কটা বেজেছে?'

সে বলল, 'এট্টুস দেরি হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, 'রিকশা চালিয়ে খাবে, ওই চালিয়ে মরবে। ভগবান তোমার হাতে কেন শ্রীখোল দিয়েছিল, বলতে পারো?'

অন্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুঞ্চি অর্থাৎ খোল-বাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল, 'ভগবানের বিষয় বলে কথা! কে যে কী হয়, কেউ জানে? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো! না, কী বলো গো?'

বলে পুবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখের তারা জ্বলে উঠল দপ-দপ করে। চতুর্থ ঋতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎবহ্নি। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'ও আবার কী বলবে? আমিই বলছি, না-পোষায় ছেড়ে দিলেই পারো। আমার কি শ্রীখোল-বাজিয়ের অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানছ লোককে, ন্যাকামো করে তবে মরতে আসা কেন এখানে?'

বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল রানীর মতো, ফিরে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রানীর মতো। দরজাটির পাল্লা নেই। নইলে বন্ধ করে দিয়ে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিরে তাকাল পুবের বারান্দার দিকে। সে-মেয়েটি, গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভেংচে চলে গেল।

বাড়ির দরজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পার্টিশান আর দরজার মাথাটা রয়ে গেছে। রিকশাটা ঢুকিয়ে দিল গগন উঠোনে।

ভিতরে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, 'রাধি, ও রাধা, কোথায় গেলি?'

রাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগরসাগর রাধা, কটা রঙ। ছোট-ছোট চোখে ডাগর চোখের ঢুলুনি। ঠোঁটদুটি বড় লাল, একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, হারমোনিয়ামটা টেনে নে।'

রাধা বলল, 'খোলুঞ্চিখুড়ো এল না মাসি?'

কৃষ্ণভামিনী দেয়ালের পেরেক থেকে খঞ্জনি-জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, 'তুই বোস্ দিকিনি। শ্রীখোল ছাড়াই হবে। পোষমাসের আর কটা দিন মাত্তর বাকি। নবদ্বীপ থেকে বাবাজির চিঠি এসে পড়েছে। দোসরা মাঘ বেরুতেই হবে। আমার কাজ আছে।' রাধা চোরা-চোখে মাসির মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতিবছর মাঘমাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর-ভোর সকাল নবদ্বীপের আখড়ায়-আখড়ায়, মন্দিরে-মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়।

স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস করে। আর নবদ্বীপে আসেন নামকরা মহাজনেরা, মহাশয়-বৈষ্ণবেরা। ত্রৈলোক্য আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মল্লিক এইসব বড়-বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া-জানা বৈষ্ণব-গায়কেরা আসেন। পদ রচনা করেন, ভাঙেন-গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড়-বড়। আসর হয়, এক-একদিন এক-এক আখড়ায়। সে-আসরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-মাস্টারমশাইরাও ভিড় করেন এসে। ওইসব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড় আদর। মহাশয়েরা স্নেহ করেন মেয়ের মতো। বাবাজিরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত-অভক্ত জনতার রক্তেও আখরার দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিস। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান করে পানটি মুখে দেয় কৃষ্ণভামিনী। ঠোঁট রক্তরেখায় বেঁকে ওঠে। ধোয়া নীলাম্বরী পরে আঙুল তুলে গায় :

'বঁধু, তোমার দেওয়া গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।'

নবদ্বীপ না-গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল শহরে বাজারে আর তাদের বড়-একটা ডাক পড়ে না। বায়স্কোপ-থিয়েটার, রেডিও-রেকর্ডে অনেক কীর্তন শোনে লোকে। যত-শত মিঠে গলায় বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায় যুগটা পাশ কাটিয়ে গেছে অন্যদিকে। পাড়াতে তাদের ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝোলানো আছে এক-যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনওদিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বয়স বেড়ে গিয়ে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বায়না পাওয়া যায়। এখনও দূর জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরও তলায় মেদিনীপুর, উঁচুতে মানভূম—প্রবাসের বাঙালিরা ডাকেন কখনওসখনও। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনও। কৃষ্ণভামিনী কাছে না-থাকলেও বাবাজিরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এখানে। না-গিয়ে উপায় কী!

বছর-দুয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাখহরি বাবাজি একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, 'কেষ্ট, আচায্যি মশাই বলেছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয়।'

ধক্ করে উঠেছিল কৃষ্ণভামিনীর বুক—'কেন বাবাজি? গান জমেনি?'

বাবাজি বলেছিল, 'রাধেমাধব! এমনটি আর কার জমে গো? আচায্যি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না-করলে শেষ বয়সটা....' একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'তোমার কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়েসুটিয়ে একবারে নবদ্বীপেই চলে এসো। শেষ বয়সটা রাধামাধবের সেবা করে—'

ধকধকানিটা থেমেছিল, বুকের যন্ত্রণাটা কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স। যে-কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে-কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল শুধু তার রূপ নয়, আরও কিছু আছে। বিলাপের দুই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুক ভরে দম নিয়ে, গলার শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজি আরও বলেছিল, 'গলার আর দোষ কী বলো? যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।'

অনাচার অর্থে নেশা-ভাঙ আর শরীর-পীড়নের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজি। একেবারে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে-সবের কিছু কমতি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাখহরি বাবাজি যখন ভালবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজির, কেষ্টকে ভাল না-বেসে তার উপায় কী।

সে-ভালবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালিপাড়ার মেয়ে সে, নিজের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেককিছু। রাধাকে পেয়েছিল সে আটবছর বয়স থেকে। আরও বারোবছর খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য করে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালিপাড়ার কারবার ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং-ঢং আছে। গলাটি একটু খর, তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথামোটা। দিন-রাত্রিই সেজেগুজে আছে। সন্ধ্যা হলেই উঁকিঝুঁকি মারবে এদিক-ওদিকে। মালিপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবানিশি। এখন রক্তের জ্বালা।

প্রথমদিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু-বছর থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গতবছর নবদ্বীপের জায়গায়-জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সে-কথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

'বঁধু পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,
অভিসার নিশি কাটে কেন।
না রাখিতে নিশি কাটে না যেন।'

খঞ্জনিতে দু-বার ঝুনঝুন করে কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, মানের গানটা ধর।'

রাধা উসখুস করছে। এ-বাড়িতে আরও তিনঘর মেয়ে আছে। এ-সময়ে তাদের কাছে বসে রাধা তাদের বাসরলীলার কাহিনী শোনে। বলল, 'কোনটা?'

—'কালকে যেটা হয়েছে।'

ভয়ে বলল, 'আমার মনে পড়ছে না মাসি।'

কৃষ্ণভামিনী রাগে জ্বলে উঠল। বলল, 'তা তো তোর মনে পড়বে না। চিরকাল বারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে।'

তারপর এক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে গুন-গুন করে উঠল সে—

'তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখির বচনে কমলনয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান।'

রাধা গান ধরতে-না-ধরতেই গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার ভ্রূ-দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ-আসরে সে নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফশার্ট গায়ে, তালিমারা ফাটা ফুলপ্যান্ট-পরা রিকশাওয়ালার সঙ্গে কোনও মিল নেই এ-ঘরের। এ-ঘরের সাজানো-গোছানো অল্পসল্প জিনিস, পরিষ্কার যুগলশয্যা, সবকিছুতেই বিপরীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনির রিনিঠিনি খোলের বোলে একাত্ম হয়ে গেল। রাধারও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ-তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে, বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে-পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পিছু-নেওয়া নজরে ছিল তার। দেখেই বুঝেছিল অন্তঃসারশূন্য গেঁয়ো বাউণ্ডুলে। ঘর-বউ জোটেনি কপালে। রেস্ত থাকলে একটু আশকারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পিরিতে মন দূরের কথা, শখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এ-দিক-সে-দিক করে হঠাৎ এসে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে এট্টুস খোল বাজাব ভাই।'

আজকে যেমন অপরাধীর মতো হেসে দাঁড়াল, সে-দিনও তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীর দেহে শ্রাবণের খরস্রোত, আশ্বিনের ঢল বয়সের হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ ঝাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ও-দিকে আবার গগনের একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, 'আমার রং কালা, ট্যাকও কালা, একটু বাজাতে চাই খালি।'

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়ার ঢঙে দুঠুকি বাজাতে-বাজাতে গোলাপি নেশার মতো ঢুলছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণভামিনীকে। দেখে-শুনে ভামিনী রং ফিরিয়ে কালেংড়া সুরে গেয়ে উঠেছিল —

'মতলবে তোর মন ঠাসা,
ঘরের ভাত কাগের আশা।
নাগর পথ দেখ হে ॥'

গগন দমেনি। এক মুহূর্তে তাল চড়িয়ে দিয়েছিল আড়-খেমটার। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যায়নি একেবারে গগনকে।

তারপর বছর চলে গেছে। নানান কাজ করে গগন রিকশা কিনে বসেছে এখানে। সারাদিন দুটি কাজ এখন। রিকশা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু শখ, না আর-কিছু টের পাওয়া যায়নি দশবছর ধরে। এখন কৃষ্ণভামিনীর দরকার হয়ে পড়েছে তাকে। তবে গগনের ওই লালা-ঝরা চোখদুটিকে কোনও আশকারা দেয়নি সে।

রিকশাওয়ালার কাছে কীর্তনগায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পারে না নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালিপাড়ার মেয়েরা ফুসলায় গগনকে, 'কী আশায় আছ? না-হয় রিকশাই চালাও, আর মেয়েমানুষ নেই এ-সোমসারে!'

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই! তার রিকশাওয়ালা-বন্ধুরা বলে, 'ওরে শালা, কেষ্টভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে-বছরে। যারা খাওয়ার তারা খেয়ে নিল। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।'

গগন বলে, 'তা জানি। চাকে মধু না-থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীর পাকাচুল, সে-ও যে অনেক ভাগ্য।'

—'এই মরেছে, শালা কুত্তা নাকি রে!'

গগন হাসে। মাথা গুঁজে সোয়ারি বয়। তখন বোঝা যায়, তারও বয়সে শীতের বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মরণ! রিকশাওয়ালা হলেই অমন নোলা হয়!'

কথায়-কথায় গগন দু-একবার ভামিনীর বাড়িতে থাকবার প্রস্তাব করেছে। খাওয়াটা-থাকাটি যদি এখানেই ব্যবস্থা হত, মন্দ হত না। ভামিনী উগ্রচণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, 'বেরো, বেরো, বেরো!'

রাধার ঠেকে-ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন-খুন শব্দ থামিয়ে বলে, 'হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা। হারমনিয়া ছাড়, খালি গলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গা। আগে বল—'

বলে নিজেই বলে, 'সখি, আমার মন নেই, কাকে বলো! আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও! আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখেনে কে দেখা দেয়? কে ও?....

'সখি, কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল।'

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাঁটি নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, 'আ মরণ।'

মরবার আগেই ঘিচ্-ঘিচ করে খোল কথা বলে উঠল, 'ফিরে যেতে বল।'

রাধা হাসে মিটমিট করে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মাসি গলায় পা দেবে যে!

আশ্চর্য! রাধা চোরা-চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটারঙের শরীরের রেখায় ঘড় ঝাঁজ। নেশা করার মতো স্থূল টকটকে ঠোঁটদুটিতে যেন মনে-মনে কী বলে। দেখে-শুনে ঘেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের রকমসকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে-ঢুলে খোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে

মশার সানাই বাজছে। স্থির হয়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে-ঘরে ধোয়াপোছা, সাজগোজ চলছে। বাতি জ্বলছে বার-বাসরে।

গান শেখানো শেষ হল। গগন উঠতে যাবে। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'রাধি, রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস কর, ওর খোল বাজাবার কত চাই।'

গগন বলল, 'খুব রেগে গেছ বাপু। দশবছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিয়ো না-হয়।'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাকি-বকেয়া আমি ভালবাসিনে।' টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে-খুলতে বলল, 'আর, রাস্তার মানুষের সামনে ছোটলোকের মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।'

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়ারের মতো মনে হয়। মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আর-কোনওদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মতো আসব।'

বলে না-দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। রিকশা বার করতে যাবে। দরজার পাশ থেকে রাধা বলল, 'চললে, খোলুঞ্ছিখুড়ো?'

গগন বলল, 'হাঁ লো। তোর মাসির যা রাগ!'

রাধা বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'তা বলে আমি তো আর রাগ করিনি!'

গগন বলল হেসে, 'করবি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস। তা, হ্যাঁরে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসির গান শুনতে?'

—'আজ? হ্যাঁ, ওপারের মথুর ভটচায আসবে রাত দশটায়।'

—'থাকবে বুঝি রাত্রে?'

—'কী জানি। তুমি আসবে?'

সে-কথার কোনও জবাব না-দিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে-একজন শিস্ দিয়ে উঠল রাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। মালিপাড়া জমে উঠেছে শীতের সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কোঁকাতে-কোঁকাতে এল মথুর ভট্টাচার্য। তার পিছনে-পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুরের নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। রংটি মাজা-মাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-পাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশি কাটা। চওড়া ঘাড়ে ও গলায় বয়সের ঢেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছেহার। পান-রাঙানো ঠোঁট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন ভটচাযমশাই।'

মথুর বলল, বুড়োটে গলায় 'অ্যাঁ? আসব? তা আসব। কিন্তু তোমার সেই মেয়েটি, কী নাম তার? রাধা, হ্যাঁ, রাধা! আজ তার মুখে একটু ভাব-সম্মিলনের গান শুনব। তোমার গান তো অনেক শুনেছি, কেষ্টভামিনী।'

চকিত ছায়ায় এক-মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা

হয়েছে, অনেক! গান শুনবে লোক, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের মিলন-কোলাকুলির রস উপছে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পর মুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম ঋতুতে শীতার্ত শুষ্ক হাসি যেন। ভাল, ভালই তো। সে আসল, রাধা যে তার সুদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মতো বেমানান, তালি-মারা প্যান্টটা পরে হাঁ করে বোকা-চোখে গগন তাকিয়ে ছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাধা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন ডেকে নিয়ে আসি।' রাধাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এসো এসো।'

পৌষসংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাঁক নিল সূর্য। সোনার মতো রোদে ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু-একটু করে।

দোসরা মাঘ রাধাকে নিয়ে রওনা হল ভামিনী। গগনও এসে ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিকশা। শ্রীখোল নিল কাঁধে। সে-ও যায়। না-গিয়ে পারে না। বাজাবার বড় সাধ। দশবছর ধরে নবদ্বীপে সে-ও চেনা হয়ে গেছে। 'কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজি' তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশি। আর আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধো-বাধো লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে, বেশিদিন থাকতে পারে না। পেট চালাতে হবে তো। দু-চারদিন বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিলে না বুঝি?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব?'

রওনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মাগীর ঠ্যাকার দেখলে গা জ্বালা করে।' স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসর জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা করল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা বাড়িতে। রাধাকে গতবছরই সবাই দেখেছে। গতবছর রাধা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাধার কাছ-ঘেঁষাঘেঁষির জন্যে সকলে বড় ঠেলাঠেলি করেছে। গগন-খোলুঞ্চিকেও চেনে সকলে। রাখহরি বাবাজির আখড়াতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাঁই নিয়েছেন এক-এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলের সঙ্গে। সকলেই ডেকে কুশল জিগ্যেস করলেন ভামিনীর।

পরদিনই গানের আসরে বসল ভামিনী। লোকারণ্য হল সেই আসর। প্রথমদিন। সে কৃষ্ণ-রাধা ভজল, খোল-করতাল ভজল, মান্যগণ্য মহাজন-গুরুজন ভজল। তারপর ধরল :

'প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।

পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে!
ধূলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ।'

অনেকক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া-শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। ঠোঁট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের কটাক্ষে সেই রং ফুটছে না। সুরের দোলায়-দোলায় হাত উঠছে না তেমন করে।

এক-ফাঁকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, 'কী হয়েছে তোমার, কেষ্ট?'

—'কেন?'

—'গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।'

—'বয়সা?' হেসে উঠল ভামিনী। বলল, 'এ-বয়সে আবার বয়সা কী বাবাজি? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।'

রাখহরি বলল, 'এ-বয়সেও ধরে গো! গলায় তোমার দো-আঁশলা জট পাকাচ্ছে কেন?'

দো-আঁশলা জট! আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে। হেসে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিতে হবে।'

রাখহরি ভামিনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'থাক না। এবার না-হয় থাক। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক, কেমন শিখেছে।' রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর রাঙা শুকনো ঠোঁটও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা ভ্রূ তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল :

'আমারে, অবলা পেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফান্দে!
অতি অভাগিনী কূট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে।'

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলার চড়া সুরে, আর কাঁচা বয়সের কিশোরী ঠমকে আসর গুনগুন করে উঠল। কোথায় ছিল আসরের এই হাসি ও আনন্দাশ্রু?

অন্ধকার চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড় শীত গুর-গুর করে কেঁপে উঠছে বুকের মধ্যে! কেন? চুলের মুঠি ধরে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহারি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বয়ং মোহিনী মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, 'বাঃ বেশ! শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না, মা। তুমি সত্যিকারের আখেরের কাজ করেছ।'

বড় সুখ, তবু মুচড়ে-মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেরের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, যে সুদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

কেবল দুটো দিন গগন চুপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবার চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় ক-খানা চিবোতে দিয়ে যাবে।

দু-দিন পরে গগন বিদায় নিল। বলে গেল আবার আসবে মাঘেই।

ভামিনী মনে-মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায়-আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তা-ই ভাল লাগত লোকের। খরস্রোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে রাধার মধ্যে। সবাই রাধার পিছনে-পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, 'রাধি, আমার মান রেখেছিস তুই, মান রেখেছিস।'

বলতে-বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অবাক হল। একটু বিরক্তও। বলল, 'এ আবার তুমি কী শুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দাও।'

ঘুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভাল করে কম্বল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে-জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে-মুখে তাকে বন্দনা করছে—হবে না। একসময় কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভাল করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয় না তার। তবু আসরে-আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার শর্ত রাধা, তবে কৃষ্ণভামিনীকেও চাই। চাই বৈকি। সুদকে একলা ছাড়বে কী করে সে!

মাঘের শেষে এল আবার গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে-ফিরতে পিঠে ব্যথা। যেন এতদিনে সত্যিই বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা নেই। যেন মালিপাড়ার সুকিমাসি।

গগন বলল, 'শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে।'

মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, 'শরীলটা ছাড়া বুঝি আর-কিছু দেখতে পাও না ওই মরাখেগো চোখে?'

গগন বলল, 'তা-ও দেখতে পাই।'

—'কী দেখতে পাও?'

—'তোমার দুঃখু।'

—'মরে যাই আর কী। উনি এলেন আমার দুঃখু দেখতে, হুঁ।'

তারপর হঠাৎ কী হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল, 'গতরখেগো মিনসে, আর কবে ছাড়বে পেছন? মলে? তবে আগে মরি, তারপর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ো।'

গগন একবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে, তুমি চুপ করো এখন।'

বলে সরে পড়ল।

মাঘ-মাসের শেষ কটা-দিন কাটিয়ে যাত্রা শুরু হল। গুটি-সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগরে, চোতখণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদ, গোটা দেশটায় প্রায়।

সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভরে পয়সা আর বাহবা দিয়ে গেল রাধাকে। তবে কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে এমন মেয়ে-শাগরেদ আর কার হয়।

চোতখণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, 'আগে বলোনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?'

গগন বলল, 'পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাঁক যে ফাঁক!'

ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না-হয় খেতেই দেব।'

হলদে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, 'তা পারব না বাপু আমি। খোল-বাজিয়ে যোগাড় করে দিয়ে যাচ্ছি।'

সেইদিনই বর্ধমান শহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোঁট উল্টে বলল, 'মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে!'

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাধা। রোজগারে একটু ভাঁটা পড়েছিল কয়েক বছর। এবার সুদসুদ্ধ আদায় করে নিয়ে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মতো একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাধার সঙ্গে। রাধার আশকারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড় ধুকুপুকু ভামিনীর। গগনের মতো হলেও ভাল ছিল, কিন্তু লোকটি অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধার সঙ্গে পিরিত হয়েছে। একেবারে দুর-দুর করতে পারেনি।

ফিরে এসে রাধা বলল, 'মাসি, লোকটা কিন্তু দু-দিন থাকবে এখানে।'

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, 'না।'

রাধা ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে-তেজ নেই তার আর। নিস্তেজ গলায় বলল, 'মুখপুড়ি, বেশি অত্যাচার করলে গলাটা যে যাবে!'

রাধা হুকুমের সুরে বলল, 'যাক। গলার জন্যে কি কারুর ঘরে লোক আসা বাদ ছিল?'

অন্ধকার মুখে চুপ করে রইল ভামিনী। বুকের মধ্যটা পুড়তে লাগল চাপা আগুনে। চোখের মণিতে সে-আগুন নেই, অঙ্গুলি-সংকেতের সেই নির্দেশ নেই। রাজেন্দ্রানী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। রাধা আর তার লোকটিকে নিয়ে গুলজার করল সবাই। মালিপাড়ার বুড়ি-ছুঁড়ি সবাই বলল, 'মাগীর তেজ একটু কমেছে।'

কীসের তেজ। কেন, তেজ তো কোনওদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে যা, তা-ই তো সকলের কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্বং। আসতে লাগল রোজ আগের মতোই। রাধার লোকটি বিদায়

নিয়েছে। সব সময় ভামিনীর কথা মানে না রাধা। তবু ঝগড়া করে, টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয়। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন-যেন ভামিনীর।

সপ্তমে বাঁধা রাধার গলা টং-টং করে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো ঢ্যাবঢেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খ্যাঁকারি দেয়, আবার তোলে গলা। বলে, 'নে বল —'

রাধা বলে, 'থাক বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।'

বলে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীর মুখে। শুধু বসে থাকে চুপ করে। হঠাৎ একসময়ে খেয়াল হয়, মুখোমুখি খোল কোলে করে বসে আছে গগন। ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'বসে আছে যে?'

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, 'যদি এট্টু গাও, তা হলে বাজিয়ে যাই।'

—'কে, আমি? রস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এ-বার ঘাটে গিয়ে, পালাও, পালাও।'

আরও-একটি বছর গেল এমনি। রাধার সেই পিরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার করে। এ-বছরও ঘুরেছে সঙ্গে-সঙ্গে। সঙ্গে মালিপাড়ায়ও এসেছে। এ-বার ফিরে এসে রাধা দু-দিন বাদেই বলল, 'মাসি, আমি চলে যাব।'

ধক্ করে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চারবছর আগে রাখহরির কথায় এমনি ধক্ করে উঠেছিল। গানের গলা নেই, আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কোথায় যাবি?'

—'ওর সঙ্গে।'

ওর, মানে সেই পিরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কন-কন করছে কৃষ্ণভামিনীর। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে, ধমকটমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাযরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা-পয়সা সোনাদানা ও কিছু রানীর ঐশ্বর্যও নেই। এ-বয়সে আর কীসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ-ঘরে?

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, 'যাবি মানে? তোকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করলাম, শেখালাম-পড়ালাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি?'

রাধা বলল কটকট করে,. 'খাইয়েছ-পরিয়েছ বলে, আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধরে রাখবে। মন চাইছে যাকে, তার সঙ্গে চলে যাব।'

মন চেয়েছ! এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার-বায়স্কোপে এমনি পিরিতের আজকাল নাকি বড় ছড়াছড়ি। কিন্তু দু-দিনে যে তেজ ভেঙে যাবে। ঘরের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি করে এক রাধাকে খাওয়াতে-পরাতে হবে।

গম্ভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা।'

এমন আচমকা আর নির্বিকারভাবে বলল ভামিনী যে, রাধাও এক-মুহূর্ত থমকে রইল।

কুঁকড়ে উঠল ঠোঁটদুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল, তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন-রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিয়ো তো।'

ও-দিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মালিপাড়ায়। সবাই একবার করে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসে ছিল বাতি জ্বালিয়ে। মনটা বড় গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস-ফিস খিল-খিল হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ?'

ভামিনী বলল, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার! রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এইরকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো-বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপর হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'তা আমাকে যদি বলো, এখনও রিকশাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাকা তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এসো।'

—'খাওয়াটাও আজ থেকে তা হলে এখানেই হবে?'

—'তা-ই হবে।'

গগন বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধুতি পরে এসেছে গগন। গায়ে ক্ষারের কাচা জামা, গলায় একখানি সুতির চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার-কাটা স্যান্ডেলটিই আছে।

এই বেশে তাকে রিকশা চালিয়ে আসতে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। ভামিনীর বাড়ির মেয়েরাও হেসে কুটিপাটি—'ওমা! এ কী খোলুঞ্চিখুড়ো!'

ও-দিকে যাবার সময় হল। বিদায় নিল রাধা, গগন-ভামিনীর কাছ থেকে। ভামিনী নীরব। গগন বলল, 'সুখে থাকিস, বুঝে চলিস।'

চলে গেল ওরা। তারপর সবাই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল ভামিনীর ঘরে।

ভামিনী রান্না শেষ করল। চোখ না-তুলে মাটির দিকে চেয়ে আসন পেতে খেতে দিল গগনকে। খাওয়া হলে, গা ধুয়ে ধোয়া-কাপড় পরে গগনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসবার চেষ্টা করছে না। বুকটা বড় ধড়ফর করছে। ঠাঁট-বাট করতে হবে। কিন্তু রক্তে সে-দোলা নেই। বয়সের ভারে অচল।

তবুও হেসে তাকাল। চোখের চারপাশে কোঁচ পড়েছে। সেই চোখে অসহায় ইঙ্গিত। গগন হেসে মাথা নামাল।

দরজা বন্ধ করল ভামিনী। জানালা বন্ধ করল। বাতিটা কমাল, কিন্তু জ্বলতেই লাগল। সামান্য অস্পষ্টতা। তারপর কাছে এসে হাত ধরল গগনের।

গগন চমকে উঠে বলল, 'কই, হারমনিয়া পাড়লে না?'

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল ভামিনী, 'কেন?'

—'গাইবে না?'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'শোবে না?'

তেমনি অপ্রস্তুতভাবে হাসতে গিয়ে আজ প্রথম গগনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, 'কেষ্টভামিনী, ওইটির জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি যা দেবে, সব নেব। কিন্তু কেষ্টভামিনী—' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোক গিলে বলল, 'তোমার কাছে থেকে বাজাব, তা-ই চেয়েছি এতকাল ধরে।'

বিস্মিত সংশয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণভামিনী। পরমুহূর্তে চোখে জল এসে পড়ল তার। রুদ্ধগলায় বলল, 'কেন?'

গগন বলল, 'বাবারে! সব ভুলে গেলাম কেত্তনগায়িকে কেষ্টভামিনীর গান শুনে, সে কি ভুলতে পারি? আজ যদি ডাকলে, এট্টু বাজাতে বলো আমাকে।'

কে বলবে! কে কথা বলবে! হৃদয়ের সব গান আজ আর-এক গানের রসে যে গলা বুজিয়ে দিয়েছে।

হারমোনিয়াম পেড়ে নিল গগন। শ্রীখোলটিতে কপাল ঠেকিয়ে কোলে নিয়ে বসল। বলল, 'গাও।'

হারমোনিয়ামে সুর উঠল। কৃষ্ণভামিনী সুর দিল। সুর উঠল, স্বর উঠল। সেই স্বরে পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠ ঋতুর বাতাস লাগল।

সারা মালিপাড়াটা প্রেত্তিনীর মতো ফিসফিস করে হাসতে লাগল, 'কেষ্টভামিনী আবার গাইছে গো।' ●



কলহ

দরজা খুলে রত্না বলল, 'এ কী?'

পা বাড়িয়ে ভিতরে আসতে-আসতে সুমিত বলল, 'ভূত!'

সাড়া না-পেয়ে দরজা খোলার অভ্যেস নেই রত্নার। এই ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর সুবিধে অনেক, অসুবিধেও কম নয়। নিচে একজোড়া দরোয়ান, তবু চুরিচামারি, জুলুমবাজির ঘটনা ঘটেছে। বারোয়ারি ফ্ল্যাট বাড়িতে যেমন হয়—কে কখন আসছে যাচ্ছে, কার ফ্ল্যাটে ঢুকছে —অত খবর রাখা যায় না।

দরজা খোলার আগে সাড়া নিয়েছিল সুমিতের, তারপর দরজা খুলেছে। তবু কথার কথা বলল, 'এ কী?'

সুমিত হাতের ব্রিফ-কেসটা রত্নার দিকে এগিয়ে দিল। দিয়ে নিজের ঘড়ি দেখাল। ঠাট্টার গলায় বলল, 'সোয়া-ছয়, কাঁটায়-কাঁটায় ছটা-আঠারো।'

রত্না ঘড়ি দেখল না। 'আজ এত তাড়াতাড়ি?'

—'ভয়ে। কাল যে-ভাবে মুণ্ডুপাত করলে আমার, ব্বাস!'

—'আমি তোমার মুণ্ডুপাত করলাম?'

—'করলে না! ফিরতে সাড়ে-সাত বেজে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে দেখি হট্ চেম্বার। সেদ্ধ হতে লাগলাম।' কথা বলতে-বলতে এগিয়ে গিয়ে সুমিত একটা হাল্কা টুলের ওপর বসে জুতো খুলতে লাগল।

রত্না বলল, 'তা হলে তো তুমি রোজই হট্ চেম্বারে ফেরো। সোয়া-সাত, সাড়ে-সাতের আগে কবে বাড়ি ফিরলে?'

সুমিত হেসে ফেলে মুখ তুলল। 'কী করব, ডিয়ার। থাকি কলকাতায়, চাকরি করি প্রাইভেট কোম্পানিতে। সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না যে। নয় তো পাঁচটার আগে তোমার কাছে ফিরে আসতাম।'

রত্না কিছু বলল না, ঘরে চলে গেল।

আজ সুমিতের কপাল সত্যি ভাল। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতে-না-নামতেই শশী হাজরার সঙ্গে দেখা। শশী ওয়াটসন কোম্পানির সেলস ম্যানেজার হয়েছে। পুরনো এক গাড়ি কিনেছে শালা। বলল, 'আয় তোকে খানিকটা লিফ্‌ট দি।'...শশীর ঘাড়ে চড়ে পার্ক সার্কাস ময়দান। গাড়ি থেকে নেমে সুমিত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ফাল্গুনের বিকেল যেন ধনুকের মতন বেঁকে অপরাহ্নবেলাকে আরও ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। রোদ না-থাক, আলো ছিল। শহরে বসন্তের বাতাস বইছিল ধুলো উড়িয়ে।



আর, কী কপাল সুমিতের! একটা ট্যাক্সি শাট্‌ল খাটছিল বোধহয়। পাশে এসে বলল, 'গোলপার্ক পর্যন্ত, স্যার।'

সুমিত যেন হাতে চাঁদ পেল। আহা, কলকাতা কেন এমন শাট্‌ল বাহিনী হয় না!

'মৃণালিনী' ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর নাম দিয়েছে সুমিত 'আহ্লাদিনী'। তিরিশ-বত্রিশটা মাত্র ফ্ল্যাট। ছোট কম্পাউন্ড। বাড়িগুলো চারতলা পর্যন্ত। বারোয়ারি লোকজন। সবাই বেশ আহ্লাদে থাকে। সাজে-গোজে, বাজার করে, আইসক্রিম খায়, বাচ্চাগুলো নিচের টুকরো জমিতে ভলিবল খেলে, সন্ধে হতে-না-হতেই টেলিভিশন খুলে দেয় মেয়েরা। দারুণ লাইফ। এরই মধ্যে দু-জন মারাও গেল। একজন হার্ট অ্যাটাকে, একজন ক্যানসারে। এক ছোকরা স্যুইসাইড করল, এগারো নম্বরের। নর্থ এগারো। আর মাত্র মাসখানেক আগে একটি মেয়ে হাওয়া হয়ে গেল। তবু সব মিলিয়ে এখানে একটা আহ্লাদি ভাব আছে। সেটা বাইরেরও হতে পারে। সুমিত জানে না।

ঘরে ঢুকে সুমিত দেখল, রত্না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। খোঁপা ঠিক করে নিচ্ছিল।

আজ রত্না একটু চমক খেয়েছে। অন্য দিন, রবিবার বাদে, সুমিত যখন বাড়ি ফেরে, দেখে রত্নার সান্ধ্য-প্রসাধন ঈষৎ বাসী হয়ে আসছে। না, না, বাসী নয়, কিঞ্চিৎ ম্লান। আজ সুমিত যখন এসে পড়েছে, রত্নার গা-ধোওয়ার পর্ব শেষ হলেও প্রসাধন সারা হয়নি। মানে, আজ সব টাটকা থাকবে।

সুমিত গায়ের জামাটা খুলতে-খুলতে রত্নাকে একবার দেখল। বিয়ের আগে মা বলেছিল, 'তোর বাবা কী বলছে, জানিস? তোমার ছেলের জন্যে বউ যা আনছি, দেখো। পরি নয়। কিন্তু সুশ্রী! বেশ একটা লাবণ্য আছে মুখে। তোমার ছেলের নাক নেই, চোখ গোল-গোল। বউয়ের নাক দেখবে, কেমন লম্বা নাক, চোখ টানা-টানা। মেয়েটা বড় ভাল গো। এত মিষ্টি দেখতে লাগে।'

বাবা বাড়িয়ে বলেনি। মা নিজে মেয়ে দেখে এসেও বেজায় খুশি হয়েছিল। রত্না দেখতে সত্যিই সুশ্রী। তার গায়ের রং তেমন পরিষ্কার নয়, বরং শ্যামলাই বলা যায়। কিন্তু গড়নে মেরে দিয়েছে। লম্বা, ছিপছিপে, কাটা-কাটা শরীর। হাত, পা, কোমর, পিঠ—সব যেন মানানসই। যেমন পরিষ্কার ছিমছাম মুখ, তেমন চমৎকার ঘাড়। আর মাথার চুল। আজকাল বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এমন পিঠ-ছড়ানো ঘন চুল খুব কমই দেখা যায়। খুঁত কোথাও একটু-আধটু আছে, তা নিয়ে সুমিত ভাবে না, বোঝেও না। রত্নাকে দেখতে তার চমৎকার লাগে।

—'আজ কি নতুন পাউডার?' সুমিত হাল্কা মজার গলায় বলল।

—'কেন?'

—'ঘরে দারুণ গন্ধ...।'

—'সেই একই।'

—'নাকি। গন্ধটা অন্যরকম লাগছিল। ওই যে কী বলে ল্যাভেন্ডার না কী—সেইরকম। ফ্রেশ।'

—'তুমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসো। আমি চায়ের জল বসাতে যাচ্ছি।'

সুমিত বাথরুম যাবার জন্যেই তৈরি হচ্ছিল। 'আজ কী গো?'

—'কী! মানে?'

—'তোমার স্পেশাল কী? ডালপুরি, মাছের কচুরি, না, ডিম পকৌড়া?'

—'খাবার সময় দেখবে।'

—'আগে বললে ক্ষতি কীসের? ধরো আগে বললে, জিবে জল জমত। যাকে বলে সিক্রিসান...!'

—'আমার হাতের খাবারে তোমার জিবে জল জমে নাকি? কাল তো রাত্তিরে নাক সিঁটকে উঠে গেলে!'

সুমিত একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল। কালকের কথায় না-গিয়ে সে বলল, 'তোমার আজ হল কী? রাগ-রাগ দেখছি।'

রত্না কোনও জবাব না-দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

সুমিত বলল, 'এই। লেক টাউন থেকে কোনও খবর পেয়েছ?'

—'না।'

—'আমি ভাবলাম, তোমার বাবা বোধহয়...'

—'না।' রত্না চলে গেল।

সুমিত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। রত্না কেমন-যেন মেজাজি। মানে ওই যাকে 'মুডি' বলে সেই ধরনের। আজ ছ-মাস হল—না সাতমাস—তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর-পর কিছু বোঝা যায়নি। রত্নাকে এত খুশি, ঝকঝকে, ভরা দেখাত যে সুমিত ধরতেই পারেনি ওর মধ্যে কেমন এক মেজাজি ভাব আছে। আজকাল বোঝা যায়।

বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সুমিত।

রত্নার সবই ছিমছাম। বাথরুমটাকে শুকনো, পরিষ্কার, ফিকে ওষুধ-ওষুধ গন্ধে ভরে রেখেছে। বেসিন, শাওয়ার, কল, তোয়ালে সবই পরিষ্কার। আয়নাটা ঝকঝক করছে।

রত্না বড় গুণের মেয়ে। মা-বাপের একটি হলে মেয়েরা বড়-একটা কাজের হয় না, আর ছেলেরা হয় অপদার্থ। অবশ্য রত্না তার মা-বাবার একটি নয়। আর-একটি আছে, রত্নার দাদা। কিন্তু সে রত্নার চেয়ে অনেক বড়। আট-দশ বছরের। আজ প্রায় দেড়-যুগ ধরে দাদা গুজরাটের দিকে পড়ে আছে। ভাল চাকরিবাকরি করে। কলকাতায় দু-তিন বছর অন্তর একবার করে আসে, তার বেশি পারে না। দাদা আর বউদি প্রায় গুজরাতি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা হয়ে গেছে। তাদের মেয়েকে বাঙালি বলে চিনতে ভুল হয়।

তা, যদিও হিসেবে দুটি, তবু রত্নাকে মা-বাবার একটিই বলা যায়। সে একাই তো ছিল বাপের বাড়িতে। কিন্তু আদরে-আহ্লাদে অকর্মা হয়ে যায়নি। কাজকর্ম, রান্না, ঘরদোর দেখা, ডাক্তার-বদ্যি করা—সব ব্যাপারে পাকা। এমনকী, রত্না কিছুদিন চাকরিও করেছে। বনিবনা না-হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। তারপর এই বিয়ে।

বিয়ের পর আর চাকরিবাকরি করার কথাই ওঠেনি। ওঠার কথাও নয়। সুমিতও তার মা-বাবার একটিমাত্র। অন্য ব্যাপারে না-হোক, সাংসারিক ব্যাপারে খানিকটা অকর্মা। রত্নার

তুলনায় অকর্মার ধাড়ি। বোধহয় এই জন্যেই বাবা আগে থেকে সব এঁচে রেখেছিল। মানে, পরপর কী করবে। যেমন, একটা ফ্ল্যাট কেনা। ছেলের বিয়ের আগে থেকেই বাবা একটা ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টায় ছিল। লাখ তিন-চারের পুঁজি বাবার ছিল না। লাখ-সোয়া লাখের মধ্যেই বাবা ফ্ল্যাট খুঁজছিল। খুঁজতে-খুঁজতে এই 'মৃণালিনী'তে জুটে গেল। দু-ঘরের ফ্ল্যাট। মাঝখানে খাওয়া-বসা। ছোট কিচেন। বাথরুম দুটো। আর একটা ব্যালকনি।

প্রতাপ মুন্সি লেন থেকে সবাই মিলে চলে এল এই ফ্ল্যাটে। মাত্র চার-পাঁচ মাস আগে। ঘরদোর গুছিয়ে ছেলে আর ছেলের বউকে বসিয়ে প্রবীণ কর্তা তাঁর গিন্নিকে নিয়ে ভারত-দর্শনে বেরিয়ে পড়ল। সুমিত ঠাট্টা করে বলে 'ভারত-দর্শন।' আসলে বাবা আর মা গিয়েছে দিল্লি। ভাইপোর কাছে মাস-দুই থাকবে। সেখান থেকে হরিদ্বার। ফেরার পথে যাবে এলাহাবাদ। পিসির কাছে থাকবে মাসখানেক। সেখান থেকে কাশী গয়া হয়ে ধানবাদ। খুশিদি—মাসির মেয়ের কাছে। অর্থাৎ বাবা-মার ফিরতে-ফিরতে সেই জষ্টি-আষাঢ়। যাবার সময় বাবা বলেই গেছে, 'রত্না, একবার যখন বেরুচ্ছি, সব সেরে আসব। পরে আর হয়ে উঠবে না। সংসার থেকে বেরুনোই মুশকিল। এ-বার আমরা ঝাড়া হাত-পা। তুমি থাকলে, আর ভাবনা কী?'

মা-বাবা গিয়েছে দেওয়ালির পর। তখন থেকে রত্নাই সংসারের মহারানী হয়ে আছে। সুমিত তো রোজই একবার করে বলে, 'তুমি বিউটিফুল চালাচ্ছ, রত্না। মা ফিরে এসে তোমাকে কানের দুল না-হয় আংটিফাংটি একটা গড়িয়ে দেবে। এমন এফিসিয়েন্ট বউ হাজারে একটা হয় না। সত্যি বলছি, নো আমড়াগাছি।'

মা-বাবা যাবার পর দুটো মাস সুন্দর কেটেছে। সুখে, আনন্দে, মজায় ফুর্তিতে। সুমিতও কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু তারপর থেকে সুমিতের চোখে ধরা পড়তে লাগল অনেককিছু। যেমন, রত্না বেশ মেজাজি, তার অভিমান বেশি, কোনও-কোনও ব্যাপারে অদ্ভুতরকম অসহিষ্ণু, কোথাও কিছু নয়—মেজাজ একটু বিগড়োল তো কথাই বন্ধ করে দিল, চুপচাপ—যেন বোবা হয়ে থাকল। আবার কথা-কাটাকাটি শুরু করল তো থামতেই চায় না। সুমিত চুপ করে গেলেও রত্না চুপ করবে না, সুমিতকে যেন খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে কথা বলাবে।

অবশ্য ব্যাপারগুলো তুচ্ছ। না-দেখলেও চলে। তা ছাড়া, বেচারি প্রায় সারাদিন একা বাড়িতে থাকে, তার মা-বাবাও লেক টাউন থেকে বেশি আসতে পারে না—কাজেই একধরনের একঘেয়েমি হয়তো রত্নাকে অখুশি, বিরক্ত করে তোলে। করার কিছু নেই। সুমিতের মা-বাবা ফিরে এলে রত্নার এই বিরক্ত-ভাবটা কেটে যাবে।

তবু, সুমিত একবার সন্দেহ করেছিল, বিয়ের দু-চার মাস পরে এইরকম মানসিক অতৃপ্তির, অসহিষ্ণুতার অন্য-কোনও কারণ ঘটল কি না। না, সে-রকম কিছু নয়। শরীরের দিক থেকে রত্নার কিছু হয়নি।

তা, সুমিত অকারণে তিলকে তাল করতে চায় না। রত্না একটু মেজাজি, সামান্য অসহিষ্ণু, খানিকটা অভিমানী যদি হয়—হোক, কী আর করা যাবে। সব মানুষ এক ধাতের হয় না।

'এটা কী গো?' চেয়ার টেনে বসতে-বসতে সুমিত বলল।

—'দ্যাখো, কী।'

সুমিত প্রথমে দু-ঢোঁক জল খেয়ে নিল। তেষ্টা পেয়েছিল। ফ্রিজটা গণ্ডগোল করছে। জল তেমন ঠাণ্ডা হচ্ছে না। পুরনো ফ্রিজ। গরমও এসে গেল। একবার দেখাতে হবে ফ্রিজটা।

সুমিত বলল, 'আলুর পরোটার মতন দেখাচ্ছে!' বলে প্লেট টেনে নিয়ে খেতে বসল।

রত্না টেবিলের উল্টোদিকে বসে। তার সামনে চায়ের সরঞ্জাম।

—'জিনিসটা কী?' সুমিত খেতে-খেতে বলল, যেন স্বাদ পরখ করতে-করতে।

—'কেমন হয়েছে?'

—'দারুণ! টেস্টি!'

—'এর কোনও নাম নেই। মিক্সড পরোটা। আলু, ডিম, টমাটো, শশার কুচি—সব আছে।...সস্ নেবে না?'

—'নিচ্ছি।' হাত বাড়িয়ে সুমিত সসের বোতল টেনে নিল। এই সস্‌টা তার পছন্দ নয়। রসুন-রসুন গন্ধ লাগে। রত্নার আবার এটাই পছন্দ। সুমিত একবার বলেছিল কথাটা, রত্না কান দেয়নি।

—'তুমি? তুমি খাবে না?' সুমিত বলল।

—'না।' রত্না মাথা নাড়ল। 'আমি রাত্তিরে খাব। এখন ভাল লাগছে না।'

—'অবেলায় খাওয়া-দাওয়া করেছ?'

—'কই! একটা নাগাদ। ... তোমার ওই মাদুলির মতন ভিটামিনটা খেলে—আমার যা হয়! খালি ঢেঁকুর। পেট ফুলে থাকে যেন।'

সুমিত মুখ তুলে হাসির চোখে রত্নাকে এক-মুহূর্ত দেখল। 'যেন—। সত্যি তো আর...!'

রত্না চায়ের পট তুলে নিল। সুমিতের দিকে তাকাল না। নিচু মুখ। চা ঢালতে লাগল। 'তরকারিটা নিলে না? আলুর দম?'

—'তোমার এই মিক্সড আমার দারুণ লাগছে। শিখলে কোথায়? মায়ের কাছে?

—'না। এক কাকিমা শিখিয়েছিল।'

সুমিত আবার খানিকটা জল খেল। আলুর দমটায় প্রচণ্ড ঝাল হয়েছে। রত্নার হাত ঝালের নয়। 'করেছ কী?'

মুখ তুলে তাকাল রত্না। 'কেন?'

—'এ তো একেবারে লঙ্কার জাহাজ!'

রত্না চোখ নামাল না, তাকিয়ে থাকল। পরে নিস্পৃহ গলায় বলল, 'রেখে দাও।'

সুমিত আরও একটু খাবার চেষ্টা করল। পারল না। কাচের বাটিটা সরিয়ে রাখল।

—'তোমার মুখে কোনটা পানসে আর কোনটা লঙ্কার জাহাজ—আমি বুঝতে পারলাম না—'রত্না চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে-দিতে বলল।

—'কেন?... আমি তো সব খাই। খুব-বেশি ঝাল খেলে হেঁচকি উঠতে শুরু করে। নুইসেন্স ব্যাপার!'

—'কাল রাত্তিরে খেতে বসে বললে পান্‌সে...!'

—'কাল? কোনটা?'

—'মাংস!'

—'ভুলে গিয়েছি। একটু চিনি দাও। না না, মিষ্টিফিষ্টি খাব না। হাতে একটু চিনি দাও। হেঁচকি দমন করি।' 'দমন' কথাটা ঠাট্টা করেই বলল সুমিত।

রত্না চিনি এগিয়ে দিল। নিজের চা ঢেলে নিয়েছে।

সুমিত চিনি খেয়ে জল খেল। আবার চায়ের কাপ মুখে তুলল। 'ভাল কথা, যাবে কোথাও?'

—'কোথায়?'

—'যেখানে হয়। সিনেমার টাইম নেই আর। নবেন্দুর বাড়ি যেতে পারি। কিংবা, ধরো, গড়িয়াহাটের মোড়?'

—'না।'

সুমিত স্ত্রীকে লক্ষ করছিল। রত্না কেমন গম্ভীর, শক্ত হয়ে রয়েছে। এ-রকম থাকার কথা নয়। ভাল মেজাজে থাকলে রত্না বাড়ি ভরিয়ে রাখে। এই কথা বলছে, হাসছে, নিজের মনে গান গেয়ে উঠছে, খুনসুটি করছে সুমিতের সঙ্গে, চুল ধরে টানছে, সিগারেট কেড়ে নিচ্ছে মুখ থেকে, কাঁধের কাছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, রত্না আজ ভাল মেজাজে নেই।

খারাপ লাগছিল সুমিতের। আজ সে কত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। তারা অনায়াসে কাছাকাছি কোথাও বেরুতে পারত। ঘুরে আসতে পারত খানিক। অথচ রত্না বেরুল না। আর গতকাল সুমিতের ফিরতে দেরি হয়েছিল—মানে যেমন সচরাচর ফেরে, তার থেকে পনের-বিশ মিনিট—তাতেই রত্না চটেমটে একশেষ। সুমিতকে যা করল!

নিজেকে সামলে নিল সুমিত। বাইরে নাই-বা যাওয়া হল, ঘরে বসেই দিব্যি আড্ডা জমানো যেতে পারে। যেমন তারা আগে জমাত। এখনও মাঝে-মাঝে না-জমে, তা নয়। দু-জনে মিলে মজা করতে পারে, তাস খেলতে পারে দু-হাতে, সুমিত বাহারি করে টপ্পা শোনাতে পারে—শুনে রত্না হেসে গড়িয়ে পড়বে, কিল মারবে সুমিতের পিঠে, 'কী সব অসভ্য কথা—শিখলে কোথায়?'—সুমিত হাসবে। ওরা নিজেরা মজা করে কত কী করতে পারে সারাটা সন্ধে।

চা খেতে-খেতে সুমিত বলল, 'আজ টিভিতে কী আছে গো?'

—'কী জানি।'

—'নাটকফাটক আছে?'

—'জানি না।'

ব্যাপারটা কী? রত্না এমন 'জানি না,' কী জানি' করছে কেন? কী হয়েছে ওর? সুমিত এমন-কিছু করেনি যাতে রত্না অসন্তুষ্ট হতে পারে।

—'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? মাথাটাথা ধরেছে?' সুমিত বলল।

মাথা নাড়ল রত্না।

—'তা হলে? কথাই বলছ না?'

—'কথা বললেই খারাপ!'

—'কেন? খারাপ কেন? আশ্চর্য!'

—'তুমি বলবে মুণ্ডুপাত!'

—'মুণ্ডুপাত? ...ও!' সুমিত হেসে উঠল। আরে ও কথার কথা! ঠাট্টা। তা ছাড়া আমার মুণ্ডু তোমার পাতে তো ভগবানই ফেলে দিয়েছে।...চলো, দেখি—আমাদের কলকাতা দূরদর্শনে কী চিজ দেখাচ্ছে!' বলে সুমিত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘুরে এসে রত্নার পাশে দাঁড়াল। টোকা মারল মাথায়। মুখ নামিয়ে স্ত্রীর গালে গাল ঘষল। রত্নার চায়ের কাপটা তুলে নিজের নাকের কাছে নিল। বলল, 'তোমার কাপে তোমার মুখের গন্ধ লেগে আছে। আমি কাপ খাব, না, তোমার মুখ খাব?' বলে কাপ নামাতে-নামাতে আলগা করে স্ত্রীর গালে চুমু খেয়ে হেসে উঠল।

রত্না টেবিলের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

—'মে আই হেল্প?'

—'আমি করে নিচ্ছি।'

—'নাও তা হলে। আমি টিভি খুলছি।'

মা-বাবা নেই, পাশের ঘরটাই এখন প্রায় বসবার ঘর হয়ে উঠেছে। টিভি ও-ঘরেই রাখা আছে আপাতত।

সুমিত নিজের ঘর থেকে সিগারেট-দেশলাই নিয়ে এসে মা-বাবার ঘরে চলে গেল। রত্না টেবিল পরিষ্কার করে ফেলেছে।

টিভি চালিয়ে সুমিত বাবার সেকেল আর্ম-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। সিগারেট ধরাল।

—'যাচ্চলে! এ যে 'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে খাঁচার পাখি উড়ে গেল' হচ্ছে। পল্লিটল্লি নাকি? পারা যায় না। হোক—কী আর করা যাবে।'

অফিসের কথা মনে পড়ে গেল সুমিতের। হঠাৎ। যোগেন চৌধুরী মহা ধান্দাবাজ। বেটা কেমন নিজেকে জায়গা-মতন বসিয়ে দিল। এখন থেকে চৌধুরী মাসে তিন-চারটে করে ট্যুর নেবে। মিনিমাম ফাইভ টু সেভেন হান্ড্রেড ইনকাম। সুর বলছিল, সুমিত তুই একটা বউয়ের ভেড়া। বেটা তোর ফেয়ার চান্স ছিল—একবার বললি না। লস্ খেয়ে গেলি।

সুমিত লোকসান খেল হয়তো। কিন্তু তার উপায় নেই। রত্নাকে একলা বাড়িতে ফেলে রেখে সে ট্যুর করতে যেতে পারে না। ন-মাসে ছ-মাসে একবার হলে না-হয় রত্নাকে লেক টাউনে ওর মা-বাবার কাছে রেখে ট্যুর সেরে আসতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মাসে দু-তিনবার করে বাইরে যাওয়া, রত্নাকে ফেলে—একেবারে অসম্ভব।

টাকার লোভ সকলেরই থাকে। সুমিতেরও আছে। তা বলে স্ত্রীর লোভ হেলায় সরিয়ে টাকার পিছনে ছোটার লোভ তার নেই। রত্নাকে একদিন ছেড়ে থাকতে হলে মন কেমন করে, রাত্রে ঘুম হয় না—তো মাসের মধ্যে বারো-চোদ্দো দিন, কম করেও, রত্নাকে ছেড়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব। রত্নাই কি পারবে নাকি? না বাবা, ট্যুর আমার দরকার নেই। তুই নে

যোগেন, তোর সত্যি টাকার দরকার। বউ, শালী, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ফেঁসে গিয়েছিস। আমার শালীফালি নেই, শ্বশুর এখনও নিজের পায়ে খাড়া আছেন। শাশুড়ি এল আই সি-তে। দিব্যি আছেন দু-জনে। আর আমি ভাই, সাফসুফ বলছি, রত্না-বিনে বাঁচতে পারি না। আকাশে আমার একটাই চাঁদ, ভাতিছে সুনীল গগনে।... যাঃ শালা, চাঁদ যখন 'ভাতিছে'—তখন আকাশ 'সুনীল' হয় নাকি?

সুমিত নিজের মনেই হেসে ফেলল।

রত্না ঘরে এসেছিল। 'হাসছ?'

—'না, এমনি। শোনো।'

—'কী?'

—'কাছে এসো', সুমিত হাত নেড়ে ডাকল। টিভি-তে কীসের মেলা দেখাচ্ছে। লোকজন, দোকান-পসার, বাঁশি বাজছে।

রত্না বলল, 'এত জোর করে রেখেছ কেন? কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে।'

—'কমিয়ে দাও। দিয়ে এসো।'

—'কেন?'

রত্নাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুমিত লক্ষ করে দেখেছে, হাল্কা রঙের ছাপা শাড়িতে রত্নাকে চমৎকার মানায়। একেবারে ঘরোয়া, স্নিগ্ধ, টাটকা। আজকের শাড়িটা হাল্কা নীল, সাদা-সাদা ফুলের নকশা ছিটনো, ফুলগুলো ছোট-ছোট শিউলিফুল ধরনের। শাড়ির সঙ্গে জামা পরেছে সাদা। ধবধবে। হাত-দুটো যা দেখাচ্ছে রত্নার, যেন—কী বলে—মৃণাল... ধ্যুত—মৃণাল আবার কী?

—'কী হল?' সুমিত বলল।

—'বলো না?'

—'কাছে এসো।' বলে মজা করে গাইল, 'আদরিণী মোর, আয়রে—কাছে আয়...।'

রত্না কাছে এসে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে আরও কাছে টানল সুমিত। 'তোমার নাম রত্না না-হয়ে স্বপ্না হল না কেন?'

—'মাকে জিগ্যেস করো।'

—'মা।' সুমিত হেসে উঠল। 'এ-সবের মধ্যে মা-বাবা কেন?...যাকগে, একটা খবর দি।...আজ অফিসে, অবশ্য ঠিক আজকের ব্যাপার নয়, ক-দিন ধরে একটা কথা চলছিল। রায়সাহেব আমাকে ট্যুরে ফেলতে চাইছিলেন। ট্যুর মানে—মাসের মধ্যে পনেরো-বিশ দিন বাইরে। হোটেলবাজি। আমি রাজি হলাম না। সান্যালদাকে বললাম, 'দাদা আমার বাড়তি টাকার দরকার নেই। বাড়িতে আমার কচি বউ; মা-বাবা এখানে নেই, আমি আমার আদরিণীকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারব না। যোগেন চৌধুরীকে পাঠান।" কথা বলতে-বলতে সুমিত, রত্নাকে গায়ের ওপর টেনে প্রায় শুইয়ে ফেলেছিল। রত্না একেবারে হেলে পড়েছে। তার বুক সুমিতের নাক, মুখ কপালের কাছে। 'যোগেনকেই পাঠানো ঠিক

হল। আমি বেঁচে গেলুম! তোমায় ছেড়ে থাকা! মরে যাব।' সুমিত মজা করে, আবেগের সঙ্গে রত্নার হাতে, বুকে মুখ ঘষতে লাগল।

রত্না আদর সইতে-সইতে বলল, 'তুমি ট্যুরে গেলে আমি তোমায় দেখে নিতাম।'

—'জানি তো! জানি বলেই গেলুম না।'

—'তুমি কিছুই জানো না।'

—'জানি না?'

—'না।'

সুমিত স্ত্রীকে ছেলেমানুষের মতন আদর করতে লাগল। রত্নার মেজাজ ভাল হয়ে গিয়েছে। রাগটাগ উধাও। এখন একেবারে সেই রত্না। অনেক হাসি-খুশি। সুমিতের ঘাড়ের প্যাশে নাক ঘষছে, চুল টানছে, হাত সরিয়ে দেবার জন্যে চিমটি কাটছে, কানের লতিতে দাঁত বসিয়ে দিল।

আর, টেলিভিশনের কাণ্ড দেখেছ, এই সময়ে কেত্তন গান লাগিয়ে দিল।

—'তুমি আজ বোসবাবুকে আসতে বলেছিলে?' রত্না বলল।

—'বোস! মণি বোস?'

—'হ্যাঁ। উনি এসেছিলেন। আমি অবাক। তুমি আমায় কিছু বলে যাওনি।'

—'ভুলে গিয়েছিলাম। আগেই তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তারপর পরশুদিন মণিবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তখন অফিস যাবার জন্যে ছুটছি।...আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কী বললেন মণিবাবু?'

—'বললেন, ডিজাইন নিয়ে আসবেন। দেখাবেন।'

—'ফালতু! করবে তো একটা কিচেন সেলফ—তার জন্যে ডিজাইন! তুমি বলে দিলেই পারতে কেমন হবে!'

—'আমি বলিনি! কেন বলব! ...আমি বলব, তারপর তুমি নাক সিঁটকোবে।'

—'আমি?'

—'আমি যা করি তাতেই তুমি নাক সিঁটকোও।'

—'নেভার।'

—'মিথ্যে কথা বোলো না। আমি ঘরের জানালা-দরজার পরদা করালাম নিজের পছন্দে, তুমি বললে—সেলুন-মার্কা।'

সুমিত হেলে ফেলল।

রত্না বলল, 'আমি দুটো আলোর শেড আনলাম—তুমি বললে ষাঁড়ের চোখ...'

সুমিত সুড়সুড়ি দিল বউয়ের কোমরে।

—'আঃ ছাড়ো। ...আমি নিজে যা করব, তাতেই তুমি ঠোঁট ওলটাবে, নাক কোঁচকাবে!'

—'কে বলল?'

—'আমি বলছি। আজ আমি তোমাকে যে-শার্ট-প্যান্ট বের করে দিলুম পরতে, সেগুলো ফেলে রেখে তুমি নিজে খুশিমতন প্যান্ট-জামা বার করে পরলে।'

—'আরে না! ওই প্যান্টটা কোমরে লাগছে। মোটা হয়ে যাচ্ছি যে, ভুঁড়ি বাড়ছে।'

—'শার্ট?'

—'শার্টটা ম্যাচ করছিল না। মানে অন্য প্যান্টের সঙ্গে।'

—'ওগুলো বিয়ের। মা-বাবা দিয়েছিল। তোমার মাপ তুমিই দিয়েছিলে।'

—'বিয়ের পর যদি মোটাসোটা হয়ে যাই—আমি কী করব! বিয়ের জল মেয়েদের গায়েই লাগে—এখানে ধরো আমার গায়েই লাগছে।'

—'কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও আমাকে', রত্না নিজেকে আলগা করে নিল। 'বিয়ের পর থেকে তোমার গায়ে-মনে অনেক জল লাগছে।'

—'ও হো! তুমি...!'

—'আমি আজ তোমার মুণ্ডুপাত করছি, কাল পানসে খাওয়াচ্ছি, পরশু তোমার মোজা হারাচ্ছি, কলমের নিব ভেঙে দিয়েছি...'

সুমিত বিরক্ত হয়ে উঠল। কীসের থেকে কী? একটা তুচ্ছ কথা, নিতান্তই যা ঠাট্টা করে বলা, কিংবা রত্নার সঙ্গে মজা করার জন্যে বলা, বা সত্যি-সত্যি কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে বলা—তা নিয়ে এইসব কথা ওঠে কেন? রত্নার এই এক মস্ত দোষ। সোজা কথা বেঁকিয়ে নেয়, হাল্কা কথার অন্য মানে ধরে। অদ্ভুত! ওর মেজাজ বোঝা ভার। এই ভাল, এই মন্দ। একটু আগে হাসছে, সোহাগে গলছে—হঠাৎ একেবারে গম্ভীর, কঠিন, শক্ত হয়ে গেল। এমন মানুষের মন যুগিয়ে চলা বড় কঠিন। কাঁহাতক মেপে-মেপে ভেবে-চিন্তে কথা বলা যায়! হাজার হোক—তুমি আমার বউ, অফিসের রায়সাহেব নও, কিংবা এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস মুখার্জি নও যে সমঝে-সমঝে, নিচু গলায়, ভদ্রতা করে কথা বলতে হবে।

সুমিত বলল, 'তুমি ছোটখাটো বাজে কথা নিয়ে এত মাথা ঘামাও কেন?'

—'বাজে কথা! কোনটা বাজে কথা? তুমি বলোনি—কাল আমি তোমার মুণ্ডুপাত করেছি?'

—'বলেছি। সে তো ঠাট্টা। কাল ফিরতে দেরি হয়ে গেল বলে ভীষণ রাগারাগি করেছ। করোনি?'

—'আর তাই তুমি রাত্তিরে খেতে বসে অর্ধেক জিনিস পাতে ফেলে উঠে গেলে। মাংসটা বললে পানসে।'

—'কী মুশকিল! পর-পর দু-বার খাওয়া যায়!'

—'যাবে না কেন? তোমার রুচিতে লাগলেই যায়', রত্না বেঁকা করে বলল।

সুমিত বুঝতে পারল খোঁচাটা। বিরক্তি থেকে ক্রমশই সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। রেগে যাচ্ছিল। তবু কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কালকের কথা বাদ দাও। কাল কী হয়েছে, তার সঙ্গে আজকের কী। আজ আমি তাড়াতাড়ি ফিরেছি। তাতেই কী তোমার আহ্লাদ হল?'

—'কেন ফিরেছ? আমি তোমায় ফিরতে বলেছিলাম?'

—'বাঃ, এ দেখি অদ্ভুত ব্যাপার! শাঁখের করাত নাকি? এগুলেও কাটছ, পেছোলেও কাটছ।'

রত্না কেমন শক্ত হয়ে গেল। তার চোখ রুক্ষ হল। 'আমি শাঁখের করাত? বাইরে বুঝি এ-সব বলে বেড়াও ইয়ার-বন্ধুদের? বল, আমার বউ শাঁখের করাত!...আমি বুঝেছি, তোমাদের অফিসে বলেছ, আমার বাড়িতে শাঁখের করাত বউ রয়েছে, আমি ট্যুর-ডিউটি নিতে পারব না। নিলে আমাকে কাটবে—'

—'ওঃ! রত্না! প্লিজ—!'

—'তোমার টাকা রোজগারে আমি বাদ সাধলুম—!'

সুমিত চটে গেল। মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। বলল, 'তুমি এ-রকম বস্তিবাড়ির মতন ঝগড়া কর কেন? অদ্ভুত!...রোজ একটা-না-একটা ছুতো নিয়ে অশান্তি আর ঝগড়া!'

সুমিত এত রেগে গিয়েছিল, অসন্তুষ্ট, বিরক্ত যে আর বসে থাকতে পারল না। আর্ম চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। তারপর গজ-গজ করতে করতে বলল—'ঝগড়া, ঝগড়া আর ঝগড়া...হ্যাত্...' বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রত্না এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যেন সে হুঁশে নেই। মুখ কালো হয়ে উঠেছিল। গালের পাশে কালসিটের দাগ ধরার মতন নীলচে দেখাচ্ছিল। চোখের পাতা পড়ছে না। দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস যেন আটকে গেছে।

শক্ত, কঠিন, স্তব্ধ ভাবটা সামান্য কেটে গেল। কী বলল সুমিত? কী বলল? রত্না বস্তিবাড়ির মতন ঝগড়া করে? একটা ছুতো ধরে ঝগড়া করে রোজ? অশান্তি করে?

যেন সুমিতের সঙ্গে ঝগড়া করতেই যাচ্ছিল রত্না, হঠাৎ টেলিভিশনের দিকে চোখ পড়ল। দিল্লির খবর পড়া শুরু হয়েছে। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল টেলিভিশন। ঘর চুপচাপ। পাখা চলছে ধীরে-ধীরে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কেমন যেন লাগছিল। ভেতরে এক জ্বালা, নাকি কষ্ট, ছড়িয়ে যাচ্ছে। পা কাঁপছিল। কপালের দু-পাশে জ্বালা করছে। হাত ভিজে আসছে ঘামে।

রত্না এগিয়ে গিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার। বাতি নিবিয়ে পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় বসল। শ্বশুর-শাশুড়ির বিছানা। অন্যমনস্কভাবে আঁচলে হাত মুছল। মুখ মুছল।

সুমিত বলল, রত্না রোজ ঝগড়া করে। রোজ। রোজ অশান্তি করে।

সে তা হলে ঝগড়ুটে? অশান্তি করা, ঝগড়া করা তার স্বভাব।

জীবনে আজই প্রথম সে শুনল, সে ঝগড়ুটে। এর আগে কোনওদিন শোনেনি, কেউ বলেনি। মজা করে কী বলেছে, তা-ও ক-বার বলেছে—রত্নাকে হয়তো কষ্ট করে হিসেব করতে হবে। কিন্তু কোনওদিন কারও মুখে সে শোনেনি যে, রত্না ঝগড়া করে।

ঝগড়া করার অবস্থাটাই তার হল না। ছেলেবেলা থেকেই সে শান্ত, নম্র, ভীতু গোছের ছিল। একেবারে বাচ্চাবেলায় রত্নারা থাকত পুরনো আলিপুরে, জেঠামশাইয়ের বাড়িতে। সেই বাড়িটাকে ভুতুড়ে বাড়ি মনে হত। জেঠামশাই একপাশে পড়ে থাকতেন একরাশ পুরনো বই,

বিস্তর ধুলো, বুড়ো-এক কুকুর আর বারান্দার এক কোণে বড় এক গামলায় রাখা বিচ্ছিরি এক কচ্ছপ নিয়ে। উনি নিজের জেঠামশাই নন। বাবার জেঠামশাইয়ের ছেলে। সেই বাড়িতে দরজা-জানালাগুলোও যেন ভূতের হাতে বন্ধ হত, খুলত, শব্দ করত।

ওই বাড়ি ছেড়ে বাবা এল বাগবাজারের দিকে। সেই বাড়িও পুরনো। তার নিচের তলায় ছিল স্যাকরার দোকান আর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা। গঙ্গা ছিল কাছেই। সকাল-বিকেল কত লোক যেত গঙ্গায় স্নান করতে।

রত্না তখন ছোট, সাত-আট বয়েস। দাদা থাকত বাইরে। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। দাদা তার চেয়ে অনেক বড়। প্রায় দশবছরের। মা তখন চাকরি নিয়েছে। বাবা তো কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার। বাড়িতে থাকত ময়নামাসি। মা তাকে এনেছিল বনগাঁ থেকে। ময়নামাসি দেখাশোনা করত রত্নার। মাসি বড় ভাল ছিল। কথা বলত কম, কাজ করত বেশি, আর যখন-তখন পুজো করত। রত্নাকে বড় ভালবাসত। মা-বাবা অফিস চলে যাবার পর খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে নিয়ে যেত। টিফিনে যেত জলখাবার খাইয়ে আসতে। আবার ছুটি হলে বাড়ি নিয়ে আসত।

স্কুলেই যা একটু-আধটু খেলাধুলো করত রত্না। তা-ও সাবধানে। সে একেবারেই হইচই, চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি করত না। তার ভয় করত। বাড়িতে তো কোনও সঙ্গীই ছিল না রত্নার। মা-বাবার ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত। তার বাবা ভীষণ শান্ত মানুষ, মা নিজেও ধীর-স্থির। তাদের বাড়িতে হইচই, চেঁচামেচি একেবারেই হত না। যা হত সেটা হাসাহাসি, গল্প। মা-বাবা বাড়িতে একসঙ্গে থাকলেই চাকরিবাকরির কথা, টাকা-পয়সার কথা, দাদার কথা বলত। গল্প করত। রত্নাকে নিজে মজা করত। মা নিজে পড়াত রত্নাকে। বাবা মাঝে-মাঝে দোকানে নিয়ে যেত। লোকজন বাড়িতে এলে কিছুক্ষণের জন্যে হইহল্লা হত।

আর দাদা যখন হস্টেল থেকে বাড়ি আসত, বাড়ি যেন গন্ধে ভুরভুর করত। মা এটা রান্না করছে, ওটা রান্না করছে, বাবা দাদার জন্যে জামার কাপড় আনছে, প্যান্টের কাপড় কিনে আসছে; একবার আনল একটা ছোট ক্যামেরা। দাদাকে নিয়ে তখন সবাই ব্যস্ত।

রত্না দাদার বেশি কাছাকাছি ঘেঁষতে পারত না। দশবছরের বড় দাদা। সোজা কথা। দাদাও খানিকটা গাম্ভীর্য নিয়ে থাকত। মিশনারি স্কুলে হস্টেলে থেকে পড়ে। ষোলো-সতেরোতেই গোঁফ গজিয়ে গিয়েছে, খুব ভাল স্বাস্থ্য, কলেজে ঢুকেছে—ছোট বোনকে যেন পুতুল বলে মনে করত। এমনকী, বোনের সঙ্গে ক্যারাম পর্যন্ত খেলতে চাইত না। 'তুই কি ক্যারাম খেলবি, খুকি! যা, ময়নামাসিকে নিয়ে লুডো খেল।'

দেখতে-দেখতে রত্না বড় হল, দাদা আরও বড় হল। দাদা বাইরে-বাইরে। আর মা-বাবা বাগবাজার, টালা, পাতিপুকুর করতে-করতে লেক টাউন। এর মধ্যে কত-কী ঘটে গেছে। বাবার মাথা সাদা হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের চাকরি থেকে ছুটি পেয়ে বাবা অন্য এক জায়গায় আসে-যায় ; মায়ের চুলও সাদা হচ্ছে, বেশ মোটা হয়ে পড়েছে মা, ব্লাডপ্রেসারে ধরেছে, এখনও চাকরি আছে বছরখানেক। লেক টাউনে ছোটখাটো বাড়ি করেছে মা-বাবা। দাদার বিয়ে হয়েছে, ওদের মেয়ে আছে একটি। কিন্তু দূর থেকে আরও দূরে চলে গেছে।

রত্না বাড়ির কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘর অন্ধকার, পাখা চলছে একইভাবে।

রত্নার সারাটা ছেলেবেলা, কিশোরী বয়েস এবং যৌবনের গোড়া তো একা-একাই কেটেছে। সে শান্ত, নরম থেকে আরও নরম-স্বভাবের হয়ে উঠেছে। মা-বাবার ভালবাসা, যত্ন একাই ভোগ করেছে। তার হাঁটা, চলা, কথা-বলা, কোনওদিনই উগ্র বা রূঢ় হয়নি।

তবে এ-কথা ঠিক, একেবারে একা, একরকম সঙ্গীহীন থাকতে-থাকতে তার কখনও-কখনও বড় দুঃখ হত। কষ্ট হত।

রত্নার বেশ মনে আছে, লোটনমাসি, মা-র মামাতো বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সে একদিন দেখেছিল, বিনুদি কড়িদার গলায় মাফলার ঝুলিয়ে দিয়ে টানতে-টানতে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছে। কড়িদা চেঁচাচ্ছে—'মা, তোমার মেয়ে আমায় ফাঁসি দিচ্ছে! মরে যাব। দেখে যাও।' বিনুদির বয়ে গেছে। সে তার দাদার গলায় যেন গামছা দিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে সিনেমায় চলে গেল।

সে-দিন সারা রাত রত্না বিনুদি আর কড়িদার কথা ভেবেছে। কী সুন্দর ওরা!

এলি-বেলির কথাই ধরো না। ওরা তো পিঠোপিঠি বোন দু-জন। দু-বছরের ছোট-বড়। টালায় রত্নাদের পাশের বাড়িতে থাকত। দুটোই রোগাসোগা। দুই বোনে কী ঝগড়াই করত! পড়া নিয়ে, শাড়ি-জামা নিয়ে, শোওয়া নিয়ে, সামান্য চুলের ফিতে, ক্লিপ নিয়ে চুলোচুলি। আবার দ্যাখো, দু-জনে একসঙ্গে ছাদে বেড়াচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে, ফুচকাওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে দুই বোন ফুচকা খাচ্ছে।

রত্নার সবচেয়ে মজা লাগত ডলিদি আর যিশুদাকে দেখে। ডলিদি আর যিশুদা যমজ। এ মেয়ে, ও ছেলে। কে-যেন রেণুকাকিমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, সাবধানে রেখো, জোড়া ফল ভাল—তবে দু-রকম হলে—একটা থাকে অন্যটা যায়। সবই অবশ্য কপাল।

ডলিদি আর যিশুদা বড় হয়ে এ-সব কথা শুনেছে। শুনে মজা পেয়েছে। রেণুকাকিমাকে খেপিয়েছে। দুই ভাই-বোন এমন অদ্ভুত যে, ওরা একইসঙ্গে পড়াশোনা শুরু করল—একই ক্লাসে। স্কুল টপকাল একই বছরে। ডলিদি বেশি নম্বর পেল। যিশুদা একটু কম পেল। যিশুদা বলল, 'তুই আমার আগে এসেছিলি বলে বাইশ নম্বর বেশি পেয়েছিস। ভগবানের মার।' দু-জনে কলেজে পড়ল একই বিষয় নিয়ে। বাড়ির লোক কত বারণ করল। ওরা শুনল না। এম এ-তে যিশুদা ডলিদিকে টপকে গেল। বলল, 'দেখলি—ফিনিশটা কেমন দিলাম!' ডলিদি বলল, 'তোকে দয়া করলাম, হাজার হোক তুই ছেলে। তোর প্রেস্টিজ আছে।'

এই দুই ভাই-বোন যে কী ঝগড়াই করত! এ যদি বলে, আজ ইলিশ খেতে ইচ্ছে করছে, ও বলবে ভেটকি খাব; এ যদি বলে শ্যামবাজার ভাল ও বলবে বউবাজার ভাল। যিশুদা মোহনবাগান বলতে অজ্ঞান, ডলিদি ইস্টবেঙ্গল। দু-জনে একই ঘরে শোবে, সকাল থেকে এ ওর পিছনে লাগবে, একজনের কলম অন্যজন নিয়ে পালিয়ে যাবে, টাকা-পয়সা কেড়ে নেবে, চড়-চাপড় চালাবে। আবার যিশুদা রাত করে ফিরলে ডলিদি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, ডলিদির যদি দেরি হয় বাড়ি ফিরতে যিশুদা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

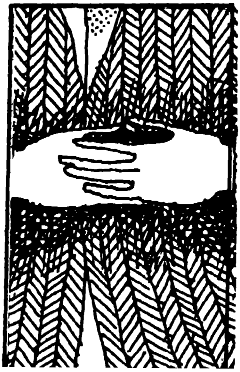
না, এর বিন্দুমাত্র রত্নার জীবনে আসেনি। সে কাউকে পায়নি যার সঙ্গে খেলা করে, ঝগড়া করে, রাগারাগি করে, খামচাখামচি করে দিন কাটাবে। এমন কেউ ছিল না যার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের রাগ, দুঃখ, হিংসে, রেষারেষি আবার গভীর ভালবাসার ফাঁসগুলো বাঁধা যায়। আর জীবন্ত হয়ে বাঁচা তো ওইরকমই—গনগনে হয়ে, ভেঙেচুরে, ভালবেসে, একের পাশে বসে, তার কষ্টে নিজে কষ্ট পেয়ে। রত্না যে-জীবন কাটিয়েছে তা ঠাণ্ডা। নিষ্প্রাণ। নিঃসঙ্গ। সেখানে কোনও তাপ নেই, উত্তাপ নেই। যেন কাঁচা ঠাণ্ডা একপাত্র দুধের মতন সে নামানো থাকত। কেউ তাকে টগবগ করে ফুটতে দিল না। ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকল।

শুয়ে থাকতে-থাকতে রত্না হঠাৎ উঠে পড়ল। কাঁদছিল সে।

পাশের ঘরে এসে দেখে সুমিত বিছানায় শুয়ে আছে। হাতে একটি চটি বই।

রত্না যেন ঝাঁপ দিয়ে সুমিতের গায়ের ওপর পড়ল। টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বই। জামা খামচে ধরল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ—আমি বস্তির লোক। ঝগড়া আমি করব। করব, করব, করব।' বলতে-বলতে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।





অপরাহ্ন

সুধাময় আরেকবার চিঠিটা খুলে পড়ল। এখন আর তেমন ভাল লাগল না। ভাবতে চেষ্টা করল, প্রথমবার পড়ার সময় ভাল লেগেছিল কি না।

হ্যাঁ, ভালই লেগেছিল। শরীরে রোমকূপগুলো ঠিক তেমনি আছে, একটা জিনিসই নেই, রোমাঞ্চ। চোখ সবই দেখতে পায়, শুধু রং নেই। এখন যেন সব ভুলে যেতে পারলেই ভাল ছিল।

সুধাময়কে একটু উদ্বিগ্ন দেখাল, কিংবা চাপা বিরক্ত। এখন নিয়মে বাঁধা থাকতেই ভাল লাগে। কোনও বিষয়ে কোনও উত্তেজনা ওর পছন্দ নয়। এমনিতেই হাজারো চিন্তা তার ওপর সুদীপ্তর চাকরি...

না, চিন্তা ওই একটাই।

সুধাময় কী করবে, ভাবল।

বছর-পাঁচেক আগে সুদেষ্ণা একটা চিঠি লিখেছিল। উত্তর চেয়েছিল।

চিঠিটা পেয়ে সুধাময় খুব খুশি-খুশি। দু-তিনবার পড়েছে। তক্ষুনি-তক্ষুনি উত্তর দিতে ইচ্ছে হয়েছে। চিঠি লেখার কোনও অসুবিধে নেই, শুধু একটাই অসুবিধে, স্পষ্ট করে কিছু লেখা যায় না। না-লিখলেই বা কী আসে-যায়! লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে আরও কী-কথা লুকিয়ে আছে, তা সুদেষ্ণার বুঝতে অসুবিধে হবে না। সুধাময় নিজেও তো সুদেষ্ণার চিঠির মধ্যে অব্যক্ত কথাগুলো দেখতে পায়, পড়তে পারে। তবু আরও স্পষ্ট করে কথাগুলো যদি সুদেষ্ণা লিখতে পারত, ও খুশি হত। লেখে না কেন, লেখায় তো কোনও বাধা নেই।

সুধাময় সে-বার ভেবেছিল, উত্তর দেবে। সত্যি, ইচ্ছেও হয়েছিল। এই একঘেয়ে গুমোট হাওয়ার বদ্ধ জীবনে হঠাৎ এক-দমকা বাতাস কার না ভাল লাগে! বিশেষ করে সে-বাতাসে যদি যৌবনের দিনগুলোর একটু স্নিগ্ধ সুগন্ধ থাকে।

কিন্তু খাম ছিল না। থাকলে তখনই লিখে ফেলত। সুদেষ্ণাকে খুশি করার মতো দু-একটা লাইন মনে-মনে ভেবেও নিয়েছিল।

বেয়ারা ফিরে এলেই একখানা খাম তাকে আনতে বলবে, ভেবে রেখেছিল। তার অফিসে আসার পথেই পোস্ট-অফিস পড়ে। মাঝে-মাঝে কেউ এনে দেয়। তা না-হলে সুধাময়কেই বাস থেকে নেমে লাইন দিয়ে কিনতে হয়।

শেষ অবধি খাম আনানোর কথা মনে ছিল না। অফিসের কাজের মধ্যে কখন ভুলে গিয়েছিল।

বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ মনে পড়তে একটু মনখারাপ হয়েছিল। বেচারি, নিশ্চয় সঙ্গে-

সঙ্গে উত্তর পাবার আশায় বসে থাকবে। না-পেলে রেগে যাবে, কিংবা কষ্ট পাবে। সুধাময় সুদেষ্ণাকে কষ্ট দিতে চায় না।

অনেকদিন বাদে-বাদে হঠাৎ-হঠাৎ চিঠি লিখত, আজকাল কমে গেছে। হয়তো কোনওদিন খুব নিঃসঙ্গ লাগত, সবকিছুর মধ্যেও একটা চাপা কান্নার মতো, আর তখন জানলার ধারে বসে উদাস পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার হয়তো সুধাময়কে মনে পড়ত। আর তখন-তখনই চিঠি লিখে ফেলত। সুধাময়ের এইসব ভাবতে ভাল লাগত। একবার উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু ব্যস, তারপর সুদেষ্ণা আবার চুপচাপ। সুধাময়ের অহমিকায় একটু ঘা লেগেছিল। একসময় লাগত না।

দু-দিন পরে যখন বেয়ারা খাম এনে দিল, তখন সুধাময়ের আগ্রহ চলে গেছে। তা হোক, তবু দু-চারলাইন উত্তর দিতে হবে, ভেবে রেখেছিল। কিন্তু শেষ অবধি আর উৎসাহ ছিল না। বেশ দেরি হয়ে গেছে, এখন আর লেখার কোনও মানেই হয় না—এই ধরনের মন-বোঝানো কথায় শেষ অবধি আর উত্তর দেওয়াই হয়নি।

এ-বারের চিঠিতে সে-প্রসঙ্গ টেনে কোনও অভিমান কিংবা অভিযোগ নেই। শুধু একটা কথাই আছে : 'ক-দিন থেকেই তোমার কথা ভাবছি, খুব দেখা করতে ইচ্ছে করছে।'

সুধাময় মনে-মনে হাসল। এখন আর সেই ছেলেমানুষি নেই। সুধাময় নিজেও অবশ্য তখন ছেলেমানুষি করত! কতই বা বয়েস!

সবে চাকরি পেয়েছে তখন। নতুন অফিস। এমনিতেই একটু অস্বস্তি বোধ করত। হঠাৎ দুপুরে সুদেষ্ণা এসে হাজির।

এক-মুখ হাসি নিয়ে বলল, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

এখন লিখেছে, 'খুব দেখা করতে ইচ্ছে করছে।'

সেই কম বয়সের উত্তেজনা আর সরলতায় যদি লিখত, 'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে', তা হলে, এই বয়সেও সুধাময়ের ভালই লাগত।

সুদেষ্ণা চিঠিপত্রে এখন খুব সাবধানী। কিন্তু একটু অসাবধান হলেই যেন ভাল ছিল।

সুধাময় কানের দু-পাশের চুলের ওপর হাত বোলাল। দুটো পাশই সাদা হয়ে আসছে। মাথার ওপরও। চেহারাতেও নিশ্চয় বয়সের ছাপ পড়েছে। সুধাময় অবশ্য ঠিক বুঝতে পারে না। আয়না কিংবা ফোটোগ্রাফ এখনও সত্যি কথা বলতে শেখেনি।

'তুমি না-এলে কিন্তু খুব দুঃখ পাব।'... চিঠির মধ্যে একটা লাইন।

সুধাময় হেসে ফেলল। অথচ একসময় এই শব্দগুলোকে সে যেন ছুঁতে পারত। শিহরন জাগত।

তা হলে তো একটু আগে-আগে বেরিয়ে পড়তে হয়। যা বাসট্রামের ভিড়, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, তার ওপর প্রসেশন থাকলে, সময়মতো গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।

কিন্তু কেমন-একটা আলস্য লাগছে। এই নিয়মের ভিতর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। একটা চাপা বিরক্তি। ও বেশ ছিল, দশটা-পাঁচটা অফিস করে এবং সংসার।

হঠাৎ এই চিঠিখানা এসে ওকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে।

সম্পর্কটা কী করে গড়ে উঠেছিল, আজ এতবছর বাদে এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। সন্দীপ তখন মাত্র দু-বছরের। অঞ্জলিও গিয়েছিল। আর সুদেষ্ণারা কলেজের কয়েক বন্ধু। কী-একটা গানের ফাংশন। টিপুকে সুদেষ্ণা আদর করছিল। টিপু সন্দীপের ডাকনাম।

আমি তো একসময় সুদেষ্ণার অনেক ভালবাসা পেয়েছি, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে সেটা সত্যি ভালবাসা ছিল—সুধাময় ভাবল। এবং নিশ্চয় আমার দিক থেকেও কোনও কপটতা ছিল না। সে যে কী জ্বালা, কী যন্ত্রণা, আর কী অফুরন্ত আনন্দ! লাটাইখানা সংসারের হাতে ধরা থেকেও রঙিন ঘুড়ির মত আকাশ জুড়ে কিছুক্ষণ উড়ে বেড়ানো। একটু আদর। এ-সবই কি শরীর? ভালবাসা নয়?

সম্পর্কটা কেন গড়ে উঠেছিল সুধাময় বুঝতে পারে না। কেমন-একটা রহস্য মনে হয়। অথচ সুদেষ্ণার দিক থেকে আর-কোনও চাওয়া ছিল না। ও জানত, ওরা কোথাও পৌঁছবে না। পৌঁছতে চায়ওনি।

মেট্রোর সামনে দ্বিতীয়বার দেখা হতেই, চোখাচোখি, সুধাময় হেসে ফেলল। চিনতে পেরে, সুদেষ্ণা এবং সুধাময়ের হাসি দেখে, মুখে একটু স্মিত হাসি টানল।

হাতে বই-খাতা, পাশে দুই বন্ধু, সেই তারাই কি না সুধাময় বুঝতে পারেনি, সুদেষ্ণার মুখে এবার এক-ঝলক বাড়তি হাসি, বন্ধু দু-জনকে দেখিয়ে বলল, এই সেই টিপু!

যেন সুধাময়ই টিপু।

ওরাও হাসল। একজন সুধাময়কে শুনিয়েই বলল, কী দুষ্টু বাবা!

তখনও সুধাময়ের মধ্যে কোনও ছলচাতুরি ছিল না। কিংবা কোনও সম্ভাবনার কথা ভাবেনি।

ওরা সিনেমা দেখতে চলে গেল। সুধাময় বাড়ি ফিরে এল। অঞ্জলিকে বলল, টিপুর নামটা মনে রেখেছে, সেই-যে আমাদের পাশে বসেছিল... ইত্যাদি।

অঞ্জলিকে খুশি-খুশি দেখাল। টিপুকে কেউ আদর করলে ও দারুণ খুশি হয়। সুধাময়েরও ভাল লাগে। 'কী দুষ্টু বাবা' কথাটা সুধাময়েরও ভাল লেগেছিল।

সুধাময় কব্জির ঘড়িটা দেখল।

এই ভিড়ের রাস্তায় যেতে ইচ্ছে নেই। ফেরার সময়ও অসুবিধে হবে। তা ছাড়া সুদেষ্ণা যতক্ষণ-না ওর বাসে উঠতে পারছে, সুধাময়কে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর নিজের বাস ধরা। ভিতরে-ভিতরে বিরক্ত হচ্ছিল সুধাময়। কিন্তু কেমন অসহায় লাগছে নিজেকে। যেন একটা কর্তব্য ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। ও যদি না-যায়, সুদেষ্ণা হয়তো আধঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে যাবে। খুবই দুঃখ পাবে। ওর মধ্যে হয়তো ভালবাসাটা মরে যায়নি। তা হলে আর আসবে কেন, দেখা করতে চাইবে কেন। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।' আজ, এতদিন বাদে। সুধাময়ের মনে হল, ইচ্ছেটা আজকের নয়, হয়তো এই সাত-সাতটা বছর ধরে ইচ্ছে হয়েছে, মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল। সুযোগ হয়নি।

এ-বার এসেছে, এসেই...

সুধাময় ওকে দুঃখ দিতে চায় না।

ঘড়ি দেখে বেরিয়ে পড়ল। মনে-মনে ভাবল, আমার মধ্যে যে সেই ভালবাসা মরে গেছে সে-টুকু সুদেষ্ণাকে জানতে দেব না। তা হলে ও যে শুধু দুঃখ পাবে তা-ই নয়, হয়তো আমাদের সেই ভালবাসার দিনগুলোকে মিথ্যে ভাববে। কিন্তু সুধাময় জানে, সেই দিনগুলো মিথ্যে নয়।

একটা কথা মনে পড়তেই হাসি পেল।

সাতবছর আগে আরেকবার এসেছিল সুদেষ্ণা।

ওরা একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল। বেশ যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল সুদেষ্ণার চোখে। ফিরে যাওয়ার কথা, ফিরে যেতে হবে, যেন ভুলেই গিয়েছিল। অন্তত সুধাময়ের তাই মনে হয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়ে ওর মনে হল, না-গেলেও হয়। যদি রাগারাগি করে চিঠি লিখে স্রেফ জানিয়ে দেওয়া যায়, চিঠি পাইনি। কিংবা দেরিতে পেয়েছি। আজকাল যা ডাকের গোলমাল, বিশ্বাস করবে।

সাতবছর আগেই, যে-দিন দেখা হল, সুদেষ্ণাকে ওর কেমন অচেনা লেগেছিল। সেই চেহারাটা কেমন বদলে গেছে। চোখ, চোখের দৃষ্টি। হাসিটাও।

সুধাময় হেসে ফেলল, ওকেও এ-বার হয়তো সুদেষ্ণার অচেনা মনে হবে। কারণ অসুখে ভুগে-ভুগে ওর চেহারা পাল্টে গেছে, চুলে পাক ধরেছে, মুখে বয়েসের ছাপ। হয়তো স্মৃতির-মধ্যে-ধরে-রাখা চেহারাটা মিলিয়ে নিতে পারবে না।

সুধাময়ের অস্বস্তি লাগছিল। ভিতরে-ভিতরে চাপা কৌতুক, একটু ভয়।

এই বয়সে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করা, ঘন-ঘন ঘড়ি দেখা, একটুও মানায় না। নিজেরই হাসি পায়। কী ছেলেমানুষি! সুদেষ্ণাও নেহাত ছেলেমানুষ নেই। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এমনকী চেহারাতেও বয়েসের ছাপ পড়েছে। ওর এ-সব ইচ্ছে হয় কী করে!

তৃতীয়বার দেখা হতেই, বাস-স্টপে, সুদেষ্ণা হাসেনি, একটু যেন অস্বস্তির ছায়া ওর চোখে, তারপরই হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল, টিপু, ভাল আছ?

সে-দিন সুদেষ্ণা একা বলেই হয়তো অস্বস্তি।

নাকি সুধাময় সে-দিন সুদেষ্ণাকে অন্য চোখে দেখছিল।

হঠাৎ সে বলে বসল, আসুন না একদিন।

কী হবে? অবাক হয়ে উচ্ছল হেসে বলে ফেলেছিল।

সুধাময় অপদস্থ বোধ করেছিল কি? হয়তো তার ছাপ পড়েছিল ওর মুখে-চোখে।

তাই সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এগিয়ে এসে বলেছিল, ঠিক আছে, ঠিকানাটা দিন, একদিন যেতেও পারি।

ওর খাতার পিছনে লিখে নিয়েছিল।

ভিড়ের বাসেই ঠেলেঠুলে উঠে পড়ল সুধাময়। ভাবল এইরকম ভিড় ঠেলেই তো সুদেষ্ণাকেও আসতে হবে। তা ছাড়া ওর আরও অনেক অসুবিধে।

সুদেষ্ণা ভেবেছিল, ওর বিয়ের খবরে সুধাময় খুব আঘাত পাবে।

কথাটা ও কিছুতেই যেন বলতে পারছিল না। অনেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শেষে বলেছিল। তারপরও অনেকক্ষণ ছিল।

এই, তুমি মিথ্যে কষ্ট পাবে না। সান্ত্বনার স্বরে বলেছিল, আমি কি মরে যাচ্ছি নাকি? আমি তো থাকবই।

সুধাময় আহত হয়েছিল কি না, কষ্ট পেয়েছিল কি না, এখন আর মনে নেই। তবে ওর বিয়েতে যেতে পারেনি। সুদেষ্ণাও বলেছিল, না, তুমি যাবে না।

সেই পুরনো জায়গাতেই দেখা করতে বলেছে। এই জায়গাটা বোধহয় ওর স্মৃতিতে একটা গোপন আনন্দ হয়ে আছে।

কিন্তু টিপু এখন সুদীপ্ত হয়ে আছে। এখন আর সুধাময়কে এ-সব মানায় না। সুদীপ্ত এ-দিক দিয়ে যদি আসে, বলা যায় না, কী অস্বস্তি!

তবু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সুধাময়। পায়চারি করল। ঘন-ঘন ঘড়ি দেখল।

এক-একবার সুধাময়ের মনে হচ্ছিল, না-এলেই যেন ভাল হয়। কাঁটায়-কাঁটায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেই ও চলে যাবে। তা হলেই মুক্তি।

গতবাররই, সেই সাতবছর আগে যখন দেখা হয়েছিল, তখনই সুধাময় টের পেয়েছিল ওর মধ্যে সেই ভালবাসা মরে গেছে। কিংবা সুদেষ্ণার শরীরে কোনও আকর্ষণ ছিল না বলেই।

জানো, আরেকটু হলেই আমি কেঁদে ফেলতাম।

সেই অল্প বয়সে, যখন গাঢ়ভাবে ওরা দু-জন দু-জনকে চাইছে, সুদেষ্ণা বলেছিল। সে-দিন এই নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে সুধাময়ের প্রায় একঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত রাস্তা জ্যাম! কোনওরকমে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু ভেবেছিল, সুদেষ্ণা অপেক্ষা করে-করে চলে গেছে।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েই সুদেষ্ণার মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এখনও মনে আছে। যে-দিন সুদেষ্ণা আসতে দেরি করত, সুধাময়েরও কান্না পেয়ে যেত।

আজকের এই আসা, অপেক্ষা করা, সেইসব দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর-কিছু নয়।

সুধাময়ের এখন আর ভাল লাগে না। এখন ও নিয়মে বাঁধা থাকতে চায়। জীবনে এখন আর কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই। স্বপ্ন নেই।

শরীরের যৌবনও এখন অভ্যস্ত পথ ধরেই হাঁটতে চায়।

নাকি সুদেষ্ণার শরীরই এখন আর আকর্ষণ করতে পারে না?

সুধাময় আবার ঘড়ি দেখল। যেন আধ-ঘণ্টা পার হয়ে গেলেই ও বেঁচে যায়।

আগেরবার যখন এল, দেখা হল, কোথায় গিয়ে বসবে সে-টুকুই যেন সমস্যা।

অথচ একসময়, এই সন্ধ্যা-নামা অন্ধকারে, কত পাশাপাশি হেঁটে বেড়িয়েছে।

একটা ম্লান হাসি, দেখা হতেই—কতক্ষণ এসেছ?

সুধাময় হাসতে-হাসতে জিগ্যেস করেছে, ছেলেমেয়েরা কত বড় হল?

দু-চারটে ঘরোয়া কথা।

তারপর সুদেষ্ণা হেসে উঠে বলেছিল, আসা যে কী ঝামেলা, বললাম নিউ মার্কেট যাব, কেনাকাটা আছে, ও বলে কি না, চলো আমিও যাই।

সুদেষ্ণা বলে ফেলেছিল, এ-সব রিস্ক কেন নিতে যাও?

ওর এ-ভাবে এত ছলচাতুরি করে আসা সুধাময়ের ভাল লাগেনি। কারণ ওর মধ্যে এখন ভালবাসা মরে গেছে।

ওর কথা শুনে সুদেষ্ণা থমকে চুপ করে গিয়েছিল।

তারপর খুব ধীরে-ধীরে বলেছিল, রিস্ক!

একটু থেমে—একসময় কিন্তু কোনওকিছুই তোমার রিস্ক মনে হত না।

সুধাময় কী করবে, হেসে হাল্কা করতে চেয়েছিল। পাছে সুদেষ্ণা দুঃখ পায়। ওর মনে হয়েছিল, সুদেষ্ণার মধ্যে এখনও ভালবাসা বেঁচে আছে। ওকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ। একটা মিথ্যে নিয়ে যদি বেঁচে থাকে, ক্ষতি কী।

ও হয়তো শরীর দিয়ে ভালবাসেনি, শরীর দিয়ে ভালবাসাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল।

তবু সুধাময়ের ভাল লাগছিল না। একসময় বলল, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

সুদেষ্ণা বোধহয় বুঝতে পারল। আসলে ওরও ভাল লাগছিল না। কোথায় যেন ছন্দ কেটে গেছে।

ঘড়ি দেখেই সুদেষ্ণা বলল, চলি। একবার নিউ মার্কেটে যেতে হবে।

হেসে উঠে বলল, কিছু তো কেনাকাটা করে নিয়ে যেতে হবে।

হাসিটা বানানো, সুধাময় বুঝতে পেরেছিল।

তারপরও সুদেষ্ণা চিঠি লিখবে, আসতে চাইবে, দেখা করতে চাইবে, সুধাময় ভাবেনি।

এ এক যন্ত্রণা।

কোনও আগ্রহ নেই, আকর্ষণ নেই, শুধু অভিনয় করে যাওয়া। তা না-হলে সুদেষ্ণা দুঃখ পাবে।

অভিনয় তো আগেও করেছে। সেইসব ছলচাতুরি, গাঢ় কণ্ঠস্বর—তার মধ্যেও কিছুটা অভিনয় তো ছিলই। কিন্তু তা ছাড়াও কিছু ছিল। ভালবাসা। দু-জনে দু-জনের জন্যে কী অসহ্য আকর্ষণ বোধ করত। কী উৎকণ্ঠা, কী উদ্বেগ।

একদিন না-এলে, অপেক্ষা করে-করে সুধাময়ের চোখে জল এসে যেত।

সুধাময় ভেবেছিল, বড় জোর আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে। তারপরই চলে যাবে। নিজের কাছে অন্তত অপরাধী থাকতে হবে না।

মনে-মনে ভাবছিল সুদেষ্ণা যদি না-আসতে পারে, তা হলেই ভাল।

ও অবিরত পায়চারি করে চলেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে। একজনকে একবার

মনে হল সুদেষ্ণার মতোই, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝল, না, সুদেষ্ণা নয়।

সন্ধ্যা নেমে আসছে।

ভিড় বাড়ছে।

এখানে অনেকেই জুড়ি বেঁধে ঘুরে বেড়াতে আসে। র‍্যাম্পার্ট-এ বসে ঘন হয়।

একসময় ওরাও বসেছে।

সুধাময় হঠাৎ ঘড়ি দেখল। আরে, আধঘণ্টা তো অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।

ও তো এখন চলে যেতে পারে। নিজেকে নিজের কাছে আর অপরাধী মনে হবে না।

অন্ধকারের মধ্যে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছোপ-ছোপ মাঝারি বালব-এর আলো পড়েছে। কালো ঘাসের ওপর টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্নার মতো।

আলো আর অন্ধকারে অনেকে ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছে।

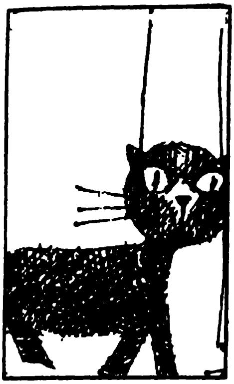
সুধাময় সুতীব্র চোখে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে, সুদেষ্ণা কি না।

ও একটা আলোর নিচে এসে দাঁড়াল। সুদেষ্ণা যাতে দূর থেকেই দেখতে পায়, চিনতে পারে। তা না-হলে হয়তো খুঁজে না-পেয়ে চলে যাবে।

সুধাময়ের এখন আর চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

এত কষ্ট করে যখন এসেছে, এতক্ষণ অপেক্ষা করছে, আরেকটু অপেক্ষা করতে দোষ কী। সুদেষ্ণা অন্তত এসে ফিরে যাবে না। এ-টুকু অন্তত সান্ত্বনা পাবে।





বিশদ চিঠি

ছুটির পর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিরুপমা শাড়িটাড়ি বদলে হাত-মুখ ধুয়ে—রোজ যেমন করে—মেনীর ঘরের তালা খুলল। জানালাগুলো খুলে দিল।

একটা জানালার শিকের সঙ্গে সিল্কের শিকল দিয়ে মেনী বাঁধা আছে। স্কুলে যাবার সময় নিরুপমা রোজই মেনীকে এ-ভাবে বেঁধে রেখে নিজের হাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে যায়।

শিক থেকে সিল্কের শিকল খুলে মেনীকে শিকলসমেত কোলে তুলে নিল নিরুপমা। মেনীর কী আহ্লাদ তখন!

নতুন কিছু নয়, নিত্যদিনের ঘটনা।

মেনীকে কোলে নিয়ে আদর করতে-করতে নিরুপমা নিজের ঘরে এসে বসল।

ঠিক সেই সময়ে একবাটি দুধ নিয়ে পদ্মাবতী ঘরে ঢুকল। ঠিক এই সময়ে একবাটি দুধ নিয়ে হাজির হতে না-পারলে পদ্মাবতীর কপালে দুঃখ আছে—পদ্মাবতী সে-কথা মর্মে-মর্মে জানে। নিরুপমার বাড়িতে কাজ করতে হলে আগে মেনীর সেবাযত্ন, পরে অন্য কথা।

পদ্মাবতী সযত্নে দুধের বাটি রাখল টেবিলে। নিরুপমা আদর করে মেনীকে বলল, মেনীসোনা, তোমার দুধ এসে গেছে। খা—ও।

সিল্কের শিকল একটু আলগা করে দিল নিরুপমা। এগিয়ে এসে মেনী চকচক করে দুধ খেতে লাগল। দুধ আধাআধি খাওয়া হয়ে গেলে পদ্মাবতী আস্তে-আস্তে বলল, দিদিমণি, এ-বার কি তোমার চায়ের জল চড়িয়ে দেব?

—দাও। আজ কি কোনও খবর আছে?

দিনের পর দিন একই প্রশ্ন! পদ্মাবতী ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, দিদিমণি, কোনও হুলো আসেনি। তা ছাড়া তুমি মেনীর ঘরের দরজা-জানালা যে-ভাবে বন্ধ করে যাও, হুলো তো দূরের কথা, একটা টিকটিকির পর্যন্ত ও-ঘরে ঢোকার সাধ্য নেই।

নিরুপমা শান্ত গলায় হাসল। বলল, সে-কথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! আমি বেঁচে থাকতে কোনও হুলোর সাধ্য আছে যে মেনীর ঘরে ঢোকে। মেনীর ঘরের কথা ছেড়ে দাও, তুমি কড়া নজর রাখবে যেন আমাদের বাড়িতেও কোনও হুলোর টিকি না-দেখা যায়।

পদ্মাবতী ঘাড় হেলিয়ে বলল, দিদিমণি খুব কড়া নজর রেখেছি। আজ পর্যন্ত কোনও হুলো এ-বাড়ির ধারে-কাছে আসেনি। আমি থাকতে হুলো ঢুকবে? ঝেঁটিয়ে দূর করে দেব! তুমি তো জানো, দিদিমণি, হুলো আর পুরুষজাত আমাদের দু-চোখের বিষ।

নিরুপমা খুশি হয়ে হাসল। সাধে কি আর নিরুপমা পদ্মাবতীকে এত পছন্দ করে।

পদ্মাবতীর মেরুদণ্ড আছে। সে হুলো আর পুরুষজাতকে দু-চোখে দেখতে পারে না। পদ্মাবতীর সঙ্গে এ-দিকে নিরুপমার ষোলোআনা মিল।

নিরুপমা, বলা বাহুল্য, পুরুষ-জাতকে দু-চোখে দেখতে পারে না। বিয়ে করলে পুরুষমানুষকেই বিয়ে করতে হত—কেবলমাত্র এই কারণে নিরুপমা অবিবাহিত থেকে গেল। বেঁচে গেছে বাপু!

কিন্তু পুরুষজাতকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলার তো উপায় নেই। রাস্তাঘাট আছে, হাট-বাজার আছে, স্কুল-কলেজ আছে, ট্রাম-বাস আছে, ডাক্তার-বদ্যি আছে, কত কী আছে—সর্বত্র বলতে গেলে পুরুষজাতের রাজত্ব। নিরুপায় হয়ে যেতেই হয় পুরুষমানুষের কাছে, দু-একটা কথাও বলতে হয়। কিন্তু নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে নিরুপমা একটি অক্ষরও খরচ করে না।

পুরুষজাতের প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে দুরভিসন্ধি। সাবধান! নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে নিরুপমা এমন বয়সে এনে ফেলেছে যে এখন আর নিজের জন্য ভয়ের কিছু নেই।

এখন সব ভয় মেনীসোনার জন্য। সাবধান, কোনওদিক থেকে কোনও হুলো এসে যেন মেনীসোনার সর্বনাশ করে যেতে না-পারে।

যতক্ষণ নিরুপমা বাড়ির বাইরে থাকে, ততক্ষণ মেনীসোনা ঘরে বন্দি থাকে। গলায় সিল্কের শিকল, দরজা-জানালা বন্ধ। আর নিরুপমা যখন বাড়িতে থাকে, তখন আর কথা কী, তখন সিল্কের শিকলের একদিক মেনীসোনার গলায়, আর আরেকদিক নিরুপমার হাতে।

সে-দিন হঠাৎ নিরুপমার ছেলেবেলার বন্ধু শীলা এসে উপস্থিত। হঠাৎ শীলাকে দেখে নিরুপমা অবাক হয়ে বলল, আরে শীলা! বোস, বোস। পদ্মা, ও পদ্মা, শীলা এসেছে, দু-কাপ চা এনো।

রান্নাঘর থেকে পদ্মাবতী সাড়া দিল, আচ্ছা।

চেয়ারে গুছিয়ে বসে শীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কী আরামেই আছ, নিরু। তোমাকে দেখলে হিংসায় বুক জ্বলে যায়। পুরুষজাতকে তুমি ঠিকই চিনেছ।

নিরুপমা সামান্য একটু হাসল, তুমি ঠিক চেনোনি?

শীলাও হাসল। বলল, চিনেছি। কিন্তু বিয়ের অনেক পরে। আগে যদি চিনতে পারতাম তো কিছুতেই বিয়ে করতাম না, তোমার মতো দিব্যি আরামে জীবন কাটিয়ে দিতাম। কী অসভ্য, কী অসভ্য!

—আসল কথাটা কী জানো?—যেন ক্লাসের মেয়েদের পড়াচ্ছে এমনি গলায় নিরুপমা বলল, সব মেয়েই একদিন-না-একদিন পুরুষজাতকে চিনতে পারে। কেউ বিয়ের আগে, কেউ বিয়ের পর। বিয়ের পর যারা চিনতে পারে, তারা পস্তায়। আগে যারা চিনতে পারে, তারা পস্তানোর রাস্তাতেই যায় না।

শীলা হতাশ হয়ে বলল, আমি ভাই প্রথম দলে, এখন পস্তাচ্ছি। কী আর করা, এ-জন্মে আমার আর উদ্ধার নেই।

পদ্মাবতী দু-কাপ চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরুপমা বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। নিজের জন্য তোমার তো আর-কিছু করার নেই, আমার কথা শোনো, দু-একজন মেয়েকেও যদি পস্তানোর রাস্তা থেকে বাঁচাতে পার তো একটা কাজের মতো কাজ হয়। অন্তত একটা মহৎ সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারবে।

মহৎ সান্ত্বনা নিয়ে মরবার আশাতেই শীলা আজ নিরুপমার কাছে এসেছে। শীলা অতএব সরাসরি বলল, সেই কাজের জন্যই আজ তোমার কাছে এসেছি। আমার বোনঝি মাধবীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।

—তোমার বোনঝি মাধবী কোথায় থাকে?

—মেদিনীপুরে।

—কী বিপদ হয়েছে?

শীলা একটু ঘন হয়ে বসল। বলল, চাকরি পেয়েছে কলকাতায়। এখানে আমার বাড়ি ছাড়া আর থাকবার জায়গা নেই, কিন্তু সে কিছুতেই আমার বাড়িতে থাকতে চায় না।

নিরুপমা অবাক হয়ে বলল, কেন?

—মাধবী বলে, 'মাসি, তোমার বাড়িতে পুরুষমানুষদের বড্ড উৎপাত, ওখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং আমি গাছতলায় থেকে কলকাতায় চাকরি করব, কিন্তু কিছুতেই তোমার বাড়িতে থাকব না।' আসল কথা কী জানো, পুরুষজাত মাধবীর দু-চোখের বিষ, পুরুষমানুষের ছায়াটুকু পর্যন্ত সে সইতে পারে না।

নিরুপমা উদার গলায় বলল, এমন মেয়ে এখনও আমাদের দেশে আছে? এমন মেয়ে একটি থাকলেও মস্ত ভরসার কথা—দেশ এগিয়ে যাবে। এমন মেয়েকে দেখলে চোখ সার্থক হয়।

নিরুপমার চোখে চোখ রেখে শীলা বলল, তোমার ওপর মাধবীর অচলা ভক্তি। বলে, 'নিরুমাসির বাড়ি অথবা গাছতলা। এ-ছাড়া আমি কলকাতায় আর কোথাও থাকব না।' তা আমি এখন কী করি বলো তো?

নিরুপমা আশ্বাস দিয়ে বলল, এর মধ্যে আর করার কী আছে। মাধবীর মতো মেয়ে আমার বাড়িতে থাকবে না তো কি গাছতলায় থাকবে? এ তো খুব সুখের কথা। মাধবীর মতো মেয়ে আর মেনীসোনার মতো বিড়ালি যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ি তো স্বর্গ।

স্বর্গসুখের কথা শুনে বাকি আধকাপ চা শীলা এক-চুমুকে শেষ করে দিল। দু-দিন বাদেই নিরুপমার বাড়িতে এসে উঠল মাধবী। নিরুপমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, তুমি আমাকে বাঁচালে, নিরুমাসি। তোমার বাড়িতে জায়গা না পেলে আমার কী দশা হত কে জানে।

মাধবীর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে নিরুপমা বলল, তোমার মতো মেয়েকে জায়গা দিতে না-পারলে এ-বাড়ি আছে কীসের জন্য? তোমার মতো মেয়ে তো আর গণ্ডায়-গণ্ডায় জন্মায় না।

নিজের প্রশংসা শুনে মাধবী লজ্জায় চুপ করে রইল।

কিন্তু নিরুপমা চুপ করল না। বলল, অনেক কুচ্ছিত মেয়ের চোখে পুরুষমানুষ দু-চোখের বিষ। তাতে পুরুষমানুষেরা খুব বেশি কাহিল হয় না। কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী যখন পুরুষমানুষদের পায়ে ঠেলে তখন ওদের বুক ভেঙে যায়। ভাঙুক। তুমি পুরুষমানুষদের বুক ভাঙো, আর মেনীসোনা হুলোদের বুক চুরমার করে দিক। তুমি আর মেনীসোনা আমার গর্ব হয়ে থাকো।

পরদিনই নতুন চাকরিতে জয়েন করল মাধবী।

নতুন চাকরিতে এসে মাধবীর বুক দুর-দুর করতে লাগল। আপিসে কয়েকজন মেয়ে আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই অল্প। চতুর্দিকে কেবল পুরুষমানুষ, কেবল পুরুষমানুষ, কেবল পুরুষমানুষ। দু-চোখের বিষ।

বড়বাবু মাধবীকে নিজের পাশের চেয়ারে বসালেন। বললেন, মিস মুখার্জি, আপনাকে গৌতমের সিটে দিলাম। আপনি গৌতমের কাছ থেকে কাজটাজ বুঝে নিন, কোনও অসুবিধে হবে না। গৌতমকে অন্য-একটা সিটে দিচ্ছি। গৌতম, এ-দিকে একটু শুনে যাও তো।

কী-একখানা বই পড়ছিল গৌতম। বইখানা টেবিলে রেখে ধীরেসুস্থে বড়বাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

ডিউটি লিস্টে চোখ বোলাতে-বোলাতে বড়বাবু বললেন, মিস মুখার্জিকে তোমার সিটে দিলাম। একেবারে নতুন তো, তুমি একটু কাজটাজ দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ো। আর বাজেটের সিটটা তুমি নাও।

—বাজেটের ঝামেলার সিটটাই আমাকে দিলেন?

বড়বাবু অসহায়ের মতো ভঙ্গি করে বললেন, তা তুমি ছাড়া আর কাকে দেব বলো? যত ঝামেলাই থাক, তুমি ঠিক সামাল দিতে পারবে। গোড়ার দিকে তোমাকে হয়তো একটু বেশি খাটতে হবে, আমি বুড়োমানুষ আমার ওপর রাগ কোরো না বাবা।

গৌতম হেসে ফেলল। বলল, না না, রাগ করব কেন। ঠিক আছে।

বলে নিজের সিটে গিয়ে আবার বই খুলে বসল। মাধবীর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

বড়বাবু স্নিগ্ধ গলায় মাধবীকে বললেন, হিরের টুকরো, হিরের টুকরো। গৌতমের মতো ছেলে লাখে একটাও মেলে না। দু-ঘণ্টার মধ্যে আপিসের কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে দেয়, তারপর আপনমনে বই পড়ে, কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না।

নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে একটি অক্ষরও খরচ করতে চায় না বলে মাধবী চুপ করে রইল।

হপ্তাখানেক কেটে গেল। রাশি-রাশি চিঠি সই করে নিতে হচ্ছে মাধবীকে, চিঠিগুলি নিয়ে মাধবী সযত্নে বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিচ্ছে। চুপচাপ। বড়বাবু হঠাৎ একদিন চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, মিস মুখার্জি, সব চিঠি আপনি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিচ্ছেন, ডিসপোজাল দিচ্ছেন না? একটা-একটা করে ধরুন, ডিসপোজাল দিন, তা না-হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কী

করতে হবে গৌতমের কাছে বুঝে নিন। বুঝলেন, একশো তিরাশি নম্বরের চিঠিখানার জবাব আজ দিতেই হবে।

বাণ্ডিল থেকে একশো তিরাশি নম্বরের চিঠিখানা খুঁজে বের করল মাধবী। চিঠিখানা হাতে নিয়ে গৌতমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গৌতম একখানা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। অগত্যা মাধবী আস্তে-আস্তে বলল, এই চিঠিখানা নিয়ে কী করব?

—উঁ? বলে বইয়ের পাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল গৌতম। বইখানা উল্টে রাখল। চিঠিখানা পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, এই চিঠি ফেলে রেখেছেন?

—কী করব?

—তাড়াতাড়ি অ্যাডভান্সের ফাইলটা নিয়ে আসুন।

—অ্যাডভান্সের ফাইল?

এতক্ষণে মাধবীর মুখের দিকে তাকাল গৌতম। বলল, ওঃ হো, আপনি তো নতুন এসেছেন, কিছুই জানেন না। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। আপনার টেবিলেই অ্যাডভান্সের ফাইল আছে—নাম্বার, সেন্ট্রাল অ্যাডভান্স ওয়ান-টুয়েন্টি। নিয়ে আসুন।

মাধবী নিজের টেবিলে এসে খুঁজে-খুঁজে বের করল ফাইল নাম্বার সেন্ট্রাল অ্যাডভান্স ওয়ান-টুয়েন্টি। ফাইল নিয়ে আবার যেতে হল গৌতমের কাছে। ফাইল খুলে দু-একখানা চিঠি পড়ে গৌতম বলল, সব ঠিক আছে। উত্তর দিয়ে দিন। ভেরি সিম্পল রিপ্লাই।

মাধবী নিরুপায়ের মত বলল, কী লিখব?

গৌতম গড়গড় করে একগাদা ইংরেজি বলে গেল, মাধবী কিছুই ঠাহর করতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গৌতমের মুখের দিকে।

যেন মাধবীর অবস্থা বুঝতে পারল গৌতম। বলল, ওঃ হো আপনি তো নতুন এসেছেন, কিছুই জানেন না। ঠিক আছে, আপনি কাগজ-কলম নিয়ে আসুন, আমি মুখে-মুখে বলে যাচ্ছি, আপনি লিখে নিন।

কী আর করা, কাগজ-কলম নিয়ে, একখানা চেয়ার টেনে গৌতমের পাশে বসে পড়ল মাধবী। গৌতম আস্তে-আস্তে বলে গেল, মাধবী আস্তে-আস্তে লিখে নিল।

তারপর গৌতম আবার বইয়ের পাতায় ডুব দিল। আর গৌতমের এই নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে মাধবীর মনে হল যে পুরুষজাত সত্যি-সত্যি দু-চোখের বিষ, পুরুষজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত সত্যি-সত্যি অসহ্য। নিরুমাসি পুরুষজাতকে ঠিকই চিনেছে, নিরুমাসির পায়ে শত-কোটি প্রণাম।

দিনে অন্তত দু-একখানা চিঠি না-লিখলেই নয়। অতএব মাধবীকে রোজই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে গৌতমের কাছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে গৌতমের পাশে। গৌতমের মুখে শুনে আস্তে-আস্তে লিখে নিতে হচ্ছে চিঠির উত্তর। সব যেন লোকটার মুখস্থ।

কিন্তু কাজটুকু মিটে গেলেই গৌতম বইয়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বইয়ের মধ্যে যেন গুপ্তধনের হদিশ লেখা আছে।

মাসখানেক বাদে গৌতম একদিন বিরক্ত হয়ে বলল, আপনার মাথায় কি কিছু নেই?

মাধবীর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বলল, কেন?

—মাসখানেক ধরে এত চিঠি লিখিয়ে দিলাম, এখনও নিজে-নিজে লিখতে পারেন না? সরকারি আপিসের চিঠি, সব চিঠিই তো প্রায় একরকম, একখানা চিঠি দেখেই তো দশখানা চিঠি লেখা যায়। সামান্য একটু মাথা খাটান, দেখবেন নিজে-নিজেই সব পেরে যাবেন। একেবারে জলভাতের মতো ব্যাপার।

মাধবী রাগ করে নিজের সিটে ফিরে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখল।

সে-দিন আর গৌতম বইয়ের মধ্যে ডুব দিতে পারল না। নিজের সিট থেকে উঠে এসে মাধবীর সিটের কাছে দাঁড়াল। বলল, মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না, হঠাৎ মুখ থেকে দু-একটা কড়া কথা বেরিয়ে গেছে। একটা বাজে বই পড়ে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।

মাধবী মুখ তুলল। সামান্য জলে দু-চোখ ভিজে আছে। ভারী গলায় বলল, মনে করবার কী আছে? আমার মাথায় কিছু নেই। ঠিক কথা। কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। যা পারি নিজেই করব। না পারি তো চাকরি যাবে—যাক।

গৌতম মিষ্টি করে হাসল। বলল, সরকারি চাকরি অত সহজে যায় না। কাজ না-পারলেই বা না-করলেই সরকারি চাকরি চলে যাবে? ইংরেজ আমলে হয়তো সে-সব অবিচার চলত, কিন্তু আজকাল আমাদের স্বাধীন দেশে অমন অবিচার অভাবনীয়, অচল। চলবে না, চলবে না। আপনি পাগল হয়েছেন!

মাধবী ফণা তুলে উঠল, একটু আগে বলেছেন যে আমার মাথায় কিছু নেই, এখন আবার বলছেন যে আমি পাগল?

গৌতম হতভম্ব হয়ে বলল, কখন বলেছি যে আপনার মাথায় কিছু নেই? হ্যাঁ, আপনি পাগল হয়েছেন কি না জিগ্যেস করেছি বটে, কিন্তু এ-পাগল তো সে-পাগল নয়।

সেকশনসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে গৌতম আর মাধবীর দিকে, নিখরচায় রগড়ের নাটক দেখছে, কিন্তু নাটকের নায়ক-নায়িকার সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই সামান্য সূত্রপাত থেকে আসল নাটক নায়ক-নায়িকাকে কোথায় নিয়ে যায়? রেস্তোরাঁয়, ইডেন গার্ডেনে, লেকে, ময়দানে, ব্যান্ডেলের গির্জায়, সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়, শম্ভু মিত্রের থিয়েটারে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরুমাসি ও-সব দিকে যায় না। অতএব নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতে কখনও-কখনও অবশ্যই মাধবীর দেরি হয়ে যায়। একদিন নিরুমাসি খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, মাধবী, আজ তোমার এত দেরি হল কেন? আমি ভেবে মরি।

মাধবী অভয় দিয়ে বলল, ভাবনার কিছু নেই নিরুমাসি। উঃ কলকাতার পরিবহণের যা অবস্থা!

নিরুমাসি আশ্বস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় পরিবহণের দুরবস্থা একেবারে চরম। আজও

তো কাগজে পরিবহণের ব্যাপার নিয়ে তেজি এডিটোরিয়াল আছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাধবী মনে-মানে ভাবল, ভাগ্যিস, কলকাতায় পরিবহণের দুরবস্থা আছে। ভাগ্যিস, তা নিয়ে কাগজে তেজি এডিটোরিয়াল থাকে।

না-বললেও চলে নিশ্চয়, আজকাল গৌতম বাদে পুরুষজাত মাধবীর দু-চোখের বিষ, গৌতম বাদে পুরুষজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাধবী সইতে পারে না।

এতদিনে মাধবীর মুখ থেকে গৌতমও নিরুমাসির কথা জেনে গেছে। ভেবেচিন্তে গৌতম একদিন বলল, তোমার নিরুমাসির সামনে তো আমি কস্মিনকালেও যেতে পারব না।

মাধবী ঘাড় নেড়ে বলল, কস্মিনকালেও না।

সব কাজ গোপনে সেরে ফেলতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার আগে নিরুমাসি যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না-পায়।

গৌতমের মা-বাবা দিল্লিতে থাকেন। এখানে গৌতম একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে। মা-বাবাকে আগে কি কিছু জানানো দরকার?

মাধবীর মাথায় হাত রেখে গৌতম বলল, আমার মা-বাবা খুব লিবার‍্যাল। আগে না-জানালেও ওঁরা কিছু মনে করবেন না। রেজিস্ট্রিই করি আর পুরুতই ডাকি—ওঁদের কাছে সবই সমান। আমি বিয়ে করলেই ওঁরা খুশি। আমি তো ভেবেছিলাম যে জীবনে বিয়েই করব না, কারণ বরাবর মেয়েজাত আমার দু-চোখের বিষ, মেয়েজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত আমার অসহ্য।

মাধবী মিষ্টি করে হাসল, এখনও?

—এখনও। তুমি বাদে।

গৌতম ও মাধবী নামী অপিসে কাজ করে। ছুটিফুটি নিতে হল না, দু-জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে দুপুরবেলা রেজিস্ট্রি করে আবার আপিসে ফিরে এল। শুভকর্ম গোপনে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

আগেই টিকিট কাটা হয়ে আছে, আগেই সাব্যস্ত হয়ে আছে যে সে-দিন রাত্রির ট্রেনেই হনিমুন করতে দু-জনে দার্জিলিং যাবে।

নিরুমাসির আগেই সে-দিন আপিস থেকে বাড়িতে চলে এল মাধবী। বাক্সবিছানা বাঁধাছাদা করে তৈরি হয়ে রইল।

স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফিরে এসে নিরুমাসি অবাক হয়ে বলল, এ কী ব্যাপার, মাধবী?

মাধবী মাথা নিচু করে বলল, নিরুমাসি, তোমাদের বাড়িতে থাকার যোগ্যতা আমার আর নেই।

নিরুমাসি ব্যস্ত হয়ে বলল, কেন? বাড়িতে কি হুলো ঢুকে পড়েছে?

—না না, সে-সব কিছু না, আমি আজ হনিমুনে যাচ্ছি।

অবস্থাটা বুঝে নিতে নিরুমাসি একটু সময় নিল। তারপর বলল, ক-দিনের জন্য হনিমুন? কোথায়?

—ও তো বলেছে মাসখানেক। দার্জিলিং। ডানহাতের একটা আঙুল তুলে নিরুমাসি বলল, মাসখানেক লাগবে না। পস্তাতে তোমার পক্ষে পনেরোদিনই যথেষ্ট। পনেরোদিনের মধ্যেই তুমি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারবে কেন পুরুষজাত দু-চোখের বিষ, কেন পুরুষজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে নেই।

মাধবী চুপ করে রইল।

বাঁ-হাত থেকে ছাতাখানা ডানহাতে এনে নিরুমাসি বলল, ভুল তোমার অবশ্যই ভাঙবে, তখন কারও কিছু করার নেই। যাকগে। তুমি শুধু আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও।

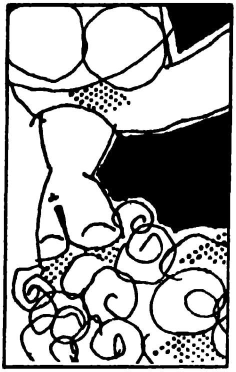
—কী কথা?

—পনেরোদিন বাদে তোমার মনের আসল অবস্থা জানিয়ে আমাকে একখানা বিশদ চিঠি লিখবে। কথা দিয়ে যাও।

নিরুমাসির পায়ের ধুলো নিয়ে মাধবী বলল, কথা দিলাম।

ট্যাক্সি ডেকে মাধবী চলে গেল। এবং কথা রাখল।

ঠিক পনেরোদিন বাদে নিরুমাসি একখানা বিশদ চিঠি পেল। মাত্র দশটি শব্দে একখানা বিশদ চিঠি : "নিরুমাসি, তোমার পায়ে পড়ি, মেনীসোনাকে ছেড়ে দাও।— ইতি মাধবী বসু।" ●



স্বামী ও প্রেমিক

রাতভর মাথা-খারাপ করে দেওয়া বৃষ্টির পর সকালে রাস্তায় এক-কোমর জল। আর তার মধ্যে একটা লোক এসে সুকোমলের ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বাজাল। সুকোমল দরজা খুলে বলল, কাকে চাই?

লোকটা বলল, আপনিই কি সুকোমল বসুরায়?

লোকটার চেহারায় রুক্ষতা। রোগা ঢ্যাঙা গড়ন। লম্বা নাক। পাতলা ঠোঁট। বড়-বড় কানে লোম আছে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। পরনে যেমন-তেমন প্যান্ট-শার্ট। চওড়া কপালের ওপর অগোছালো চুল সরিয়ে সে সুকোমলকে কুতকুতে চোখ দিয়ে দেখছিল। সুকোমল বলল, হ্যাঁ। আমিই সুকোমল বসুরায়। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

তা হলে আপনিই সুকোমল বসুরায়! লোকটা যেন নিজেকে শোনাতেই কথাটা আস্তে উচ্চারণ করল । তারপর সেইরকম কুতকুতে চাউনিতে তাকিয়ে ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার সঙ্গে গোটাকতক জরুরি কথা আছে।

সুকোমল বলল, বেশ তো! কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন—আপনার নামটা?

—আমি জ্ঞানেশ মিত্র।

—আচ্ছা! বলুন জ্ঞনেশবাবু! সুকোমল একটু হাসল। লোকটার মধ্যে কী-একটা অস্বাভাবিকতা আছে, ঠিক ধরতে পারছিল না সে। অথচ ঝটপট কোনও আগন্তুকের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মতো অভদ্র মানুষও সে নয়।

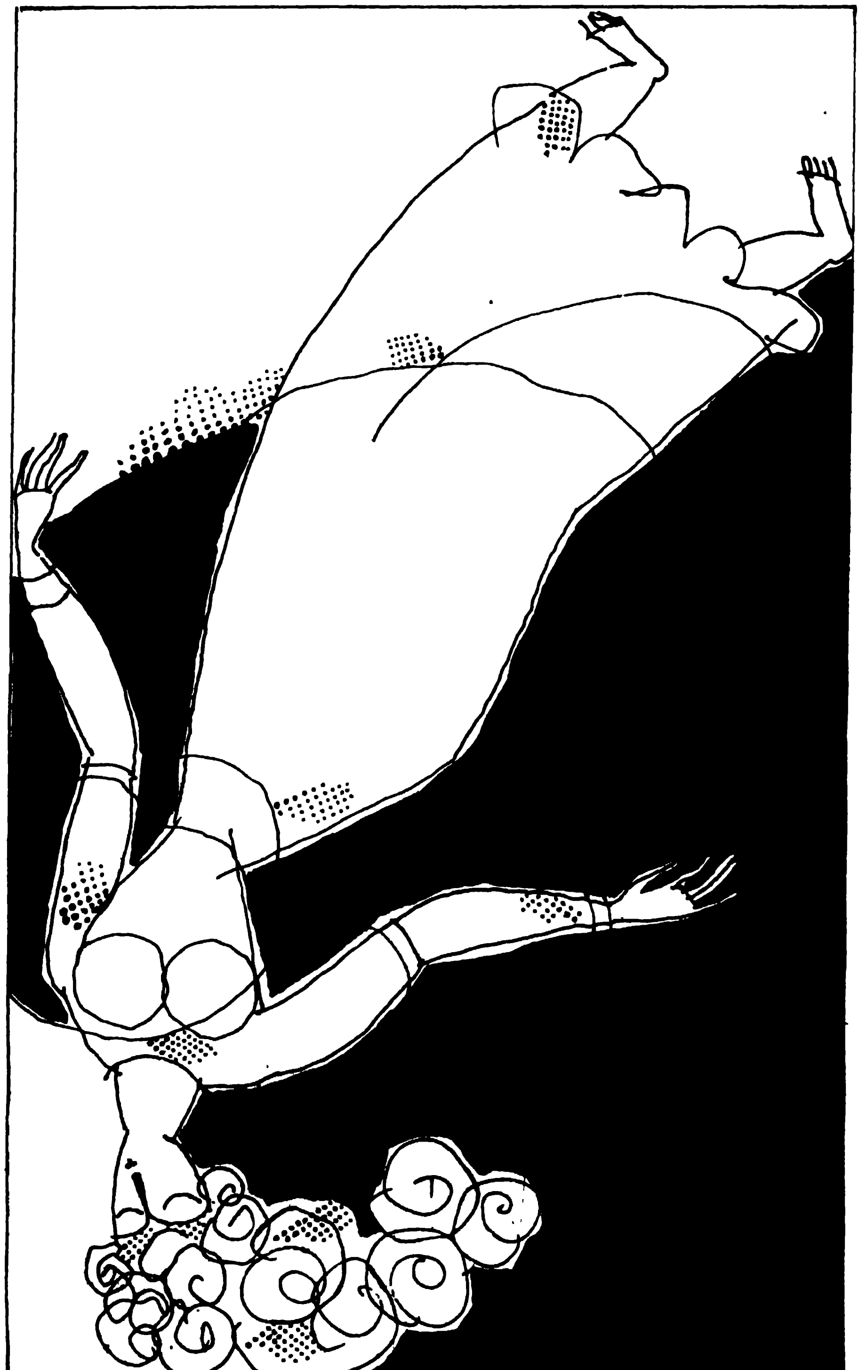
লোকটার ঠোঁটের কোনায় সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে আবার ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, যাক। চিনেছেন তা হলে! চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

সে সুকোমলকে একরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। সুকোমল বিরক্ত। কিন্তু সে একটা কোম্পানির গণসংযোগ অফিসার। সে জানে, কিছু লোকের স্বভাব এ-রকম। লোকটা ঘুরে ঢুকে প্রথমে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, আপনি একা থাকেন দেখছি! হুঁ, সেটাই আপনার সুবিধা।

সুকোমল তার স্বভাবসুলভ এবং অভ্যস্ত ধৈর্যের সীমানা থেকে হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না, জ্ঞানেশবাবু! এই প্রথম আপনার নাম শুনলাম। যাই হোক, আপনি বসুন। বলুন কী আপনার জরুরি কথা।

লোকটা রুক্ষ স্বরে বলল, চেনেন না?

—না। সুকোমল হাসিমুখে মাথাটা একটু দোলাল।



লোকটা সোফার একপাশে বসে পড়ল এবং হেলান দিয়ে চোখ বুজে আস্তে বলল, আমি মহুয়ার স্বামী।

—মহুয়া?

—বলুন, তাকেও চিনি না!

সুকোমল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল। জ্ঞানেশ মিত্র নামে লোকটা চোখ বুজে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কপালে একটা হাত ঘসছে। সুকোমল নিজেকে সংযত রেখে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলতে চাইছেন!

—মহুয়া গতরাত্রে আত্মহত্যা করেছে।

—ও।

জ্ঞানেশ মিত্র চোখ খুলল। শুধু ও? ভেবেছিলাম আপনি—

সুকোমল শক্তমুখে বলল, আপনি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছেন, জ্ঞানেশবাবু?

—করার মতো যথেষ্ট ডকুমেন্ট আমার হাতে আছে। জ্ঞানেশ মিত্র নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ...যাই হোক, আপনার বয়স কত, সুকোমলবাবু?

—কেন?

—আমি বেয়াল্লিশ। মহুয়া আমার দশবছরের ছোট ছিল। আমার ধারণা আপনি পঁয়ত্রিশ-টয়ত্রিশ। জ্ঞানেশ মিত্র একটা পা লম্বা করে প্যান্টের পকেট থেকে তোবড়ানো সিগারেট-প্যাকেট বের করল। সিগারেট জ্বেলে সে হাত বাড়িয়ে অ্যাসট্রেটা নিল। সোফায় নিজের পাশে রেখে বলল, মেয়েরা যদি কাউকে ভালবেসে ফেলে, শিগগির বয়স ডিঙিয়ে তার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পাঁচবছর আগে মফস্বলের একটা স্কুলে মাস্টারি করতে গিয়ে মহুয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বিয়েটা তার ঠিক মাসখানেকের মধ্যেই। আসলে মহুয়ার ওই একটা স্বভাব ছিল—হঠকারিতার। ঝোঁকের মাথায় কোনও কাজ—যে-কাজই হোক, করে বসত। একটুও ভাবনাচিন্তা করত না। আমার খালি ভয় হত, ওর এই স্বভাবটাই ওর সর্বনাশ করবে। করেছিল। করলও।

সুকোমল টের পাচ্ছিল, তার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। বারবার তার মাথার ভেতর একটা করে ঠাণ্ডা হিম-ঢিল গড়িয়ে পড়ছিল। সে একটু নড়ে উঠল এবার।...কিন্তু আপনি এ-সব কথা আমাকে শোনাতে এসেছেন কেন?

—আপনার জানা দরকার বলে।

—আমি তা মনে করি না।

—আমি মনে করি।

—কী আশ্চর্য! আপনি কি গায়ের জোরে আমাকে শোনাতে চান? আপনি আসুন জ্ঞানেশবাবু! আমার হাতে অনেক কাজ। আপনার লাইফ-হিসট্রি শোনার সময় আমার নেই।

সুকোমল উঠে দাঁড়াল। কিন্তু জ্ঞানেশ মিত্র নির্বিকার মুখে বসে রইল। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে তার কুতকুতে চোখদুটো জুলজুল করছে। অথচ তাকে দেখাচ্ছে মৃত মানুষের মতো—শুঁটকো, টানটান আর রুক্ষ।

সুকোমল কঠোর স্বরে বলল, আপনি কি চান আমি পুলিশ ডাকি?

জ্ঞানেশ মিত্র খ্যাঁক করে হাসল।...বেশ তো! ডাকুন না। হেস্তনেস্তটা আরও ভাল করে হবে।

—তার মানে, আপনি সত্যি ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছেন। সুকোমল শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে বলল, বলুন কত দিতে হবে?

জ্ঞানেশ মিত্র হিস-হিস করে বলল, লজ্জা করে না, সুকোমলবাবু?

—আপনারই লজ্জা করা উচিত, নিজের স্ত্রীর কেলেঙ্কারি নিজের মুখে গাইতে এসেছেন!

—আস্তে, সুকোমলবাবু! আপনার ফ্ল্যাটে কেউ নেই, কিন্তু দেয়ালের কান আছে।

সুকোমল মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে আবার বসল। ভারী গলায় বলল, আপনি কী চান, জ্ঞানেশবাবু?

—একটা আলোচনা।

—কীসের আলোচনা?

—মহুয়া সম্পর্কে।

—কী লাভ তাতে?

—মহুয়া হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করল, আমাদের দু-জনের সেটা জানা দরকার।

—আপনার দরকার থাকতে পারে, আমার নেই।

—আছে। কারণ মহুয়ার মরার পেছনে আপনারও হাত থাকতে পারে।

—মহুয়ার সঙ্গে আমার গত একসপ্তাহ দেখা হয়নি। সুকোমল বিব্রতভাবে বলল। তাকে আমি এমন-কিছু বলিনি বা তার সঙ্গে এমন-কোনও ব্যবহার করিনি যে সে-জন্য ও মনে আঘাত পেয়ে স্যুইসাইড করতে যাবে।

—আমিও তো ঠিক একই কথা বলব, সুকোমলবাবু।

—কিন্তু সে আপনার স্ত্রী ছিল!

—আপনার প্রেমিকা ছিল, অথবা আপনি তার প্রেমিক ছিলেন। কাজেই একই কথা।

সুকোমল জোর দিয়ে বলল, মোটেই একই কথা নয়।

জ্ঞানেশ মিত্র পুড়ে-যাওয়া সিগারেটের আগুনে আবার একটা সিগারেট ধরাল। হাত তুলে বলল, ওয়েট, ওয়েট! আপনি সমাজ, আইন এ-সবের কথা তুলবেন তো? ওগুলো নিছক বানানো ব্যাপার সুকোমলবাবু! ওগুলো সবই বাইরের। আপনি ভেতরের দিক থেকে দেখুন কী ঘটেছে। মহুয়া নামে একটা মেয়ে আর দু-জন পুরুষ। জ্ঞানেশ মিত্র আর সুকোমল বসুরায়। দু-জনের সঙ্গেই তার অত্যন্ত প্রাইভেট সম্পর্ক ছিল—যা আর কারুর সঙ্গে ছিল না। বলতে দ্বিধা দেখি না যে সেই সম্পর্কটা ছিল দৈহিকও।

সুকোমল বিরক্তমুখে বলল, ধুর মশাই! সে তো একটা বেশ্যার সঙ্গেও...

—শাট আপ! মহুয়া বেশ্যা ছিল না।

—দেখুন, আমাকে ধমকাবেন না। আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি। আর নয়। আপনি উঠবেন কি না বলুন!

—উঁহু।

—উঠবেন না?

—না।

সুকোমল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটাকে সে হয়তো গায়ের জোরে বের করে দিতে পারবে। কিন্তু ও যদি চ্যাঁচামেচি করে, সব ফ্ল্যাট থেকে লোক জুটে যাওয়ার ভয় আছে। ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক সন্দেহ নেই। গোঁয়ার ও জেদি, তা বোঝাই গেছে। তা ছাড়া ওর চেহারায় মরিয়াভাব খুব স্পষ্ট। যারা একটা চরম বোঝাপড়া করতে চায়, তারাই এ-ভাবে আসে। সুকোমল এ-বার ভয় পেয়ে গেল।

জ্ঞানেশ মিত্র ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হেসে বলল, ভাবতে অবাক লাগছে সুকোমলবাবু! মহুয়া একসময় আমাকে বলেছিল, 'যদি আমার কোনও প্রেমিক থাকে, জানবে সে দায়িত্ববান প্রেমিক। ঠিক তোমারই মতো।' আমি ওকে বলতে পারতাম, 'প্রেমিক তো আছেই। তাকে আমি চিনিও।' কিন্তু বলতে পারিনি। কোনওদিন প্রচণ্ড রাগের মুখেও ওই কথাটা বলতে পারিনি ওকে। আসলে ওকে দেখে আমার মায়া হত। ওকে আঘাত দিতে পারতাম না। কারণ ওর জীবনটা ছিল ট্রাজিক। আশা করি, আপনি সে-সব কথা জানেন, সুকোমলবাবু! আমারই মতো প্রাণপণ লড়াই করে ও সদ্য মাথা তুলতে পেরেছিল। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনহীন একটা একলা মেয়ে। যাই হোক, আপনি মোটেও দায়িত্ববান প্রেমিক নন দেখতে পাচ্ছি। মহুয়া আপনাকে চিনতে পারেনি।

সুকোমল মুখ নামিয়ে বলল, আপনি দায়িত্ববান স্বামী! তবু মহুয়া কেন—

—একমিনিট! মহুয়া সে-কথা স্বীকার করত, জানেন কি?

—জানি। সুকোমল গলার ভেতর থেকে বলল।

—বলেছিল আপনাকে?

—হুঁ।

জোরে শ্বাস ছেড়ে জ্ঞানেশ মিত্র হেঁট হয়ে অ্যাসট্রেতে সিগারেট গুঁজে বলল, কী বলছিলেন, এ-বার বলুন।

—তা হলে মহুয়া স্যুইসাইড করল কেন?

—ঠিক এটাই আমার জানার ইচ্ছে, সুকোমলবাবু।

—আমি কিছু জানি না।

জ্ঞানেশ মিত্র আবার সোফায় পিঠ চেপে মুখ উঁচু করে চোখ বুজল।...ও-মাসে আপনারা গোপালপুর-অন-সি গিয়েছিলেন। ছিলেন স্টিফেন্স লজে। সায়েবের বাতিক, ব্যাচেলার অ্যালাউ করে না। সুটের ভেতর বাইবেল রাখে এককপি করে। ড্রিংক করাও বারণ। তবে বাড়িটা অপূর্ব। সামনে সমুদ্র, বাঁ-দিকে ব্যাকওয়াটার। অসম্ভব নির্জন সি-বিচ। জলের ভেতর বড়-বড় কালো পাথর। মহুয়া জেদ করছিল পাথরে গিয়ে বসবে। আপনি তাকে টানাটানি করছিলেন। নির্জন বিচে সিনেমার দৃশ্য!

সুকোমল তাকাল। তা হলে আপনি সত্যিই গিয়েছিলেন ফলো করে?

—আমি দায়িত্ববান স্বামী। আমার স্ত্রী কোথায় কী বিপদে পড়ছে কি না, লক্ষ রাখা আমার কর্তব্য।

—মহুয়া তা হলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল!

—করেছিল বুঝি?

—লাইট হাউসের ও-দিকে দূর থেকে বালিয়াড়িতে তা হলে ঠিকই আপনাকে দেখেছিল!

জ্ঞানেশ মিত্র কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বাইনোকুলার বের করল।

—দায়িত্ববোধের খাতিরেই জিনিসটা আমাকে ফুটপাত থেকে দুশোটাকায় কিনতে হয়েছিল। আপনি এটা অর্ধেক দামে রাখতে পারেন। চিরদিন তো আর ব্যাচেলার থাকবেন না, থাকছেনও না।...কবে যেন আপনার বিয়ে?

—আপনি বড্ড বেশি অপমান করছেন আমাকে! সবাই আপনার মতো বউকে ফলো করে বেড়ায় না।

—কারণ সবাই দায়িত্ববান স্বামী নয়।

—মহুয়া বলত আপনি নাকি ভীষণ উদার। তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেন। মহুয়া আপনাকে চিনতে পারেনি।

—মহুয়া বলত এ-সব কথা?

সুকোমল চুপ করে থাকল। তার নার্ভে চাপ পড়ছিল। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর জ্ঞানেশ মিত্র সেটা লক্ষ করল। সে মুখ তুলে দেখল ফ্যানটা ঘুরছে না। রাতভর বৃষ্টির পর আবহাওয়া মোটামুটি স্নিগ্ধ। এখনও মেঘ সরে যায়নি। নিচের রাস্তায় জল ভেঙে চলাচলের শব্দ ভেসে আসছে। সে দেয়ালের দিকে ঘুরে ফ্যানের সুইচ খুঁজল, তারপর রেগুলেটার ফুল করে দিয়ে সুইচটা টিপে দিল। বলল, আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তবু উপায় নেই। সিচুয়েশান ফেস তো করতেই হবে। তার আগে প্লিজ একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দিন আমাকে।

সুকোমল আড়ষ্টভাবে উঠল। এটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং ঘর। ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বের করল। কাচের গ্লাসে ভর্তি করে এনে নিচু টেবিলে রাখল।

জ্ঞানেশ মিত্র জলটা একটানে খেল না। চুমুকে-চুমুকে খাচ্ছিল। খানিকটা খেয়ে গ্লাসটা ধরে রেখে একটু হাসল। আপনার ফ্রিজ-ট্রিজ আছে। ফ্ল্যাটটাও অপূর্ব সাজানো। কত সুন্দর সব বই। ফ্ল্যাটটা নিশ্চয় কিনেছেন?

সুকোমল অস্পষ্টভাবে হুঁ বলল।

আমি সামান্য স্কুলটিচার। তা হলেও মহুয়ার টাকাটা যোগ করলে মোটামুটি ভদ্র একটা ফ্ল্যাটে হয়তো থাকা যেত—ফ্রিজট্রিজ না-কেনা হোক। কিন্তু ওর যা খরচের বহর ছিল! না—নিজে তত সেজেগুজে থাকত না, সে তো দেখেছেন। কীসে এলোমেলো উড়িয়ে দিত। দু-সপ্তা পরেই বলত 'তোমার কাছে টাকা আছে?' আসলে ওর ছিল উড়নচণ্ডী

স্বভাব—নিজের যা-কিছু দায়িত্বহীনভাবে বিলিয়ে দিতে একটুও ভাবেনি। আপনার কি মনে হয় না জীবনের ওপর, পৃথিবীর ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা—অবচেতনে ঘৃণা আর দুঃখ থাকলে তবেই মানুষ এমন করতে পারে? বলুন, তাই কি না?

—আমি জানি না।

ঠাণ্ডা জলে চুমুক দিয়ে জ্ঞানেশ মিত্র গলা নামিয়ে বলল, নিজেকে নিয়ে ও ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছিল—বিয়ের জাস্ট মাস-ছয়েক পর থেকে। হঠাৎ একটা পরিবর্তন। তখন আমরা সেই মফস্বলেই আছি। খানিকটা একঘেয়ে লাগে। তাই মাঝে-মাঝে কলকাতায় চলে আসি। কলকাতায় স্কুলে চেষ্টাচরিত্র করি। তো ভাবলাম, গ্রামে থাকাটা ওর অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই এত অস্থিরতা। পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মহুয়া প্রকৃতি-টকৃতি ভালবাসত—সে-কথা আপনিও জানেন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। রেগুলার পিল খেত ও। ক্রমশ রি-অ্যাকশন হচ্ছিল। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। জোর করে ওটা বন্ধ করালাম। তা ছাড়া একটা কাচ্চাবাচ্চাও হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি হয়তো জানেন না সুকোমলবাবু, যে-ই কনসিভ করল, তার একমাস পরেই কলকাতা এসে—আমাকে না-জানিয়ে, আর আজকাল তো ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে ডালভাত, জাস্ট কয়েকটা দিনেই ফিট হয়ে যায়! তো, আমি যখন জানতে পারলাম, ওকে চার্জ করলাম। সোজা বলে দিল, 'আমি মা হব না—তুমি যা-খুশি ভাবতে পারো!' এখন আমি জানি, মহুয়া একইসঙ্গে একটা অপারেশন করিয়ে নিয়েছিল। আশা করি ওর নাভির নিচে কাটা দাগটা আপনি—

—থামুন! সুকোমল প্রায় গর্জন করে উঠল। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত!

—ক্রুড রিয়্যালিটি, সুকোমলবাবু। নির্বিকার জ্ঞানেশ মিত্র ঘড়ি দেখতে-দেখতে বলল। মর্গে মহুয়ার শরীরটা এখন কাটাছেঁড়া চলছে। বিকেলের আগে বডি ডেলিভারি দেবে না সম্ভবত। আজকাল স্যুইসাইড বড্ড বেড়ে গেছে। আর ওই বধূহত্যা! ভাগ্যিস মহুয়া স্লিপিং ক্যাপসুল খেয়েছিল। তা ছাড়া একটুকরো চিঠিও লিখে গেছে। সে-কথায় পরে আসছি। তবে আমরা যা করতে চাইছি মহুয়াকে নিয়ে, সে-ও একটা শব-ব্যবচ্ছেদ। ওর লাইফটা কাটাছেঁড়া করা। হুঁ, আসুন। কী যেন বলছিলাম...অপারেশন! নাভির নিচে একটা কাটা দাগ। যে-কোনও নিঃসন্তান পুরুষের পক্ষে এটা প্রচণ্ড অপমানজনক। ভাবলাম, ওকে নিষ্ঠুরভাবে চাবকাই। আমার হাত উঠল না। আপনি তো দেখেছেন, যত তেজি হোক, ওর মুখে অসহায় নিঃসঙ্গ মেয়ের একটা ছাপ ছিল। খানিকটা অবুঝ বালিকার আদল। বিশেষ করে ওর চোখদুটো—

দরজার ঘণ্টা বাজল। সুকোমল ইতস্তত করছিল। হয়তো পুঁটুর মা এল এতক্ষণে। ওদের বস্তিতে অগাধ জল জমার কথা। আসেনি এটাই রক্ষা। এলেও সমস্যা। কিন্তু তার চেয়েও সমস্যা হত মনু থাকলে। ভাগ্যিস মনু ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

জ্ঞানেশ মিত্র বলল, যান। দেখুন কে এল।

সুকোমল আড়ষ্টভাবে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, সত্যি পুঁটুর মা। বুড়ি বলল, সমুদ্দুর! সব ভেসে গেছে! কী কষ্ট করে যে—

সুকোমল বলল, কষ্ট করার কী দরকার ছিল? বাড়ি যাও তুমি।

বুড়ি খচে গেল। ঠোঁট বাঁকা করে বলল, খামোকা বকছেন বাবু। কী চলছে অবস্থাটা, ভাবুন একবার। এক-কোমর জল ভেঙে-ভেঙে এলাম, আর বলছেন বাড়ি যাও! বেশ। যাচ্ছি। এক দোর বন্ধ তো শত দোর খোলা। যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, যাও।

বুড়ি গজ-গজ করতে-করতে চলে গেল। সুকোমল দরজা বন্ধ করে এসে বলল, আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন ভাবছেন?

—যতক্ষণ-না একটা হেস্তনেস্ত হয়।

সুকোমল খাপ্পা হয়ে বলল, কীসের হেস্তনেস্ত? আপনার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছে। সে-জন্য আমার কী করার আছে? আপনি চলে যান। অকারণ এ-সব নোংরা ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আর ভদ্রতা রাখা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

গ্রাহ্যই করল না জ্ঞানেশ মিত্র। তেমন হেলান দিয়ে চোখ বুজে থেকে বলল, তিনবছর আগে আপনিও ছিলেন আমার মতো একজন স্কুলটিচার। বহরমপুরে বিটি পড়তে গিয়েছিলেন। মহুয়া তখন রিফ্রেশার কোর্স করতে গেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ হল। আপনার প্রেমে পড়ে গেল। এমনিতেই পুরুষচরিত্র পরকীয়া প্রেমের অনুরাগী। আর মহুয়া পরস্ত্রী হিসেবে ছিল অসাধারণ। আমি একদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গেট থেকে লক্ষ করলাম, আপনারা দু-জনে লনের ও-পাশে বসে গল্প করছেন। তখন এই বাইনোকুলারটা ছিল না। কিন্তু চোখ ছিল। বুঝতে পারছিলাম দু-জনের ওই কথা বলার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি—সবকিছুর মধ্যে একটা গাঢ় আন্তরিকতা আছে। সে-ই তো শুরু। তাই না, সুকোমলবাবু?

—আপনি যদি এতসব আগাগোড়া জানেন, এতদিন বাধা দেননি কেন আপনার স্ত্রীকে?

দেবার কথা কি ভাবিনি? কোনও রক্তমংসের মানুষ এ-সব সহ্য করতে পারে? কিন্তু আমার ভয় হত, ওকে তা হলে হারাব। আপনি একে ক্লীবতা ভাবতে পারেন। কিন্তু ঠিক তা নয়। এটা একটা স্যাক্রিফাইস—এটা একটা নিজের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই। জানি না আপনাকে বোঝাতে পারলাম কি না। আসলে আমি চাইছিলাম, ও যা-কিছু করুক, আমার হয়ে থাক। আমার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে অন্তত থাক।

—বুঝেছি। সম্পত্তি ভেবেছিলেন স্ত্রীকে! সুকোমল ব্যঙ্গ করে বলল।

—না। তা নয়। এ ঠিক পোজেশনের মনোভাব নয়, সুকোমলবাবু। মায়ামমতা, করুণা, দায়িত্ববোধ অনেককিছু এর মধ্যে ছিল। ওর সর্বনাশ ঘটুক এ আমি চাইনি—ওর নিজের দিক থেকে বা অন্যের দিক থেকে। আর এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমি খানিকটা অসহায়ও বোধ করেছি বইকি। না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে—এ-রকম একটা ব্যবস্থা।

সুকোমল বাঁকা হাসল, তা হলে আর নিজেকে দায়িত্ববান স্বামী বলে বড়াই করছেন কেন? দায়িত্ববান স্বামীরা কি স্ত্রীকে প্রেম করতে দিতে পারে?

—পারে, যদি দ্যাখে তার স্ত্রীর সেই প্রেমিকটিও দায়িত্ববান। আমি আপনাকে তা-ই

ভেবেছিলাম। অথচ আপনি তা নন। আপনি ওকে ঠকিয়েছেন, শুধু তাই নয়, ওকে বাঁচিয়ে রাখতেও পারেননি। ওকে অতল খাদের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন।

—কীভাবে?

—প্রথম কথা, আপনি ওকে—উইদিন কোটেশান বলছি—'সম্মানজনক' চাকরির লোভ দেখিয়েছিলেন।

—সেটা অন্যায় নয়। তবে, চেষ্টা করব বলেছিলাম, এ-পর্যন্ত।

—কিন্তু মহুয়া আপনাকে এত বিশ্বাস করত যে তারপর সে তার স্কুলের দায়িত্বে ভীষণ অবহেলা করতে শুরু করল। যখন-তখন কামাই, ক্লাসে ফাঁকি, পরীক্ষার খাতায় খামখেয়ালি করে নম্বর দেওয়া, কলিগদের সঙ্গে ঝগড়া—কত আর বলব! শেষপর্যন্ত একদিন ঝোঁকের মুখে রিজাইন দিয়ে এসে বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।' আমি কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। কারণ তখনও জানতাম না, আপনিই এর পিছনে ছিলেন। আপনারই প্ররোচনায় মহুয়া চাকরি ছাড়ার রিস্ক নিয়েছিল।

—আমি ওকে চাকরি ছাড়তে বলিনি।

—ওকে লোভ দেখিয়েছিলেন। আশা দিয়েছিলেন। তার রিটন এভিডেন্স আমার হাতে আছে।

—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। আপনি যা-খুশি করুন।

জ্ঞানেশ মিত্র তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজল। আপনি ওকে লিখেছিলেন, 'যদি কখনও মনে করো যে ওখানে অসহ্য লাগছে, তখনই চলে এসো। আমার ঘরের দরজা তোমার জন্য সবসময় খোলা। পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় না-জুটলেও আমার কাছে জুটবে।' লেখেননি?

—আপনার দেখছি অসাধারণ মুখস্থ করার শক্তি!

—কাল রাত্রে আপনার চিঠিগুলো পড়তে-পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে, সুকোমলবাবু! আপনি ওর স্কুলের ঠিকানায় বড্ড-বেশি চিঠি লিখতেন। অত বেশি লিখতেন বলেই আপনাকে দায়িত্ববান—খাঁটি প্রেমিক-মানুষ ভেবেছিলাম। নিছক লাম্পট্য মানুষকে এত-বেশি কথা বলতে দ্যায় না। সত্যি বলতে কী, আপনার ওপর আমার সিমপ্যাথির এটাই মূল কারণ।

—স্ত্রীর ব্যক্তিগত চিঠি লুকিয়ে পড়তেন—লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল আপনার!

—কেন লজ্জা? আপনার চিঠির কথাগুলো আমার নিজেরই কথা আসলে। আমি ঠিক যে-কথাগুলো ওকে বলতে চাইতাম, পারতাম না, তারই হুবহু প্রতিধ্বনি! আর, সুকোমলবাবু, কাল রাতে যখন আবার চিঠিগুলো নিয়ে বসলাম, বিশ্বাস করুন, আমি নিজেকে গুলিয়ে ফেললাম আপনার সঙ্গে। আমি না আপনি? আপনি না আমি? আর তখন বিছানার ওপর মহুয়া মরে পড়ে আছে! ঝমঝম বৃষ্টি ঝরছে। রাস্তায় জল জমতে-জমতে সেই জল এসে ঢুকেছে ঘরে মেঝেয়। জলে পা ডুবিয়ে বসে আপনার চিঠি পড়ছি। করবটা কী? কাকে ডাকব ওই দুর্যোগের মধ্যে? কাকে কান্নাকাটি করে বলব আমার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছে?

—আপনি অদ্ভুত!

মহুয়া তাই বলত মাঝে-মাঝে। এই তো কিছুদিন আগেও আমার পাশে শুয়ে থাকতে-

থাকতে হঠাৎ আমার বুকের ওপর মাথা তুলে বলল, 'তুমি এমন কেন গো?' বললাম 'কেমন আমি?' ও বলল কী জানেন, সুকোমলবাবু? বলল, 'কেন তুমি আমাকে শাসন করো না? কেন আমাকে আটকে রাখো না? আমার যদি কিছু ঘটে যায়? বললাম, কী ঘটবে আর? কিছু ঘটবার সুযোগ তো রাখোনি।' ও একটু সরে গেল। স্বভাবত আমি ওর সেই অপারেশনটার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, ও মৃত্যু ব্যাপারটাকে ঘটনা বলতে চাইছিল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তুমি চিরদিন বড় অদ্ভুত মানুষ।' হ্যাঁ, সুকোমলবাবু, আমি হয়তো তাই।

—আর কতক্ষণ প্রলাপ বকবেন আপনি?

জ্ঞানেশ মিত্র চোখ খুলল। প্রলাপ? এ তো আমার-আপনার দু-জনেরই জীবন-মরণের প্রশ্ন।

—আপনার হতে পারে। আমার নয়।

সুকোমলবাবু! জ্ঞানেশ মিত্র একটু ঝুঁকে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে একটু হাসল। মহুয়ার সঙ্গে আমরা দু-জনেই একইভাবে জড়িয়ে গেছি। ধর্মত এবং আইনত।

সুকোমল ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

মহুয়া গতকাল কোনও একসময়ে—তার মানে বৃষ্টির আগেই, ঠিক করেছিল মরবে। চিঠিটা লিখে বালিশের তলায় রেখেছিল। আমার স্কুল সেই বেহালায়। ভেবে দেখুন, কাল কী অবস্থা সন্ধ্যা থেকে! সাতটা অবধি অপেক্ষা করে তখন মরিয়া হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কখনও বাস, কখনও রিকশো এই করে তিলজলা পৌঁছুতে রাত সাড়ে-নটা হয়ে গেল। রাস্তায় জল জমেছিল। কিন্তু তখনও ঘরে ঢোকেনি। দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকে দেখি, মহুয়া কাত হয়ে শুয়ে আছে। দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে একটু বকাবকি করে ওকে ওঠানোর চেষ্টা করলাম। সাড়া দিল না। তখনও জানি না ও—যাই হোক, ওকে বিরক্ত না-করে জামাকাপড় বদলে কিচেনে গেলাম। দেখলাম খাবার-রেডি করা আছে। খেয়ে আলো নিভিয়ে ঘরের কোণায় টেবিলবাতিটা জ্বেলে জানালার ধারে বসে সিগারেট টানছি আর বৃষ্টি দেখছি। আকাশভাঙা বৃষ্টি। উদ্বিগ্নও হচ্ছি, এ-বার তো ঘরে জল ঢুকবে। সিগারেট শেষ করে দরজার তলায় ওর একটা ছেঁড়া শাড়ি গুঁজে—

—আঃ! জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কেন বললেন?

জ্ঞানেশ মিত্র গলার ভেতর বলল, বলছি। কাল বৃষ্টিটা কিন্তু মাথাখারাপ-করে-দেওয়া বৃষ্টি। হঠাৎ টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মহুয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার মাথাখারাপ হয়ে গেল। কতদিন ওর শরীরের সেই আশ্চর্য স্বাদ আর পাচ্ছি না। ও আমাকে বঞ্চিত রাখছে। আমি জানোয়ার হয়ে গেলাম, সুকোমলবাবু!

জ্ঞানেশ মিত্রর গলা ভেঙে গেছে দেখে সুকোমল তাকাল। চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। তাকিয়েই মুখ নামাল সুকোমল।

জ্ঞানেশ মিত্র গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমি ওকে জোর দেখাতে গিয়েই থমকে গেলাম। ওর শরীর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা, হিম। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর চেহারায় আবার আগের মতো রুক্ষতা ফিরিয়ে এনে জ্ঞানেশ মিত্র বলল, মহুয়ার স্যুইসাইডাল নোটে আমাদের দু-জনকেই দায়ী করে গেছে. সুকোমলবাবু। আমাকে এবং আপনাকে।

সুকোমল চমকে উঠেছিল। বলল, আশ্চর্য! আমি কী করেছি?

—আপনি করেছেন প্রতারণা আর আমি করেছি মানসিক পীড়ন।

—মহুয়া তাই লিখেছে?

—হ্যাঁ! জ্ঞানেশ মিত্র নোংরা রুমাল বের করে ফোঁস-ফোঁস করে নাক মুছল। সুকোমল আস্তে বলল, লিখলেই তো হল না। প্রমাণ কোথায়?

—প্রমাণ আপনার একগাদা চিঠি।

সুকোমলের মুখ সাদা হয়ে গেল। বলল, বডি তো মর্গে বললেন!

—হ্যাঁ। তবে আত্মহত্যার চিঠিটা আমি পুলিশকে এখনও দিইনি। দিলে প্রচলিত আইনে আমরা এতক্ষণ দু-জনেই অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম।

সুকোমল ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কী করতে চান তা হলে?

—আপনিই বলুন সুকোমলবাবু, কী করা উচিত?

—বেশ। পুলিশকে দিন।

—এবং আপনার চিঠিগুলো?

সুকোমল তাকাল। তার হাত কাঁপছিল।...তা হলে তো আপনি সেই ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছেন!

—না। আমি জানতে এসেছি কেন মহুয়া হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলল? সুকোমলবাবু, আত্মহত্যার চিঠিতে আত্মহত্যার মূল কারণ লেখা থাকে না।

সুকোমল ক্ষুব্ধভাবে বলল, আমি কেমন করে জানব সে-কথা? আগের রবিবার বিকেলে মহুয়া সেই শেষবার এসেছিল। কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে চলে গেল। এমন-কোনও কথা বলেনি, যাতে মনে হবে সে স্যুইসাইড করবে। হ্যাঁ—ফ্র্যাংকলি বলছি, শুনুন। আমি ওকে বললাম, 'কী ডিসিশন নিলে?' বলল, 'নাথিং! বেশ তো আছি। এমনি ফ্রেন্ডলি টার্মে থাকব।' আমি ওকে বললাম, 'এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস গেম থেকে যাচ্ছে। তোমার স্বামী কতদিন চুপ করে থাকবেন, বলা কঠিন। মহুয়া—'

—আপনি তাই বললেন?

—হ্যাঁ। মহুয়া বলল, 'ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে।'

—মহুয়া তাই বলল? আবার ফোঁস-ফোঁস করে রুমালে নাক মুছল জ্ঞানেশ মিত্র।

—হ্যাঁ। গতবছর এমনি জুলাই মাসে আমরা দিঘা গিয়েছিলাম। ঝাউবনে ও একটা অদ্ভুত কথা—

—বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বলে আপনার সঙ্গে যেত, জানতাম।

—এবং ফলো করতেন!

—আপনি প্লিজ দিঘার কথাটা বলুন!

মহুয়া ঝাউবনে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ বলল, 'জানো? আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বাবার স্বভাব-চরিত্রের আশ্চর্য মিল!' আমি বুঝতে পারতাম, আপনার ওপর ওর খুব শ্রদ্ধাও ছিল।

জ্ঞানেশ মিত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ছিল। তা ছিল!

—কিন্তু আমার ধারণা, গত মাসে গোপালপুর-অন-সিতে আপনাকে দেখতে পাওয়ার পর থেকে আপনার সম্পর্কে ওর শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে না-দেখতে পেলে স্টিফেন্স লজে আমরা আরও দিন-তিনেক থাকতাম।

—বোকা মেয়ে! জেদি আর বেপরোয়া! আমার খালি ভয় হত, কারও পাল্লায় পড়ে প্রাণটা না খুইয়ে বসে। জ্ঞানেশ মিত্র ভাঙা গলায় বলল। ওইভাবে বেড়াতে গিয়ে কত মেয়ে মার্ডার হয় কি না বলুন? না, না। আপনি কেন মার্ডার করবেন? কিন্তু আজকাল সবখানেই দুর্বৃত্ত মস্তান লোকেরা ঘুরছে। আমি কেমন করে নিশ্চিত থাকি বলুন? আমার মন মানত না, সুকোমলবাবু!

সুকোমল ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে-নটা বাজে। আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে।

—তা হলে আপনি জানেন না, কেন মহুয়া স্যুইসাইড করল?

—বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।

কিন্তু—জ্ঞানেশ মিত্র সোজা হয়ে বসল।—কিন্তু খবরটা যখন আপনাকে দিলাম, আপনি একটুও চমকে উঠলেন না। আঘাত পেলেন না। শুধু বললেন, ও! অথচ আপনি মহুয়ার প্রেমিক ছিলেন। তার সুন্দর শরীরটাকে আপনি যথেচ্ছ—আমি বলতে চাইছি, আদর করেছেন। আপনি কি লেখেননি 'তোমার নগ্ন-সুন্দর দেহের সবখানে আমার চুমুর দাগ ফুটে আছে, খুঁজে দেখো?' আপনার চিঠি বড় কবিত্বপূর্ণ, সুকোমলবাবু! আপনিই তো লিখেছিলেন, 'তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ হঠাৎ এসে আমাকে বিপন্ন করে!' সেই শ্বাসপ্রশ্বাস চিরদিনের জন্য থেমে গেছে মহুয়ার। তবু আপনি এতটুকু বিচলিত নন। সুকোমলবাবু, আমি বুঝতে পেরেছি মহুয়া কেন আত্মহত্যা করেছে।

সুকোমল বলতে যাচ্ছিল, কেন, কিন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেশ মিত্র কাঁধের ব্যাগ থেকে একগাদা নীল কাগজ বের করে হিংস্র ভঙ্গিতে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে সুকোমলের ওপর ছুঁড়তে থাকল। সুকোমল মুখ নামিয়ে মুহুর্মুহু ওই আঘাত অথবা প্রত্যাঘাত, দলা-পাকানো ছেঁড়া চিঠি অথবা রুক্ষ শুকনো ঘৃণার পুঞ্জ সহ্য করল।

একটু পরে লোকটা বেরিয়ে গেলে সে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর ফিরে এল সোফার কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এত চিঠি লিখেছিল মহুয়াকে? এ কী অদ্ভুত ছেলেমানুষি তার! সত্যিই কি মহুয়া এত বেশি চিঠি পাওয়ার যোগ্য ছিল?

চিঠিগুলোর দিকে তাকাতে তার খারাপ লাগল। তাকালেই পড়া হয়ে যাবে। কেন অতসব উচ্ছ্বাস কলমের ডগা দিয়ে বমি করার মতো বেরিয়ে পড়ত, এ-মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে না। ছেঁড়া দলা-পাকানো কাগজ হিসেবেই ঝটপট কুড়িয়ে সে কিচেনে গেল। কিন্তু কীভাবে নষ্ট করবে ভেবে পেল না। শেষে বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিল। ভিজে নেতিয়ে গেলে দলাপাকানো একটা বলের মতো করে আবর্জনার বালতিতে গুঁজে দিল।

আশ্চর্য! মহুয়া চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিল! ভাবতে-ভাবতে সুকোমল বেডরুমে গিয়ে জানলায় উঁকি দিল। রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে। গাড়ি বের করা যাবে না। অফিসে ফোন করে দেবে, শরীর খারাপ। সত্যি, গতরাতের বৃষ্টিটা মাথাখারাপ-করে-দেওয়া।

তারপরই সুকোমল বসুরায় একটু চমকে উঠল। মহুয়া স্যুইসাইড করেছে। অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্যুইসাইড করেছে মহুয়া—সেই নরম ডিমালো মুখ, কালো টানা চোখ, বালিকার অভিমান ঈষৎ পুরু ঠোঁটে, শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মেয়ে, একরাশ কোঁকড়ানো চুল এবং নাভির নিচে একটা ক্ষতচিহ্ন। তার সমস্ত শরীরে সুকোমলের ঠোঁট ঘুরে-ঘুরে আদর দিয়েছিল। জ্ঞানেশ মিত্র তাকে কী ভেবে গেল? নিছক লম্পট—নিতান্ত ভুল প্রেমিক! আচ্ছা, মহুয়া যদি হত সুকোমল বসুরায়ের স্ত্রী এবং জ্ঞানেশ মিত্র তার প্রেমিক? সুকোমল বসুরায়ও তো অমনি ভেঙে পড়ত। মাথাখারাপ হয়ে ছুটে যেত জ্ঞানেশ মিত্রের কাছে এবং এতক্ষণ সুকোমল বসুরায় এই ফ্ল্যাটে এক বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদত এবং বারবার থানা ও মর্গে ফোন করত কখন বডি পাওয়া যাবে—আর তার এই নধরকান্তি চেহারা যেত রাতারাতি শুঁটকো রুক্ষ হয়ে, মুখে খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি—কিছু পাকা, কিছু কাঁচা এবং—

ভীষণ আতঙ্কে জানালার রড আঁকড়ে ধরল সুকোমল বসুরায়। আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। মাথাখারাপ-করে-দেওয়া এই বৃষ্টি আবার কার কী সর্বনাশ নিয়ে আসছে হয়তো।





সুড়ঙ্গ

কলকাতার এমন কতকগুলো রাস্তা আছে, এমন-কিছু এরিয়া আছে, যার ভেতর দিয়ে আসার সময় দিলীপ বসুরায় লক্ষ করেছে, সে, বা সঙ্গে বউ থাকলে দু-জনেই, চুপচাপ হয়ে গিয়ে লুকিয়ে মনে-মনে একই কথা ভাবতে শুরু করেছে—একই সঙ্গে।

এরিয়া বা রাস্তাগুলোর নাম—সি আই টি রোড, যোধপুর , লেক গার্ডেনস, সল্ট লেক, পর্ণশ্রী, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস, নিউ আলিপুর, যদু কলোনি। জায়গাগুলোর মজা—ট্রাম নেই। বাস কদাচ। সাইকেল-রিকশা অনেক দূরে। ট্যাক্সি ভাগ্য থাকলে পাওয়া যায়।

তাই দিলীপ যতবারই ও-সব জায়গায় গেছে—ততবারই একা থাকলে একা—সঙ্গে বউ থাকলে বউ—হাঁটতে-হাঁটতে দু-ধারের বাড়িগুলো দেখে মনে-মনে বলতে হয়েছে—বাঃ কী সুন্দর!

এ-সব বাড়ির ভেতরটা সামান্যই বাইরে থেকে দেখা যায়। দু-একটা ঝুল-বারান্দায় সে মানুষজন দেখেছে। যাদের দেখা যায়—তারা সাধারণত কেউ যুবক-যুবতী নয়। বেশি দেখেছে শিশু, নয়তো প্রায় বুড়োবুড়ি। চল্লিশ-ছুঁই-ছুঁই যুবক-যুবতীও দিলীপ দেখেছে। তবে তারা তো ভাড়াটে।

কী সুন্দর সব বাড়ি। আশ্চর্য রং। বারান্দার সঙ্গে মানানসই বোগেনভেলিয়া।

একবার এক ডাক্তারকে চিত্রার পায়ের হাড়ের ছবি দেখাতে যেতে হয়েছিল। দু-জনে ফেরার পথে যোধপুরের সুন্দর বাড়ি দেখতে-দেখতে চিত্রা একসময় বলে উঠেছিল, কী সুন্দর! আমরা এখানে থাকতে পারি না?

নিজেদের ভাড়া বাড়িতে ফিরে এসে সুইচ টিপে দু-দুটো নিওন জ্বেলেও নিজের ঘরখানা উজ্জ্বল লাগেনি দিলীপের সেদিন। ঘরের আলোতে যেন কুচো অন্ধকার সবসময় মেশানো থাকে।

জানালা-দরজা রং হয় না তিনবছর। ঘরের মেঝে ভুল দিকে ঢালু হওয়ায় মেঝে ধুলে জল পাস করে না। তখন চিত্রা কাজের মেয়েটিকে বলে, ন্যাকড়াটা চেপে-চেপে মোছো তো কুন্তী। নয়তো দাদাবাবু পা-পিছলে পড়বে।

দাদাবাবু মানে দিলীপ বসুরায়। সতেরোর-তিন রায় স্ট্রিটের তেতলা বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরের হেড অব দ্য ফ্যামিলি। গত তেরোবছরে ভাড়াটে হিসেবে দিলীপ এ-বাড়ি থেকেই দুটো জেনারেল ইলেকশনে ভোট দিয়েছে। ভোট দিয়েছে ক্যালকাটা করপোরেশনের ইলেকশনে—একবার—কাউন্সিলর নির্বাচনে।

সকালের কাগজখানা চায়ে ভিজিয়ে খেতে-খেতে দিলীপ বসুরায় দেখল, ভোরের রোদ্দুর তো এ-বাড়িতে সে-ভাবে আর ঢোকে না। তেরোবছর আগে বাড়িটা ভাড়া দেওয়ার সময় বাড়িওয়ালা বলেছিল, এই খোলা বারান্দাটাই বিউটি। শীতে রোদ—গরমে সন্ধের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস—সবই পাবেন।

ভাড়াটা তো বেশিই নিচ্ছেন। তার উপর তিনহাজার টাকা অ্যাডভান্স।

ভাড়ার অর্ধেক অ্যাডভান্স থেকে মাসে-মাসে কাটা যাবে। বাকি অর্ধেক নগদ দেবেন। এটা আমাদের ডোয়ালিং হাউস দিলীপবাবু। শুধু করপোরেশন ট্যাক্স আর জলের পাম্পের বিল দিতে—

দিলীপও ছেড়ে কথা বলেনি। আগের ভাড়াটে ভাড়া না-দিয়ে মামলা চালাল চারবছর। তারপর বাকি ভাড়া না-দিয়ে সটকে পড়ল।

সবাই তো ভদ্রলোক হয় না। বাড়িওয়ালা বলছিল, আর ঘর-বারান্দা দেখাচ্ছিল।

সে-জন্যই আমার ভাড়া একশো-পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দিলেন তো!

ঘর দেখাতে-দেখাতে বাড়িওয়ালা সে-দিন দিলীপের এ-কথাটা ইচ্ছে করে শুনতে পায়নি।

সকালের কাগজ মুড়ে রেখে বাজারের থলে চাইল দিলীপ। চিত্রা এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, একজন ছুতোরকে ধরে আনবে রাস্তা থেকে। বাথরুমের ছিটকিনির ঘর ঢিলে হয়ে গিয়ে লোহাটা একদম মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—

দ্বিজুবাবুকে বললে পারো।

চিত্রা হাসল। এ তো মাইনর রিপেয়ার্স। এ আমাদের করে নেওয়ার কথা।

আর মেজর রিপেয়ারগুলো? দেওয়ালে ক্র্যাক? পাখা ঝোলাবার বিম মাঝখানে ঝুলে পড়েছে যে—

সে তুমি ভাড়া বাড়াবে না—তো ওরাও রং করবে না—সারাবে না!

বাড়াই কী করে! অ্যাডভান্স নেবার সময় তেরোবছর আগে একটা চুক্তি করেছিল।

সে তো সবাই জানে।

জানে দিলীপ বসুরায়। তাকে জানতে হয়েছিল। জানে তার বউ চিত্রা। শ্রীকান্ত চৌধুরী, অডিটর, ওরফে বাড়িওয়ালা জানে। জানে তার বউ পুতুল। আর জানে পুতুলের কলেজে-পড়া ছেলে-মেয়েরা।

সকালবেলাতেই পুতুলবউদি সেতার বাজিয়ে খুব অজানা একটা রবীন্দ্রসংগীতে আঙুল ফেরাফিরি করছিল। আশপাশের ভাড়াটে-ঠাসা বাপকেলে ঝুরো-ঝুরো পড়তি-সব বাড়িতে পুতুলবউদির সেই বাজনা ঢুকে পড়ল। কোনও বাজনাই একতলা-দোতলা বোঝে না। তেরোবছরের বাসী পাড়া দিয়ে বাজারে যেতে-যেতে দিলীপের মনে হল—চিত্রার গান না-শেখার কোনও কারণ ছিল না। খালি গলায় তো একসময় দিব্যি গাইত। তখনও আমার দুই ছেলে স্কুলে যায়নি। দুশো-আড়াইশোতে দিব্যি বাড়ি পাওয়া যেত। সে-আমলে আমি পাঁচশো টাকা ভাড়ায় এ-পাড়ায় আসি।

ছাইগাদা, টিউবওয়েলতলা, মস্তানদের রক, রোড-রোলার, মুদিখানা, রেশনশপ পেরিয়ে বাজারে ঢোকার মুখে দিলীপ বসুরায় বিড়বিড় করে বলল, এখন এ-বাড়ি ছাড়লে দেড়হাজার টাকা ভাড়ায় মাদ্রাজি চলে আসবে। আমি অত ভাড়া কোত্থেকে দেব?

বাজারে যে-জিনিসই দর করে দিলীপ—দোকানিরা স্রেফ শ্রীকান্ত চৌধুরী, অডিটরের গলায় কথা বলে। যেমন—

—বেগুন কত করে আজ?

—তা তিনখানা ঘর—একটা ছোট ঘর বসার—উপরি একটা বারান্দা—বারোশো টাকা তো পেতাম মাসে-মাসে। প্রশান্ত শূর এসে বাড়ির ট্যাক্স তিনগুণ বাড়িয়েছে। জল তোলার মোটরের রিপেয়ারিং আছে। আছে ইলেকট্রিক বিল।

—আড়াইশো দাও। পোকা থাকে না যেন—

—ভাই দিলীপ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একটু কনসিডার করো। তোমার দুই ছেলেই হস্টেলে থাকে। স্কলারশিপে পড়ে। কিন্তু আমার ভাইপোর বিয়ে হয়েছে। তার একখানা ঘর লাগে আলাদা। দাদার ঘর লাগে। আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর আরও ঘর দরকার।

—ওজনটা ঠিক করে দ্যাখো ভাই—

—দেখছি। তোমার মতো ভাল ভাড়াটে হয় না। মাসের এক তারিখেই ভাড়া পরিষ্কার। ভাড়াটা বাড়িয়ে দাও—নয়তো বাড়িটা ছেড়ে দাও ভাই। তুমি বিদেশি ওষুধ কোম্পানিতে আছ। অফিস থেকেও তো ভাড়া পাও।

আলুওয়ালা বলল, কিলো কিন্তু দাদাবাবু আজ থেকে দেড়টাকা।

—তাই নাকি! বেছে সাড়ে-সাতশো দাও।

—বেশি না, তিনশো টাকা বাড়িয়ে দাও।

—সে-পথ তো শ্রীকান্তদা আপনারাই মেরে রেখেছেন। অ্যাডভান্সের টাকাটা নেবার সময় উকিল দিয়ে চুক্তি করে সই করালেন। আপনার ভাইপো অপমান করল। চুক্তিতে সই করুন—নয়তো অ্যাডভান্স ফেরত নিন। তাতে তো ভাড়া বাড়াবার কোনও টার্ম ছিল না। আমি সাধারণ ভাড়াটে। আপনারা যা বলেছেন—আমি সই করেছি। এখন ভাড়া বাড়িয়ে চুক্তির বিরুদ্ধে যাই কী করে!

নিমপাতা, পাতিলেবু, কাঁচাপেঁপে, পঞ্চাশ-গ্রাম লঙ্কা নিয়ে খোকা-মার্কা বালিকাটিকে দিলীপ বলল, কত হল?

—জল তোলার মোটর পুড়ে গেল তো গতমাসে। ওয়াইন্ডিং করতেই লেগেছে দেড়শো টাকা। একমাসের ইলেকট্রিক বিল তিরাশি টাকা সত্তর পয়সা। করপোরেশনের কোয়ার্টলি ট্যাক্স একশো-বাহাত্তর টাকা ছ-পয়সা। একুনে—

—যোগ দিয়ে কাজ নেই আর। দক্ষিণের হাওয়া গেছে। গেছে আলো-রোদ।

—কোত্থেকে এক কন্ট্রাক্টর এসে কর্নার প্লট কিনে নিয়ে চারতলা বাড়ি হাঁকিয়ে দিলে আমরা কী করব বলো ভাই? মোটা অ্যাডভান্স নিয়ে এক-একটা ফ্লোর তুলে ফেলল

ক-মাসে। ভাড়াও দিয়েছে মোটা টাকায়। তোমার চেয়ে ছোট জায়গা দিলীপ—মাস গেলে গুনে আঠেরশো টাকা ভাড়া নিলে।

দরাদরি করে দিলীপ আটখানা সজনের ডাঁটা কিনল এক-টাকায়। আরেকখানা ডাঁটা ফাউ চাইতেই দোকানি বলল, বছর-বছর রং করাতে পারব না ভাই।

—সব বাড়িওয়ালাই করে দেয় দাদা। পাইখানার প্যান ফেটে চৌচির, নর্দমা বন্ধ হয়ে যায় মাসে দু-বার। আপনাদের দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে লোহার কোলাপসিবল। অথচ আমাদের পলকা সদর দরজার কব্জা ঢিলে হয়ে খুলে পড়েছে। সিকিউরিটি, স্যানিটেশন—এ-সব পয়েন্ট তো দেখবেন, শ্রীকান্তদা—

—স্টেট গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাট দেখলে পারো। সেখানে সরকার বছর-বছর সব সারিয়ে দেয়।

—এ-বাড়ি কোন সালের?

বাবা তখন বেড-রিডিন। দাদা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাড়ি করায়। বউদি নতুন বিয়ে হয়ে এল। নাইনটিন থার্টিসেভেন।

—আমি সিক্সটিসেভেনে দেখেছি একবস্তা সিমেন্ট দশটাকা চারআনা।

—এখন তো দিলীপ প্রায় তিরিশ টাকা একবস্তা। পেছনের চৌবাচ্চাটা রিপেয়ারিং করতে গিয়ে টনক নড়ল—বাড়ি বানানো কী জিনিস।

—ফিফটিএইটে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের কোয়ার্টার বানানোর সময় কন্ট্রাক্টরদের তো মহা ফুর্তি। কী, না দশটাকা স্কোয়ার-ফুটে ঠিকাদারি দেওয়া হচ্ছে। সেটাই তখনকার বাজারে ছিল হাইয়েস্ট। ওয়ারিয়ায় এক এলএমএফ ডাক্তারকে স্যাম্পেল দিতে যেতাম মাসে দু-বার—তখনই দেখি ব্যাপারটা। সেই থেকে আর ভুলিনি।

—কী বলব দিলীপ—এ-বাড়ি করার সময় ইট কেনা হয়েছিল ছ-টাকা হাজার। পৌঁছে দেওয়ার খরচ-সমেত।

—শ্রীকান্তদা, তখন হয়তো সিমেন্টের বস্তা ছিল ছ-আনা।

—তা হতে পারে ভাই।

—তা হলে স্কোয়ার-ফুটে খরচা পড়ত হয়তো তিন-চারটাকা —

— আশ্চর্য নয় ভাই।

তা হলে তো আমারই তেরো-বছরের ভাড়ায় এ-বাড়ি তৈরির খরচা, সুদ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আসলসমেত কবে উঠে গেছে। এর পর আর ভাড়া বাড়াতে চান কোন মুখে, শ্রীকান্তদা?

—লঙ্কা পড়ে যাচ্ছে, বাবু।

—তুলে দে—বলে দিলীপ মাছের বাজারে ঢুকল। অফিস, পাড়ায়, গুলতানির রেস্তোরাঁয় কিংবা শ্রীকান্ত চৌধুরীদের ভাড়া বাড়াবার আবেদন ও খোঁচার মুখে-মুখে চোখের চামড়া তুলে যে-সব কথা দিলীপ বসুরায় বলতে না-পেরে সতেরোর-তিন রায় স্ট্রিটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একা-ঘরে বিড়-বিড় করে—তারই একদিককার ডায়লগ সে আলু, বেগুন, লঙ্কাওয়ালার মুখে শুনে নিল।

বাজার-ফেরত দাড়ি কামাতে বসে দিলীপের মনে পড়ল—আর যে-সব ডায়ালগ বসানো হয়নি—সেগুলোর কথা। যেমন—আপনার দাদা, ভাইপো, ভাইঝি, জামাই চাকরি করে। আপনি অডিটর। ছেলে-মেয়েরা ভাল হয়েছে। পুতুলবউদি ভাল ঘরানায় সেতার শিখেছিলেন একসময়। বাড়ি ভাড়া লাগে না। ড্রাইভার রাখেননি। নিজেই গাড়ি চালান। খরচাটা কী? সন্ধেবেলা ক্লাবে গিয়ে তাস পিটে, যা-তা গিলে নিজের পা ফুলিয়েছেন। পেচ্ছাব হয় না ভাল করে। এরচেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধে-সন্ধে পুতুলবউদির সেতার শুনুন। তিলক কামোদ। দেখবেন পেচ্ছাব হয়ে গেছে।

আপনার তো জ্যোতিবাবুদের ভাল লাগে। ভোট দেন। ইন্দিরাকে ডাইনি ভাবেন। আপনি কি জানেন—প্রপার্টি ইজ রবারি? এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইন্ড?

ভোট দিতে গিয়ে, শ্রীকান্তদা, কাউকে ধোয়া তুলসিপাতা ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ, এ-পৃথিবীতে বিশুদ্ধ থাকাই তো কঠিন।

নাকের নিচে অন্যমনস্ক ব্লেড বসে গেল। ফিটকিরি চেপে ধরে দিলীপ জ্বলুনি শুষে নিল নিজের মগজে। এ-সব সময় সে বড় কোনও বিপজ্জনক রিসিপ্লাসের আবছা নেগেটিভ দেখতে পায় চোখের সামনে। যেন একটুর জন্য ট্রেনে কাটা পড়ল না। পা হড়কে গিয়েছিল কিন্তু।

খেতে বসে বলল, একসঙ্গে খেতে বসবে, চিত্রা?

—না। তুমি খেয়ে নাও। আমি তো একটু আগে জলখাবার করলাম। দিলীপ জানে, এখানে করলাম মানে খেলাম। দুধের কড়াইয়ে শুকনো সরের সঙ্গে আটার রুটি আর গুড়। দুই-ছেলের মা চিত্রা বসুরায়ের এটি একটি প্রিয় খাবার। যেমন প্রিয় গরম আলুর চপ। ভাতের পাতে লাউয়ের খোসাভাজা। গরম চিনেবাদাম। ইত্যাদি।

—আজ চোখ দেখাতে যাবে সন্ধে-সন্ধে?

—উঁহু। তোমার চশমাতেই আমি পড়ে নিতে পারি তো।

—দু-জনের চোখে একই পাওয়ার তো হতে পারে না, চিত্রা।

—আমায় নিয়ে অত মন না-দিলেও চলবে। নিজের কাজ করো।

—তা হলে সন্ধে-সন্ধে কোথাও ঘুরে আসি চলো।

—উঁহু। আজ বড়জন আসতে পারে। সন্ধের ট্রেনে খেসিয়াড়ি থেকে—

—বড়জন মানে বড়ছেলে। খেসিয়াড়ি মানে খড়্গপুরের আইআইটি থেকে। মাকে হয়তো পোস্টকার্ড দিয়ে থাকতে পারে। মায়ের সঙ্গেই ওদের দু-জনের দেওয়া-নেওয়া বেশি।

অফিসের জন্য স্কুটারে চেপে বেলা সাড়ে-দশটা নাগাদ দিলীপ বসুরায় কলকাতা চিরে এগোচ্ছিল। আশে-পাশে ডবল ডেকারের প্রমাণ সাইজের চাকা। টাটকা স্কুটারের পিঠে অনেক কাঁচা বয়সের ছোকরা। দিলীপের নিজের বডিটা খুব পুরনো লাগল। স্কুটারের বডিটাও পুরনো লাগতে লাগল তার।

ক্যাথিড্রাল রোড দিয়ে বুড়ো স্কুটারটা দিলীপকে কয়েকটা গাছের ছায়া ডুবিয়ে নিয়ে

চলল। আগেকার সাহেবপাড়ায় তার ওষুধের অফিস। পাতাল রেলের টেম্পোরারি পোল পেরোতে-পেরোতে তার মনে হল, জীবন কি এ-জন্যই? তা হলে কী করতে জীবন করা? ওঃ! এই হল গিয়ে জীবন!

কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম ড্রাগের ফরমুলা জানতে? না, অণুর সঙ্গে অণুর সম্পর্ক যাচাই করতে? আমায় নিয়ে অত মন না-দিলেও চলবে। অটোমেটিক লিফটের ভেতরে ঢুকে আয়নায় চিত্রার সেই প্রথম বিয়ের পরেকার দু-হাত পিছনে দিয়ে চুল বাঁধার ভঙ্গিটা—দাঁতের কামড়ে ফিতে—দেখার ইচ্ছে হল দিলীপের।

সন্ধের মুখে পাড়া জুড়ে অন্ধকার। এসি ডিসি—দুই-ই উধাও। বাড়ির সামনে অন্ধকার ফুটপাতে সাবধানে স্কুটার তুলতে-তুলতে দিলীপ দেখল, একই ফুটপাতে একখানা হাতে-টানা রিকশা এসে ভিড়ল।

—কোত্থেকে বউদি? এই সন্ধেবেলা কোথায় গেছলেন? অ্যাতো সেজে!

—কোথায় সাজ! আপনার দাদার জন্যে ওষুধ আনতে—কীরকম রোগা হয়ে গেছে বলুন তো!

—শ্রীকান্তদা এখন বাড়িতে?

—পাগল হয়েছন! এতক্ষণে ক্লাবে পৌঁছে গেছে। তবে নাকি তিন-পেগের বেশি খায় না আজকাল।

—বলেছিলেন সে-দিন—মেপে এককাপ ভাত খান। বলতে-বলতে ভুল করে স্কুটারের হেডলাইটে চাপ দিয়ে ফেলল দিলীপ। আলো জ্বলেই নিভে গেল। তখন দিলীপ বুঝতে পারল, পুতুলবউদি আজ অন্ধকারে জ্বলছে। স্লিভলেস। সেই সঙ্গে ম্যাচিং সিফন। তাতে খয়েরি ফুল। পারফিউম অন্ধকার মানে না।

—আজ কী সুন্দর সেতার বাজাচ্ছিলেন! আমি লুকিয়ে শুনছিলাম।

—লুকিয়ে কেন? চিত্রা তো সে-রকম মেয়ে নয় —

—চিত্রাও শুনছিল হয়তো। দারুণ বাজাচ্ছিলেন বউদি।

—আপনার তো রোজই দারুণ লাগে!

—ক্লাবে না-গিয়ে শ্রীকান্তদা কেন যে বাড়ি ফিরে আপনার সেতার শোনেন না—বুঝি না—

—রোজ কি শোনা যায়! আমি যাই—

—যাবেন কী করে?

—চেনা সিঁড়ি। খুব পারব। আলো এলে চিত্রাকে নিয়ে আসুন ওপরে। সবাই মিলে টিভি দেখব।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে জমাদারের গলিতে স্কুটার তুলে দিলীপ দেখল, চিত্রা চুপচাপ বারান্দায় মাদুর পেতে বসে।

—চলো—আলো এলে ওপরে গিয়ে টিভি দেখি।

—আমার টিভি ভাল লাগে না। তুমি যেয়ো।

—আজ হয়তো বড় আসবে না। হয়তো ট্রেন লেট।

অন্ধকারেই আন্দাজে শাওয়ারের নিচে সাবান মাখল দিলীপ। তাদের যৌবনে হলিউডের নতুন তারা উইলিয়াম হোলডেন। ডাকনাম বিল। শ্রীকান্তদার যৌবনে ওয়েস্টার্নে হিরো থাকতো ক্লার্ক গেবেল। তখনকার গ্র্যান্ডে ঢুকে—রাজভবনে যখন খাস ইংরেজ ছোটলাট—শ্রীকান্তদারা ক্লার্ক গেবেলের কায়দায় কাউন্টারে অর্ডার দিত—গিভ মি আ ডাবল। একসঙ্গে নিট দু-পেগ পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ঢক-ঢক করে গলায় ঢেলে দিত। একবার বিজয়ার দিন সিদ্ধির ঝোঁকে শ্রীকান্ত চৌধুরী নিজেই এ-গল্প করেছিল।

সেই শ্রীকান্তদা এখন মেপে এক-কাপ ভাত খায়। ক্লাবে গোনাগুনতি তিনটে। তবে তাস চলে অনেকক্ষণ।

শ্রীকান্ত চৌধুরীর বড়ছেলে দিলীপের বড়র চেয়ে কয়েক বছরের বড়। একদিন দিলীপ স্কুটারে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল। শ্রীকান্তের বড়জন বলেছিল, কাকু, ধুতি-পাঞ্জাবি পরবেন। ওতে আপনার গ্ল্যামার বাড়ে।

গা ধুয়ে মাথা আঁচড়ে দিলীপ আজ তাই সরু পাজামার ওপর সস্তার ফিনফিনে কাজ-করা পাঞ্জাবি শুধু গায়ে চড়াল। দিব্যি ইস্ত্রি করা। লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝল, মানুষের গায়ে জামা-কাপড় যখন ভেতরকার গ্লেজ ইন্টারেস্টিং করে তোলে—তখনই শরীরের ছিরিছাঁদ অন্যের চোখে আগ্রহ জাগায়। এটা বুঝতে পেরে দিলীপের মনে একটু আনন্দ হল। তার মনটা তখন গায়ের মলমল পাঞ্জাবির মতই হাল্কা, ফর্সা, পাতলা মাড়ে ফুরফুরে—অথচ ধোপদুরস্ত।

আলো এল। দিলীপ বসুরায় ওপরে গেল। একা-একা। সপ্তাহের গোড়ার দিকে একটা অল্পবয়সি দেঁড়েল গলায় সুতোর গুলি ভরে কুথে-কুথে কী বলছে। একটা কাউন্টারে তার বুক-অবধি আড়াল করা। কমলা, নিরাপদ, খোকন, বীরু, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়—তোমরা জানতে চেয়েছ... উঁহু-উম্—আমি বলব, একটু লক্ষ রাখলেই জানতে পারতে...

আবার কয়েকটা নাম। শেষে একটা জায়গার নাম—দিয়াড়া তারকেশ্বর।...আপনারা জানেন এটা পবিত্র রমজানের মাস...

এর নাম টিভি—এই দেখেন বউদি একা-একা বসে?

—কী করব? ছেলে-মেয়েদের আড্ডা আছে। আপনার দাদার ক্লাব আছে।

—এমন বসে-বসে দেখলে—চোখ-মন—দুই-ই নষ্ট হবে।

—চিত্রা এল না?

—নাঃ। মনখারাপ। বড় খোকার আসার কথা ছিল। আসেনি।

টিভি দেখতে ঘরের কোণে ঢাকনা-পরানো আলো। দেওয়াল-র‍্যাকে জামা-পরানো সেতার। আবছা অন্ধকারে পুতুলের সোফার ঠিক পেছনেই—পাশ ঘেঁষেই দিলীপ আরেক সোফায় বসল।

এখান থেকে এক হাতের ভেতর পুতুল বউদির পারফিউম মাখানো সন্ধের ঘাড়, গলা,

পিঠ—স্লিভলেসের শুরুতে দুই বাহুমূল। একমাথা কালো চুলে একটি ছোট্ট সাদা ফুল। বেলি বোধহয়।

—আমার এমন বউ থাকলে আমি ক্লাবে যেতাম না।

টিভি দেখতে-দেখতে স্ক্রিন থেকে ছিটকে-পড়া আলোর কণাগুলো মুখে, হাসিতে, দিলীপের কথায় সদ্য-সদ্য-তৈরি সুখের সঙ্গে মাখিয়ে পুতুল হেসে বলল, চিত্রা খারাপ কীসে শুনি? রীতিমতো সুন্দরী

—জানেন বউদি—চিত্রা গান জানত। কিন্তু গাইল না ইচ্ছে করে।

—মানুষ যে-কোনও বয়সে শিখতে পারে। ভাল মাস্টার রেখে শেখান না কেন?

এই জায়গাটায় দিলীপ বসুরায় কোনও জবাব দিল না। তার বদলে নিজের মুখখানা, চোখ-জোড়া—শেষে দুই ঠোঁট পুতুলের পিঠে ধাপে-ধাপে চেপে রাখল। পুতুল কোনও বাধা দিল না। দিলীপ সমে পৌঁছবার জন্যে ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁত বের করে আস্তে চেপে রেখে দেখল।

—তাতেও কোনও আপত্তি নেই পুতুলের। শুধু বলল, ভাল লাগে?

নুইয়ে-রাখা মাথার ভেতর থেকে দিলীপ কোনওরকমে বলল, উঁ—

—আগে জানলে বিকেলেই ভিজে চুল শুকিয়ে তাতে ধূপকাঠির ধোঁয়া মিশিয়ে রাখতাম।

—অত দরকার নেই, পুতুল। অ্যাতো সুন্দর সেতারের হাত তোমার। ওতেই হবে আমার—

—তোমার দাদা বিয়ের আগে ঠিক এমনই কথাবার্তা বলত।

টিভিতে এই সময় শেক্সপিয়রের নাটক এসে গেল। কাঠের সিঁড়ি। জোব্বা। শিরস্ত্রাণ। তরোয়াল। পাথরের অলিন্দ...

—এখন তো চা খেতে ডেকে ভাড়া বাড়াবার কথা পাড়ে শুধু।

—আগে কিন্তু এমন ছিল না শ্রীকান্ত।

—তাসের জুয়ো খেলতেন ক্লাবে বেশি রাত অবধি—পয়সার টান পড়বেই তো।

—কিছু ভাড়া বাড়িয়ে দিলে পারো তোমরা। সব জিনিসেরই তো দাম বেড়েছে।

দিলীপ বসুরায় নিজের মাথাটাকে গলাসুদ্ধ হাঁসের গলা করে ফেলল। তারপর কিম্ভুত এক কায়দায় চোখ-মুখ বড় গলার ব্লাউজের ওপর দিয়ে খোলা জায়গায় রেখেই বুঝল—পুতুল আজ নিজের বুকের জোড়ে গুচ্ছের পাউডার ঢেলেছে। নিজের ভ্রূ যে সাদা হয়ে যাচ্ছে সে-পাউডারে—তা টের পেল দিলীপ।

টের পুতুলও পেল। হেসে বলল, এক্ষুনি মুছে ফ্যালো। নয়তো তোমায় রাতারাতি পাকা ভ্রূর বুড়ো দেখাবে কিন্তু—

—আঁচলটা দাও তো! টিভির আলোর রিফ্লেকশনে ভ্রূ, নাক, চোখ মুছতে-মুছতেই দিলীপ বলল, একশো টাকা ভাড়া বাড়াচ্ছি—কিন্তু রসিদে লেখা থাকবে না—

—কেন? এ-কথা বলছ কেন?

—তা হলে তো চুক্তির খেলাপ হবে, পুতুল। উকিলের সামনে আমি আর শ্রীকান্তদা সই

করেছিলাম। তাতে তো ভাড়া বাড়াবার কথা নেই কোনও।

—নাই-বা থাকল, দিলীপ।—বলতে-বলতে দিলীপের মাথাটা টেনে নিল পুতুল চৌধুরী। নিজের গলায়, বুক থেকে চিবুক অবধি দিলীপের মাথা, নাক, গোঁফ দিয়ে বুরুশ চালাতে-চালাতে পুতুল বলল, হলই বা চুক্তির খেলাপ—এটুকু পারো না তুমি? আমার জন্যে পারো না!

অন্য গন্ধ, অন্য শরীর, অন্যরকমের শাড়ি-ব্লাউজের ভেতর বহুকাল পরে ছাড়া পেয়ে পাকাপোক্ত গেরস্থ দিলীপ বসুরায় ভোরবেলার শেকলখোলা অ্যালসেসিয়ানের চেয়েও এলোপাথাড়ি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিচ্ছিল। একটু থমকে বলল, তোমার বেলাতেও শ্রীকান্তদা তো খেলাপই করেছিল। তাই না?

—কীরকম?

—বিয়ের পাঁচমাসের মাথায় তুমি মা হয়েছিলে—

—তখন শ্রীকান্ত পাগল ছিল। একদম পাগল। তর সইত না ওর। প্রেগনান্ট অবস্থায় বিয়ে হয়েছিল আমার। বাবা খুব শক্‌ড হন। আমাদের বোনেদের তিনি মাস্টার রেখে গান-বাজনা শিখিয়েছিলেন।

—একটু দাঁত বসাল দিলীপ।

—উঃ! লাগে না? আমারটা বুঝি শরীর নয়?

—তা হলে বিয়ের আগে সাধভক্ষণ হয়েছিল বলো!

—আমি অনেককিছু বুঝতাম না তখন, দিলীপ। ছাড়ো তো! টিভি-তে কী-সব হয়ে যাচ্ছে দেখি এ-বারে—

বুকে মুখ গুঁজেই দিলীপ বলল, ও-সব দেখার কিছু নেই। ও হল গিয়ে শেক্সপিয়র।

—বিএ-তে আমাদের টেমপেস্ট ছিল।

—আমাদের ছিল রিচার্ড দ্য থার্ড। তুমি কোন সালের পুতুল?

—তা বলব কেন! বয়সটা ধরে ফেলবে তো!

—আমি জানি। তুমি আর আমি—দু-জনেই পঞ্চাশের আশে-পাশে। ফিগারটা ভাল রেখেছ। কে বলবে দুই ছেলে-মেয়ের মা তুমি।

—সত্যি বলছ?

—সত্যি। তিন-সত্যি পুতুল।

—চিত্রাও ভাল রেখেছে। কোমর তো ওর অল্পবয়সী মেয়েদের মতই।

—ওরও মেঘে-মেঘে বিয়াল্লিশ হল। রাতে কিছু খায় না তো—তা বছর-পাঁচেক।

—জানো দিলীপ, আমরা মেয়েরা সুন্দর হয়ে থাকতে যে-কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারি। খিদে তো কোন ছার!—বলতে-বলতে পুতুল চৌধুরী একটু পিছলে গিয়ে বলল, শ্রীকান্ত ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়ে রীতিমত রোগা হয়ে যাচ্ছে। ওরও ফিগার খুব সুন্দর ছিল। আগে তো দ্যাখোনি, দিলীপ—

—শ্রীকান্তদা ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। ব্লাড সুগার নেই তো?

—নাঃ। স্রেফ অ্যাংজাইটি। ওঁর একই বোন। কোনওদিন আসে না এখানে। ঠাকুরজামাই থাকেন কাশীতে। তা সেখান থেকে মামলা করে বাড়ির অংশ, ভাড়ার অংশ চেয়েছেন তিনি। কী গেরো বল তো! তারপর শ্বশুরমশাইয়ের বেশি বয়সের বউ—আমাদের বিধবা সৎ শাশুড়িকে কাশীরই এক আশ্রমে মাসে একশো টাকা করে পাঠাতে হয়। তাঁরও তো অংশ এ-বাড়িতে।

উঠে গিয়ে টিভি-টা অ্যাডজাস্ট করে ফিরে বসতে যাবে পুতুল—অমনি দিলীপ তাকে আস্ত লুফে নিচ্ছিল। অনেকদিন পরে আলতো করে অন্য-একজন পুরুষের গালে একটা ভিজে চুমো গরম নিঃশ্বাস সমেত বসিয়ে দিয়ে একই নিঃশ্বাসে পুতুল বলল, না-হয় রসিদ ছাড়াই মাস-মাস একশো টাকা বেশি গুনলে। কী বলো? ওরা দু-ভাই খুশি হবে।

—রসিদ কিন্তু নিতে পারব না—বলেই দিলীপ ডানহাতে পুতুলের কোমর পেঁচাল। এ-বয়সে—পুরনো বডি নিয়ে—কারও ঠোঁটে আর ঠোঁট দেওয়ার ইচ্ছে থাকে না। তাই দিলীপও কাচপোকার মতো একটা শুকনো চুমো টিপের কায়দায় পুতুলের গালে রাখতে গিয়ে বলল, ও-সব কথা এখন কেন!...ভোরবেলা যে-দিন তুমি সেতার ধরো—আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চুপ করে শুনি।

—ভোরে তো বাজানো যায় না। বেশি রাতে ক্লাব থেকে ফিরে শ্রীকান্ত অনেক বেলা অবধি ঘুমোয় তো—

পুতুলের এ-ভাবে কথা বলা এত ভাল লাগছিল দিলীপের—সে আর নিজেকে রাখতে পারল না। আবার শেকল-খোলা এলোপাথাড়ি অ্যালসেসিয়ান হয়ে উঠেছিল প্রায়। নিজের সোফা ঘসটানিতে দিলীপ একদম পুতুলের সোফার লাগোয়া করে ফেলেছিল।

পুতুলের মেয়ে বারান্দা থেকেই 'মা' বলে ঘরে ঢুকল। পার্ট-টু দেবে এ-বারে।

আর পুতুল অমনি মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল। টিভি দেখবেন তো দেখুন। সেই থেকে কেবল বিড়-বিড় করছেন—

দিলীপ সরে বসল।—আমি আপনার সেতারের এক-নম্বর ভক্ত।

—তাতে হলটা কী? ঠিক হয়ে বসুন। টিভি দেখুন—

মেয়ে তার মাকে বলল, অত বকছ কেন মা দিলীপকাকুকে? এই বয়সের এত ইন্টারেস্টিং মানুষ এ-পাড়ায় আর-একটাও আছে!

—জানা আছে আমার। ইন্টারেস্টিং না ছাই!

নিভু গলায় দিলীপ বসুরায় পুতুলের মেয়েকে বলল, তুই বল তো—

—আপনি বসুন তো, কাকু। আমি চা করতে বলছি।—বলে মেয়ে মায়ের দিকে তাকাল, আবার তোমরা ভাড়ার কথা তোলনি তো। এলেই যদি মানুষকে এক কথা বল—কেউ আর আমাদের বাড়ি আসবে না, মা।

—তোর বাবার অবস্থাটা দেখেছিস?

—তা সত্যি! বলে একদম নিভে গেল মেয়েটি। জানেন কাকু—বাবা না খুব রোগা হয়ে গেছেন। এক-কাপের বেশি ভাত কিছুতেই খাচ্ছেন না। ●



রানী ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে-দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোট-ছোট, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কী করে? রাত্তিরের দিকে পিছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়, অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ-ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনও আলোর খোঁজ করল—কিছুই নেই। তা হলে কী করে এতবড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ও-পাশের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হল না, বিজ্ঞানের আবিষ্কারফাবিষ্কার যত বেশি হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবল।

ভারী-ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিকশা, এমনকী, ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই—যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকবার সরে-সরে দাঁড়াল।

প্রজাপতি-রঙা ছোট-ছোট মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না, সর্দারনিরা এখনও বেরোয়নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কচি-কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন-টেনের মেয়েদেরই ছুটি হয়ে গেল। এমনকী, দু-একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারনি বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো-ঠোঁট দু-জন শিক্ষয়িত্রী না-হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রানী আজ স্কুলে আসেনি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রানী হয়তো এখন আর চাকরিটাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবাব কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারি করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষপর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক-মিনিট—এরপরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রানী, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙিন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না-দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ওই হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিড-ভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের



চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো এ-সব শখ বেশিদিন থাকে না। দিদিমণি-দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা-হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর-একটা সিগারেট ধরাল। আগে চোখাচোখি হোক না! আধ ঘণ্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ করছে? পাড়ার ছোঁড়ারা না আবার আওয়াজ দেয়! যাক গে। বাসে উঠে পড়বে না তো টপ করে!

রানী কিন্তু এ-দিকে তাকাল না। ছাতা বন্ধ না-করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। সুতরাং অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনও কথা না-বলে ওর সামনে দাঁড়াল। বলল, চিনতে পারো?

—এ কী, তুমি? রানী যেন খুব বেশি অবাক হয়নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরল। এতদিনে মনে পড়ল অভাগিনীকে? একটুও দয়া-মায়া নেই শরীরে তোমার? মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে, একটা খবরও নিলে না।

—সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রানি।

—পাঁচবছর আটমাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রানী কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুনছে নাকি? না টপ করে মুখে যা এল বলে দিল? পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে, না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না,—যাক গে যাক। রানী ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছে করল রানীর কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রীফাত্রি বোধহয় দেখে অবাক হবে। থাক। তুমি কেমন আছ, রানি? ভাল নেই। তোমার জন্য সবসময় মন-কেমন করে। বলেই রানী হেসে ফেলল। তারপর হাসতে-হাসতেই দুষ্টুমির হাসি, গোপন করতে না-পেরে, বলল, বিশ্বাস হল না তো? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেলল, কী হবে তোমার জন্য খুব মন-কেমন করে?

—থাক, আর ইয়ার্কি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এ-রকম মোটা হতে হয়? কী সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বড়-বড়...

—এই, অসভ্যতা কোরো না, লোকে শুনতে পাবে। কী হবে আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে? আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

—কেন, স্কুলের সেক্রেটারি? তিনি বাড়িতে মাঝে-মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা, স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনও সংগীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

—না, রানী ছদ্ম-ম্লান গলায় বলল, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর-কেউ করেনি!

এটা একটা পুরনো ঠাট্টা। রানীর চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারি সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রানী এলিজাবেথের (প্রথম) মতোই দেখাত। ওর নাম আসলে প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রানি রানি' বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনওক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেত না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে,

কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রানী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি?' আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বড় রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিৎ তো হবেই! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার!'

রানী জিগ্যেস করল, এখন কী চাকরিটাকরি করছ?

—কিছু না। বিদেশ গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার!

—ফিরলে কেন?

—আমি বিদেশ গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?

—জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না-হলে কী হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?

—তোমার জন্য মন-কেমন করছিল!

দু-জনেই আবার হেসে উঠল অনেকক্ষণ। রানী বলল, জানো, আমার এখন সাড়ে-তিনশো-চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কি, আমাকে বিয়ে না-করার জন্যে এখন তোমার অনুতাপ হয় না?

—মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম-প্রথম, তুমি যখন ওই হুঁতকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু-তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হত, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী! বুক ফেটে যেত। মনে হত, সব মেয়েই এইরকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওফ! বন্ধু-বান্ধবদের তো দেখছি—বিয়ে করে এক-একজন লেধরুস্ হয়ে যাচ্ছে, কীরকম বোকা-বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক-একজনের। আমি কত খোলা-হাত-পা আছি—যখন খুশি বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকল বা না-থাকল, যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি!

—কী নিষ্ঠুর, বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

—মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে! বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আঠাশ! নাকি আরও বেশি, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে!

—এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

—বাঃ, পাঁচবছরে যদি কাউকে দশবছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

—যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশবছর নয়! দু-বছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তা-ও কী ভয়—

—সে-দিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শ-খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

—ও-সব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না! আমার চেয়ে আর-কেউ বেশি চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইল দু-জনেই। অবিনাশ রানীর সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রানী পাশ-চোখে তা লক্ষ করে হাসে।

—সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম! ইস্কুলে যখন মাস্টারনি সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক-

এক সময় কীরকম হাসি পায়! জীবন কাটিয়ে দেওয়া তা হলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম। প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে-মনে খুক-খুক হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কী লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।'—কীরকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়' এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক।' একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

—কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

—ইস্! শখ কম নয়! জানো, চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশান পর্যন্ত দেয়নি। তার বদলে আধুনিক কবির। কী জানি, তোমারই হয়তো।

—কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ো না বুঝি আজকাল?

—যা-তা রাবিশ লিখছ তো এখন! কে পড়ে ও-সব!

—তোমার ইস্কুলের দু-একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না!

—ফাজলামি করতে হবে না! বাড়ি যাই।

—রানি, তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা ছিল।

—আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

—ও, এ-বার বুঝি রাগ হল?

—না রে, পাগলা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হবে না!

—দ্যাখ, খুকি, চালাকি করিস না। এতদিন পর দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

—অত খাতির নয়! আমার কত্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলা-ধাক্কা।

—তবে চল, কোনও চায়ের দোকানে বসি। সত্যি, একটা খুব দরকারি কথা আছে তোর সঙ্গে।

—আবার তুই-তুকারি শুরু করেছিস!

—তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কী নাম রেখেছিস?

—তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা-কুকুর পুষব, সবসময় বুকে জড়িয়ে থাকব তাকে।

—রানি, তোকে খুব জরুরি একটা কথা বলতে এসেছিলুম।

—কোনও দরকার নেই।

—সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।

—না, অবি, কেন এসেছিস, এতদিন পর? কেন ভেঙেচুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো

আছি সংসার পেতে—চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বউ-বউ খেলছি। তুই চাস, সব টান মেরে ফেলে দিই আবার? কিন্তু তুই তো আমার পাশে থাকবি না, জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে? তুই যা।

—না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।

—উপায় নেই যে! সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। এত দেরি করে তো কোনওদিন ফিরি না। ওই বাসটায় উঠি।

—একটু দাঁড়া। আচ্ছা, মনে কর, খুব ট্র্যাফিক-জ্যাম। বাসে ওঠার কোনওক্রমে উপায় নেই। তা-হলে কী করতি, দেরি তো হতই!

—তা হলে হেঁটে যেতাম।

—আচ্ছা চল, হেঁটেই যাই। এইটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি।

এখনও শীত যায়নি, রোদ্দুরের তাত নেই। অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ করেনি যে রানী ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে, স্বাভাবিক এবং ছোট হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রানীর ছায়ার ওপর দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথাও পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে, সন্দেহ কী! দু-জনে দু-জনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগল।

রানী ওর রঙিন ছাতাটা অল্প-অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে বলল, দেখি কী আছে? ঠোঁট উল্টে রানী বলল, কিছুই নেই, কী আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। কটা খুচরো পয়সা আছে।

—ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করব।

—একসময় তো অনেক চুরি করেছ বাপু!

—তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছ থেকে, রানি।

—কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।

—সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতি।

—ছেলেবেলায় ও-রকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম! এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্তি লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকল, রানি!

রানী তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বলল, এ-বার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি? খবর্দার! এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবি!

—কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা-পাতলা ঘাম

জমেছে। খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি—অথচ একটাও চুমু খাইনি তোকে—এ-রকম আগে কখনও হয়েছে?

—তবে আর কী, রাস্তার মধ্যেই শুরু কর। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক।

—ওই জন্যই তো বলছিলুম, কোথাও গিয়ে বসি।

—ইস্, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কী! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসব টেবিলের দু-পাশে।

—দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হব।

—শাশুড়ি থাকে।

—থাকুক। শাশুড়ি যে-দিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে, আমি তক্কে-তক্কে থাকব।

—আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলব না। কেন খুলব? তুই আমার কে?

—আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠব।

—কেন? তুই আমার কে?

—আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

—ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে! দেখি মুখখানা!

—তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস না, রানি। আমি বিলেত ঘুরে এলুম হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেতফেরত।

—ওরকম বিলেতফেরত গণ্ডায়-গণ্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইম্প্রেস করতে এসেছিস! কী অধঃপতন রে তোর!

—রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাব।

—চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাব যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

—ও-সব লোকফোক আমাকে দেখাসনি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুণ্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাব।

—নিয়ে গিয়ে কী করবি?

—তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘষব।

রানী হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, এখুনি ঘষ না, এই যে দাঁড়িয়েছি। লোকে দেখুক, ক্ষতি নেই।

—তারপর তোর মুখও ঘষবি, আমার পায়ে?

—তার দরকার নেই। তোর ওই কুচ্ছিত পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

—ও, রানী সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে।

—সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী মনে থাকে না বুঝি?

—বাঃ, পরস্ত্রী! আয় না রানি, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাসক্লাশ জিনিস।

—অবৈধ প্রেমই যদি করব, তবে পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন যোগাড় করতে পারি না?

—করেছিস নাকি এর মধ্যেই!

অবিনাশ রানীর ছাতার একটা খোঁচা খেল। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল, অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়ল। অবিনাশ যে সে-দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-করে আর-একটা সিগারেট ধরাল—তাতেই খুশি ছড়িয়ে পড়ল রানীর মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কীসে খুশি হয়, বোঝা যায় না। খুশি হয়ে রানী বলল, আজকাল এত বেশি সিগারেট খাস কেন?

—তুই খাবি নাকি? আগে তো দু-একটা খেয়েছিস।

—হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনেরবেলায় সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে যাই। তা হলে আর আমার বাকি থাকে কী?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইল। তাকিয়ে দেখল, ওদের ছাযাটায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রী রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনও মানে নেই। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললে, সত্যি রানি, আমরা অনেক দূর সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ-সাতবছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কীরকম অদ্ভুত শোনাল, যেন একটা বিদেশি শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতি—

—থাক পুরনো কথা। আমি ভাল আছি, অবিনাশ।

—আমিও খুব ভাল আছি। বিশ্বাস কর, আমি কোনও দুঃখের কথা বলতে আসিনি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রিজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে—নীচ দিয়েও আছে একটা সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নীচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়াল দু-জনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেলল জলে, ব্রিজের নীচ দিয়ে ভেসে গেল। রানী একেবারে জল ভালবাসে না। অবিনাশ রানীকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রানী এক্ষুনি ওই জলে থুতু ফেলল!

রানী বলল, এইবার শুনি কী দরকারটা? কী-এমন দরকার আমার কাছে? ইস্, কত বেলা হয়ে গেল যে!

অবিনাশ জানত, রানী এইবার ও-কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কীরকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রানী ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বলল, কী?

—তোকে একটা কথা বলব, রানি। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তো তোর সেই অবিনাশই আছি।

—অত ভনিতার দরকার কী? কী চাই বল না।

—রানি, তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও?

—হুঁ। ওর খুব একা-একা লাগত, তাই পাশে আর-একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক বাজে কথা—দরকারি কথাটা কী? কী চাইতে এসেছিস, এতদিন পর?

—মুক্তি। এককথায় বলতে গেলে—

—সে আবার কী? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস, আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধনটা আর কোথায়?

—সে-রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিসনি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে, কিন্তু—

রানী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারল না। সেই জন্যই বোধহয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। কোনও সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বলল, বেশ থেমে-থেমে ঠাণ্ডা গলায়—তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পাইনি ঠিক। কেন পাইনি জানিস, সবসময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে! তোর শরীর তো আমি জানি না।

—এ-বার বাড়ি যাই।

—না, না, শোন, আমার পক্ষে খুব জরুরি কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা-কিছু ফেমিনিন—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কী অসম্ভব উথাল-পাতাল করত তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সক্কলেরই যা হয় আর কী। কিন্তু কোনওদিন তোর সঙ্গে শুইনি, সাহস পাইনি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ওই অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুকরো-টুকরো হয়ে যাব। এইসব আর কী। এখন দ্যাখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে, প্রেমফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না-দিয়ে—আমার যে-টুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে, বুঝি সাধারণ কাণ্ডকারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না-জেনে—তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই, ওরা না-জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে। ওদের কোনওদিন বলব না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনও—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনও পাইনি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত কী-ই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে, আমার

জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি, এ-কথা বললুম বলে! তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি কিছু মনে করছি? তুই নিশ্চয়ই আশা করিসনি, আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব!

—বয়ে গেছে আমার মনে করতে। যাক, এ-সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কী। আমি কী করব?

—তুই বুঝতে পারছিস না, রানি। তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

—কীরকম সাহায্য? আমার কাছে কী চাইছিস?

—একটি দিন।

—তার মানে?

—আমি তোর সঙ্গে একবার —

—তাতে কী লাভ হবে?

—আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে, আসলে তুইও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনও আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাব। তার বেশি কিছু পাবার নেই।

রানী হঠাৎ চোখদুটো খুব নিচু করল। যেন ওর চোখদুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে! কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা। সেইরকমভাবেই বলল, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল! একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রানীর কাঁধে হাত রেখে বলল, এ কি রানি, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলিনি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দু-জনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রানী ফুঁসে উঠে বলল, না আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ!

—এটা তো ছেলেমানুষী! আমাদের এত বয়েস হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না-পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাব না—এ কি সম্ভব নাকি!

—হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা, তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয়-পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেব না।

—ও-সব কিছু না, রানি। জীবন অন্যরকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—

—তারপর আমার কী হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকব না? অবি, তোকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাইনি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুই-ও সাধারণ, আমার স্বামীর মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কী রইল? তোকে দেখলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠল। যদি দেখি, তুইও, তা হলে, আমার এই চাকরি-করা, স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কী থাকবে তা হলে? আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না? একজনের কাছে

অন্তত রানী হয়ে থাকব না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সবকিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।

—কিন্তু জানাই তো ভাল। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কী-কী প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিত।

—তুই আর আমার সামনে আসিস না! কোনওদিন না! সবচেয়ে ভাল হয় তুই যদি এখন মরে যাস। তা হলে তোকে জেনে ফেলার কোনও ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালবাসতে পারব।

—তুই ভুল করছিস। ওকে ভালবাসা বলে না। কী দরকার ভালবাসার? ভালবাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হল, জানা। যদি তোকে—

—আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি, তোর জন্য আমার মায়া হয়!

পাশ দিয়ে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন শান্তভাবে কথা বলছে রানী! কিন্তু ওর মুখের একটা সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রানী কেন এমন রাগ করল। রানীর ওপর ওর জোর ছিল কত। কত হুকুম করেছে একসময়। ওর কথায় রানী একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বলল, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রানি। অনেক ভেবেচিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরি গেছি, কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয়নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে-দূরেই থাকব। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখল রানী চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরল না, যেন ও একাই চলে যাবে। কী ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। মনে-মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানাল রানীকে। ওখানে দাঁড়িয়ে ও আর-একটা সিগারেট ধরাল। একা-একা কিছু না-ভেবে সিগারেট শেষ করল। সত্যি, সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রানীর কথা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন। ও নিচের ময়লা জলের স্রোত দেখল। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখল অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে-খুঁচতে রানীর জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, আমি কি রানীকে অপমান করলুম? আমি তা মোটেই চাইনি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে রানী ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেক বাদে রানীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কি না—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে। ●





মাঝখানের দরজা

রোজকার মতো হল না, বাথরুম সেরে আলোটালো নিবিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে অনুভা আজ প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিল। মেয়ে শুয়ে পড়েছে ঢের আগে, তার মর্নিং স্কুল, এতক্ষণে নিশ্চিত কাদা। তবু ভাল যে, হুড়কো লাগিয়ে ছিটকিনি তোলা ও বেডসুইচ অফ করার মধ্যে অনুভা আজ বেশি সময় নেয়নি। গত মাস-দুয়েক ধরে রোজ যেমন, সারারাতের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল ওই ঘর। মাঝখানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ থাকবে সারারাত।

খুব পীড়াপীড়ি না-করলে, অনুভা আজকাল আর এ-ঘরে আসে না। ঝাড়া পাঁচটি বছর কাঠখড় পুড়িয়ে উত্তর-কলকাতা-ভাবাবেগে-ভরা যে-বিধুর সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছিল ধ্রুব, কে জানত, মেয়ের বয়স বছর চোদ্দো হবার আগেই সারারাত-নারী থেকে সে তাকে এমন নিঃশেষে বঞ্চিত করবে। দীননাথও তো চিনত অনুভাকে, বলতে গেলে তারই বান্ধবী, বিয়ের বেলা শাহ্‌লা দত্ত-হারামজাদা কেমন ক্লিন বারো বছরের মার্জিন রাখল। পড়তি-কুড়িতে বীথি এখন যা, বিয়ের সময় অনুভা তার চেয়ে বড় বই কিছু ছোট ছিল না।

অনুভা এ-বার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাবল-মার্চ করে ঘুমের বাড়ি যাবে। ঘুমের বাড়ি না যমের বাড়ি? সে যাই হোক, ততক্ষণ এ-ঘরে একটি চেয়ার টানাটানিও বারণ। হাঁচি পেলে, ধ্রুব আস্তে হাঁচবে! মুনের না মার্নিং স্কুল? অনুভাকে উঠতে হবে না তার সঙ্গে? হ্যাপা কে পোয়াবে, ধ্রুব না অনুভা?

এখন সারা ফ্ল্যাট অন্ধকার। শুধু ঝলমল করছে ধ্রুবর মাথা। আর বিলম্বের প্রয়োজন কী। মশারি তুলে ধ্রুব বিছানা থেকে বেরোয়। ধ্রুবদের ফ্রিজটি নতুন না, বেশ শব্দ হয়। দুই ঘরে পাখা চলছে ফুলফোর্সে, একটা সাঁই-সাঁই শব্দ আছে তাদেরও। পদশব্দ যদি কিছু হয়, ঢাকার পক্ষে এটা যথেষ্ট। অবশ্য ঝোপ থেকে বেরোনো চিতার সঙ্গে তার এখন বিশেষ তফাত নেই। নোখটোক যা-কিছু, সবই থাবার মধ্যে।

কিছু আগে অনুভাকে শুনিয়ে ধ্রুব যে ছিটকিনি লাগিয়েছিল, তা ছিল শব্দমাত্র, আসলে লাগায়নি। ভেজানো দরজা সাবধানে খুললে শব্দ হবার কথা না, হলও না। চৌকাঠ ডিঙিয়ে করিডোরের বাঁ-দিকে ডাইনিং স্পেসের সামনে গিয়ে ধ্রুব দাঁড়ায়। টেবিলের পাশে যার-পর-নেই নোংরা, যত্রতত্র-গিঁট-বাঁধা, তেলচিটে, টাঙানো মশারি একটি। মশারির বোঁটকা গন্ধে নাকের পাটা কুঁচকে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে, যে-ভাবে সারা শরীর সে স্ট্রেচ করে নেয় তাতে একটি চিতার জীবনসর্বস্ব ছিলই, বস্তুত তা ছিল চিতাসুলভ। যেন খরগোশের বিধিলিপির

জন্যে সে এক ঝোপের সামনে স্বাধীকারপ্রমত্ত দাঁড়িয়ে। তার পরনে পপলিনের আন্ডারউয়্যার, ঊরু-অবধি উলঙ্গ পা-দুটি ঘন লোমে ঢাকা।

বাইরে গুমোট। মশারিতে কিছু জ্যোৎস্না এসে লেগেছে বটে, কিন্তু চিটপিটে ময়লা এত পুরু যে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। উবু হয়ে বসে, মশারি তুলে, ধ্রুব তার দক্ষিণ থাবা মশারির মধ্যে পাঠায়। ফ্রক সরিয়ে বছর-ষোলোর দুটি স্তন সে পায়, যার মধ্যে একটি ধরে সে মৃদু আকর্ষণ করে। ডাকে, আয়। থাবার সর্বস্ব তাকে ডাকে। ডেকেই সে কিন্তু এ-ঘরে চলে আসে না। সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধ্রুব যাকে ডাকে, ষোলো বছরের সেই মেয়েটির নাম সিন্ধু। এবার সে বেরোয়। ভারি পরিপাটি করে মেঝেয়-লগ্ন বিছানায় সে ফের মশারি গোঁজে। অনুভা যখন থাকে না এ-সব ধ্রুব তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে। এর মধ্যে একদিন, কোনও-একদিনও কি ঘর খুলে বেরিয়ে পড়েনি অনুভা? তা নয়। একদিন পড়েছিল। শেষরাতে বাথরুম যাবার ভারি অসচরাচর প্রয়োজন হয়েছিল মুনের, দেখতে-শুনতে তা মুনও চোদ্দোয় পড়েছে। বছর-দুই আগেও কত ছোট ছিল যখন ভোরের বাথরুম থেকে এসে, মা নয়, বাবাকে নাড়া দিয়ে বলেছিল (হেসে) 'বাপি, আমার হিসির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে!' বজ্রাঘাত হোক ধ্রুবর মাথায় যদি এ-কথা সত্যি না হয়। মাত্র দু-বছরে ছোটবেলাটা কোথা দিয়ে যে নষ্ট করে ফেলল মেয়েটা, ভাল করে একবারটি আদর করে নেবার আগেই।

সেই মেয়ে ও মা একসঙ্গে বেরোল, শেষরাতে যখন সিন্ধু এ-ঘরে ধ্রুবর বুকে লীন, ওঃ ভাবা যায়! অনুভা অবশ্য একদম ধরতেই পারেনি যে ঝোপ তখন ফাঁকা। ধরবে কী করে, এ-সব মহালয়া-মহালয়ায়-কাচা মশারির ময়লা এত পুরু আর এমন চিটপিটে যে দিনমানেই বোঝা যায় না ভিতরে কেউ আছে না নেই, তো রাতে। আর ছেঁড়া কাঁথাকুতির বিছানার সঙ্গে কি পরিপাটি করে গোঁজা মশারিটি! একটিও বেশি হৃৎস্পন্দন হতে না-দিয়ে, ধ্রুব শুধু অপেক্ষা করেছিল। হার্ট তো নয়, ধ্রুবর, দেওয়াল-ঘড়ি যেন। গুনে ষাটটি দুলুনি পেণ্ডুলামের, ষাটটি টিক-টিক, তবে এক-মিনিট। পাক্কা ষাট-মিনিট, তবে ঢং।

বাথরুম বন্ধ হল। অনুভার ঘরে হুড়কো উঠল। ছিটকিনি উঠল। আলো নিবল। তবে টান-টান হাত থেকে স্যুটকেশ নামিয়ে রাখল ধ্রুব। অর্থাৎ বুক থেকে সিন্ধু।

প্রায় মাস-তিনেক হতে চলল কাজে লেগেছে মেয়েটি। মাস-দুই ধরে এই আসা-যাওয়া চলছে, মাঝে-মাঝে। মোট ক-বারই বা। তবে এত চটজলদি, অনুভা সুইচ অফ করতে-না-করতে, এমনটা এই প্রথম। এর আগে মধ্যরাতে বা যখন রাতশেষ, ঘুম ভেঙে গেলে তবেই টেনে এনেছে ধ্রুব। আ-খাওয়া মড়ি যেন বাঘের, কাছে যেতেই হয়েছে, টেনে আনতেই হয়েছে। কিন্তু না, ঘুমের ওপর সে আর বিশ্বাস রাখে না। নতুবা দেখতে-দেখতে একটা হপ্তা কাবার হয়ে গেল, একদিনও কি ঘুম ভেঙে যেতে নেই? কই, ভাঙেনি তো। অগত্যা বাধ্য হয়ে, তাকে আজ এই চরম ব্যবস্থা নিতে হল।

আজ ধ্রুবর হাত ধরে এ-ঘরে পা-টিপে ঢুকে মশারি তুলে সিন্ধু সোজা বিছানায় উঠে যায়। সিঙ্গল্ বেড, তবে ধ্রুবর কিছু অসুবিধে হয় না। রোগা মেয়েটা কতটুকু বা জায়গা নেয়, আর

আসলে কটা মুহূর্ত বা সে পাশে থাকে। হয় সে থাকে ধ্রুবর বুকে, নয়তো ধ্রুব তার। এবং কাজ ফুরনো মাত্র যাঁহাকা-মাটি-তাঁহা পাঠিয়ে দেয় ধ্রুব। ডাইনিং স্পেসে গিয়ে সিন্ধু পূর্ববৎ শুয়ে পড়ে। আসল কথা, সঙ্কট মুহূর্ত তো একটাই হয়, আর সেই অদ্বিতীয় মুহূর্ত-ব্যত্যয়ে এক জীবনের ভুলচুক হয়ে যায়। ধ্রুব তাই, বরং তিলার্ধ আগেই, পাঠিয়ে দ্যায়।

সিন্ধু ধ্রুবর বিছানায় ঢুকে গেলে ধ্রুবর কাজ তবু কিছু বাকি থাকে। কনট্রাসেপটিভ সে আগে থেকে ছিঁড়ে খুলে রাখে। বাচ্চা মেয়ে, জেলি লাগে সামান্য, নিরোধক হিসেবেও এটা অধিকন্তু, সে মায় টিউবের কর্কটিও আগেভাগে খুলে রাখে।

বাকি থাকে শুধু ছিটকিনি তোলা। ধ্রুব এতক্ষণে সত্যি-সত্যি ছিটকিনি তোলে। ভূমিকম্প না-হওয়া সত্ত্বেও যদি বেরোয় অনুভা, সে-দিন যেমন, ডাইনিং স্পেসের পাশে পরিপাটিভাবে গোঁজা মশারি ও ধ্রুবর বন্ধ দরজায় সে একবার করে অকারণে চোখ বোলাবেই। আঙুল দিয়ে ঠেলে পরখ করেও নিতে পারে অসম্ভব কী। ধ্রুব তাই ছিটকিনি দেয়। এবং হ্যাঁ, একটিও কিঁচ শব্দ না করে। যখন অনুভা থাকে না, বা বেরোয়, সেইসব সময়ে বহু অনুশীলন করে সে এটা আয়ত্ত করেছে। এই অসাধ্যসাধন একটিও টু-শব্দ হতে না-দিয়ে ডাঁটি-ধরে এই ছিটকিনি-তোলা। রাতে অনুভা এ-ঘরে একদম আসে না সে প্রায় মাস-ছয়েক হতে চলল।

খুব ফিস-ফিস করে এখন মশারির মধ্যে কথা বলে চলে। কিন্তু তার প্রয়োজন কী।

মোট ক-বারই বা, কিন্তু সেই প্রথমবার থেকে আজও, বারেকের জন্যও প্রয়োজন হয়নি। উঠে যাবার আগে সিন্ধু তোশকের নিচে হাঁটকে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটি পাঁচটাকার নোটের পেটে অতিরিক্ত টাকাটি আছে কি না বুঝে নেয়। নিয়ে, নিজের জায়গায় চলে যায়। সাধনালব্ধ কুশলতায় ধ্রুব দেয় ছিটকিনি তুলে। হেয়ারক্লিপ কি একটা সেফটিফিন যে পড়ে থাকবে, সেটি হবার যো নেই। সব, মায় ইজেরটি পর্যন্ত, খুলে আসে সিন্দু। এ-জন্যে, যখন মুন যায় স্কুলে এবং অনুভা বেরোয় এবং ধ্রুব বাড়িতে—ক্বচিৎ হলেও এমনটা হতেই হয়—বেশ কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়েছে ধ্রুবকে। এইসব ক্লাসে, বাংলা অনার্সের মেয়েগুলোকে 'সো মোহ্ কান্তা দূর দিগন্তা' বোঝানোর তুলনায়, প্রফেসরদের চেয়ে, ঢের বেশি বেগ পেয়েছে সে। শুবু সিন্ধুর বিবর্ণ মাথার চুল একটা যদি কোনওদিন আটকে থাকে বালিশে, বলা কি যায়, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। সকালবেলা বেশ দেখে-শুনে বিছানা ঝাড়ার সুশিক্ষা ধ্রুব তাকে দিয়ে রেখেছে।

প্রথম ক-বার পাঁচ পায়। মাসের হিসেবে অঙ্কটি খুব-একটা বেশি দাঁড়াল কই। কটা বা টাকা পেল সিন্ধু, যা নিশ্ছিদ্র ঘুম ধ্রুবর। প্রথম মাসেই তো দিল একটা গোটা হপ্তা কাবার করে। একদিন তো জাগতে পারল না। সে-মাসের শেষ-সপ্তাহে ছিককিনি তুলে ধ্রুব বিছানায় ঢুকতেই, সিন্ধু তাই ঘোর কটাক্ষ করে, দু-হাত তুলে, বোবাদের মতো ঈষৎ ঝঙ্কার লাগিয়ে হাতে ধ্রুবর মুখের সামনে ছটা আঙুল মেলে ধরেছিল। জানালা দিয়ে সে-দিনও কিছু জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। নীল নাইলনের ঝাঁ-চকচকে যা স্বচ্ছ মশারি ধ্রুবর, সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। পাঁচ-প্লাস-এক সেই থেকে ছয় চলছে।

অনুভা এ-ঘরে আসে না, সে প্রায় মাস-ছয়েক হতে চলল।

গতবছর, সেটা এপ্রিল না মে মনে নেই, দার্জিলিঙে তারা তখন, অনুভা তাকে বাথরুমে ডেকে নিয়ে যায় ও পায়খানার দরজা খুলে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনে যে-কটি কাজ দেখে ধ্রুবর বোবা মন মুখর হয়ে উঠেছে প্রশংসায়, তার মধ্যে একটি হল দার্জিলিঙে থাকতে তাদের জমাদারনি ফুলমনি ছেত্রির ধোয়া প্যানের অকলঙ্ক সাদা : সে-দিন তার ওপর পড়ে আছে পোয়াটাক, কমসে-কম তিনছটাক তো হবেই, ঘোরবর্ণ রক্তের একটি ডেলা। লাল যেন কালো হয়ে যাচ্ছে এমন... ধ্রুব খুব-একটা অনুমানী লোক নয়, তবে অনুভার তখনও পিরিয়ড চলছে—সে দেখেই বুঝেছিল, এ-জিনিস মুখ থেকে আসেনি।

সুস্থ পিরিয়ডে ঠিক কতটা রক্ত পড়ে, ধ্রুবর জানার কথা নয়। স্ত্রীর পিরিয়ডের হিসেব রাখা সে অন্য ব্যাপার, দীননাথ রাখে। তবু, তুহিন সাদার ওপর ওই লাল রিরংসা—প্রতীক সৌন্দর্য যেন—সে দেখেই বুঝেছিল, এটা ঠিক স্বাভাবিক না, বা, এমনকী কিছুটা ভয়ের। সে ভয়ে-ভয়ে অনুভার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। 'দ্যাখ হতভাগা, আমার কী অবস্থা করেছিস।' শান্ত, কঠিন গলায় কেটে-কেটে বলেছিল অনুভা।

কলকাতায় ফিরেই প্রথমে ডিসি করানো হল। কাজ হল না। জুলাই-এর শেষাশেষি সেই অপারেশন করাতে হল। 'ইউটেরাস রিমুভ্‌ড হল তো কী, এ,' দীননাথ বলেছিল, 'ও কিছু না। আমার ছোট শালীর তো এ, ওই এক ব্যাপার। বাচ্চা মেয়ে! ভায়রার তো,' দীননাথ আশ্বাস দিয়েছিল, 'এ, ফকিংটকিং দিব্বি চলছে।'

যদিও কার্যত দেখা গেল, একটি গভীর প্রশ্বাস নিয়ে তা মোচন করে আজ ভাবে ধ্রুব, তা না। দীননাথের কথা বিশ্বাস করে ধ্রুব ঠিক করেনি, ভুলই করেছিল। দীনুর বাঁজা বউটা তো পাছাটি লেজ হিসেবে নাড়াচাড়া করেই দশবছর দিব্যি কাটিয়ে দিল অ্যাকোরিয়ামে, যে ডাকল তার সঙ্গে শুয়ে এল, এক স্বামী ছাড়া। শালা গাণ্ডু বউ-যন্ত্রের তুমি কী বুঝবে?

অনুভা আর ঠিক সেরে উঠতে পারল কই। সেপ্টেম্বরে মনে হল বুঝি সেরেছে, একদিন ট্রায়াল দিতে এ-ঘরে এল। 'নাঃ, উঃ, অসম্ভব।' অক্টোবর..নভেম্বর.. গতবছরটা মাঝে-মাঝেই চেষ্টা চলল। ডিসেম্বরের শেষাশেষি ও-ঘরে হুড়কো লাগাল অনুভা। জানুয়ারিতে ছিটকিনি! বছর ঘুরতে চলল। অনশনে এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কোনও রেকর্ড নেই, কোনও জন্তুর, মানুষ বলে এতদিন বেঁচে ছিল ধ্রুব।

মার্চে, বাগবাজারে অনুভার বাপের বাড়ির পাড়া থেকে এসে সিন্ধু কাজে লাগল। সপ্তাহ না-ফুরোতেই একদিন শেষরাতে ধ্রুবর ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে শুরু হল আসা-যাওয়া।

মোট ক-বারই বা, তবু দু-আড়াই মাসে যার আদৌ দরকার হয়নি, আজ তার প্রয়োজন হল। একটা খালি ট্রাম লটরপটর করে ফিরে যাচ্ছে গুমটিতে। সেই ফাঁকা আওয়াজের সুযোগ নিয়ে এই প্রথম ফিসফিসিয়ে কথা বলল সিন্ধু।

'মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল,' সে বলল।

ধ্রুব কিছু কথা বলছিল না, বলেওনি কোনওদিন : সিন্ধুর সঙ্গে কাজের কথা যা কবেই শেষ হয়ে গেছে। তবু, সিন্ধু যা বলল, শুনে সে টের পেল এতদিন সে সিন্ধুর সঙ্গে কত কথাই না

বলেছে এবং আজই এই প্রথম চুপ করে আছে। সিন্ধুর পাতলা, পরিণতিকামী কোমরের খাঁজে আটকে আছে তার হাত, উঠে এতক্ষণে তার অন্যত্র যাবার কথা, সে ভুলে গেছে তুলে নিতে।

ডাক্তার! মা? কিন্তু কেন? পেট-খারাপের জন্যে নয় তা বুঝেছে, তবে কেন? সে চুপ করে রইল।

প্রেগন্যান্ট হবার বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ চান্স তো নেই। যখন অনুভা বেরোয় বা থাকে না আর মুনও স্কুলে, আমি কি তোকে বোঝাইনি কেন কনডোম, কেন জেলি আর কী করলে বাচ্চা হয়, আর কী না-করলে বাচ্চা হয় না? শরীর ককিয়ে উঠে বলেছে 'ঢাল, ঢাল—' কিন্তু কোনওদিন কি তা হতে দিয়েছি? মাই, মাই, দ্যাট্স নো কাপ অফ মাইন, লেডি! সরি।

এই তো, আবার ভাষা খুঁজে পেয়েছে সে, আর ওই তো একটা ট্রাক না-এলেও নিদেনপক্ষে একটা গ্যারাজগামী বাস আসছে। আসুক, কাছাকাছি এলেই শুরু করে দেবে ধ্রুব এবং বাস বেরিয়ে যাবার আগেই যা বলার বলে দেবে ভেবে, সিন্ধুর কানে মুখ রেখে তবু অভিপ্রেত লোডেড ট্রাকটি গাঁ-গাঁ শব্দে বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে, 'সে কী!'—এর বেশি কিছু সে বলতে পারল না। এ-বার 'কেন, কী হয়েছিল', জানতে চাইবে বলে সে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। নাঃ, কিছু এল না। না-ট্রাম, না-বাস, না-ট্রাক, নিদেন একটা ট্যাক্সি—না, কিছু।

এখন বাড়ির বাইরে জ্যোৎস্না। ঘরে ঘোর অন্ধকার। সে তাই তার মুখ থেকে রক্তাভা অন্তর্হিত হতে দিল। সিন্ধুর অভিব্যক্তি দ্যাখা যায় না।

হাতের ভাষায় সিন্ধুকে উঠে বসতে বলে ধ্রুব ছিটকিনি খুলে দাঁড়ায়। একটু কিঁচ-শব্দ হল কি? 'এ নিয়ে পরে কথা বলব', বাস বা ট্রাক কি ট্রাম কোনও কিছুর পরোয়া না-করে বিবর্ণ ফাঁসা গলায় সে সিন্ধুকে জানাল। ছিটকিনি দিতে ভুলে গেল সে আজ। সিন্ধু টাকা নিয়েছে কি নেয়নি, এটা জানার আজ খুবই প্রয়োজন ছিল। তার মনে এল না।

সে জানালায় দাঁড়াল। বৃষ্টি শুরু এবং শেষ হল কখন? একটি জলধোয়া ডাবলডেকার আলোটালো জ্বালিয়ে গ্যারাজে গেল। তারপর রাস্তা ফাঁকা পড়ে রইল অনেকক্ষণ। সারারাত-যেন-আর-একটাও-গাড়ি-যাবে-না এমন চকচকে রাস্তা দিয়ে একটি সওয়ারিবিহীন কালো মোষ অতি মন্থরভাব হেঁটে যাচ্ছে, সে দেখল।

বাসী মুখে চা খেয়ে ধ্রুব দাঁত মাজতে যায়। বহুগুণধর এই পেস্টটির একটি অঘোষিত আসল-কর্ম হল, জিভে গেলেই পেটের মধ্যে গুরুগুরু ধ্বনি। যার হয়, সে ছাড়া নাকি আর কেউ শুনতে পায় না? সিন্ধুর কথা মনে পড়তেই হাত দিয়ে মাটি উড়িয়ে দিল সে। 'মা ডাক্তারের কাছে গিয়ে গিয়েছিল...।' ক্যানো গা কুকি, মনে-মনে ভেঙিয়ে ওঠে সে, তোমার কি পেট-কারাপ করেছিল!

দীননাথকে বলতে হবে, দাঁত মাজতে-মাজতে ধ্রুব ভাবল। বেসিনের নিচেই একটা গামলায় শায়া ও ব্রেসিয়ার কেচে রেখেছে অনুভা, এখনও শুকোতে দেবার সময় পায়নি। সঙ্গে তার একটি গেঞ্জিও রয়েছে। একসঙ্গে খানিকক্ষণ পড়ে থাকলে যা হয়, শায়ার হলুদ কিছুটা গেঞ্জিতে লেগে গেছে। যখন ও-দুটি জিনিস, শায়া ও ব্রেসিয়ার, ঝিকে দিয়ে কাচানো

যায় না, তখন ও-দুটি পরা কেন—সে একবার জানতে চেয়েছিল অনুভার কাছে। মিষ্টি হেসে আর ছোট্ট হাই তুলে যৌবন তখন সবে অনুভাকে বলেছে, 'এবার উঠি রে।' অনুভা বলেছিল, 'কেন আর ভালো লাগে না, খুলতে?'

উত্তরটি কী রসভরা আর পাকা! সঙ্গে অতটুকু হাঁ-মুখের অবিশ্বাস্য চওড়া রক্তাভ হাসি যা আনকথা মনে পড়ায় এবং এক-কথায় যা টেনে নিয়ে যায় রাতের খোড়ো বিছানার কামময় উমে। উত্তর-কলকাতা-ভাবাবেগে-মথিত যে-বিধুর সফিস্ট্রিকে সে বিয়ে করেছিল, খাঁটি সুপ্রভা সরকার গায়কীতে যে গাইতে পারত চল্লিশ দশকের 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবির 'গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি' গানটি এবং এখনও পারে—যে ফ্রিজিড ছিল না ও যার অর্গ্যাজম হত—সেই বাহুল্যবর্জিত তলপেট, উরুতে স্পন্দিত ফণা, সবই তো আগের মতো—সত্যি, অনুভার মতো রিমার্কেবল মেয়ে কেন যে আর কটা বছর অফার করতে পরল না। সিন্ধুর সঙ্গে এই যে রাতের ব্যাপার অনুভা কি এ-জন্যে পুরোপুরি দায়ী নয়! ছোট-বড় চাপা নিঃশ্বাসে ধ্রুবকে বুক ভরে ওঠে।

তবে তার ভয় নেই, ধ্রুব নিশ্চিত যে, সে দায়ী হতে পারে না। লাভারটাভার আছে নিশ্চয়। বাগবাজারে মার কাছে তো প্রায়ই যায় সিন্ধু। তার সঙ্গে সিন্ধুর অ্যাফেয়ারটা হয়তো গোড়া থেকেই স্টাডি করছে; এখন কিছু টাকা খেঁচার ধান্দা আর কী, সিন্ধুর মায়ের। দু-একশো যাবে, সিন্ধুর হাতেই সুযোগমত গুঁজে দেবে ধ্রুব। খসিয়ে নিক, বিয়ে দিয়ে দিক, যা পারে করে নিক। অনুভা না-জানলেই হল। যদি বেশি ত্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করে তো ডিসি-নর্থ সুনীতি বসুরায়কে বলে ঘড়িচুরির একখানা পুলিশ-কেসে ফাঁসিয়ে দিলেই হবে। সুনীতি তার ক্লাস-মেট।

আর, হ্যাঁ, অফিসে গিয়ে দীননাথকে ডেকে পাঠাতে হবে। সব শুনে, দেখা যাক, এরিয়া ম্যানেজার কী বলে। কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে এতদিন তো অন্তত ঘরে ঢুকে 'সার' বলত। এরপর থেকে 'ধ্রুব' ডাকবে নিশ্চিত। চাই কি, ডাকনামে, 'এ, হাবু' বলেও ডাকতে পারে। বলুক, শালা ঘ্যাম খচ্চর, বউ না-জানুক, ঝি জানে। দ্যাবা-দেবী জমিয়েছে ভাল, ঘুরে-ঘুরে পছন্দ করে বীথি তাকে প্রতি পুজোয় নতুন ঝি উপহার দিয়ে যাচ্ছে। দীনুর কাছে সারেণ্ডার করা ছাড়া উপায় নেই।

কমোডে বসে ধ্রুব আজকের বাংলা কাগজখানা মেলে ধরে। আ, এই কাগজখানা! নাকি ওই পেস্ট? বসামাত্র এই তাৎক্ষণিক গলা-ধাক্কা দেয় কে যে, তা এক ওপরঅলা ছাড়া কেউ জানে না। প্রথম পাতায় সুরূপা মামলার অনুসরণে সে বাকি 'দ্রষ্টব্য' খুঁজতে পঞ্চম পাতার ষষ্ঠ কলামে খুঁজে বের করতে গিয়ে, 'আইন ও আদালত-এর অষ্টম কলামে তার চোখ পড়ে। সে আগে ওটা পড়ে। বাঃ, শালারা বাছে ভাল। নিঃশেষে নিংড়ে বের করবে আজ সবটুকু, কিছুই ভেতরে রাখবে না।

মুরারই থানার মন্দিরবাজার গ্রামে এ-বার একটি বালিকা-ধর্ষণের জন্য ৭-বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২-বছরের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছে।... 'সে সুধারাণীকে (১৪) বলে, তার ছাগলটি ওই শালবনের মধ্যে চলে গেছে। সে

বালিকাটির সঙ্গে সেই জঙ্গলের মধ্যে যায়।...জানতে পেরে সুধারানীর বাবা শ্রীফকিরচন্দ্র সেনাপতি সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ডাক্তারের কাছ্ নিয়ে যায় ও পরীক্ষা করায়। তারপর থানায় ডায়েরি করে...'

ডাক্তার...থানা...পেট খারাপের ব্যাপার না, প্রেগন্যান্ট হবার প্রশ্ন ওঠে না—এ-সব সে আগেই বুঝেছিল। কিন্তু ডাক্তারি-পরীক্ষা? মাত্র একটি শব্দ তার ধ্রুব-পৃথিবীকে ঠাস করে চালু করে দিল। নীল-ফুল-তোলা সাদা টালির চকচকে বাথরুমে দুগ্ধফেননিভ কামোডে বসে তার ভারী পাছাটি টুপির মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে, সে টের পেল। পরমুহূর্তে মনে হল, শূন্যে নিক্ষিপ্ত, সে যেন এক বায়ুভেদী তির, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, কখন আর কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই।

কমোড থেকে উঠে পড়তে গিয়ে সে থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে ফের কমোডে বসে পড়ল। তার হাত থেকে কাগজ পড়ে গেছে, কাঁপা হাতে না-ছুঁয়েও সে টের পায়, মাথায় চুলের গোড়াগুলো ভিজে ইতিমধ্যেই জবজবে হয়ে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে একটি স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে জেনেও, কাঁপুনি সে থামাতে পারে না। কমোডে বসে, সে কাঁপতে থাকে।

সিঁড়িতে চটির শব্দ। বাজারের থলি হাতে সিন্ধু ওপরে উঠে আসছে।

বোসপাড়ায় অনুভার দাদা-বউদির বিয়ের আজ রৌপ্যজয়ন্তী। নিউ মার্কেট থেকে পঁচিশ-গোলাপের তোড়া নিয়ে সন্ধেবেলা সেখানে যাবার কথা। এ-দিকে লোডশেডিং। তবে অফিসের জেনারেটর আছে। এয়ার-কন্ডিশান্ড ঘরে সাতটা পর্যন্ত ধ্রুব বসে। একা? হ্যাঁ, একা। বাইরে বেয়ারা রাম-আধার।

৭টা নাগাদ ধ্রুব তলদেশ দেখতে পেল। খাঁড়া ঝুলছে, পড়বে, এবং এককোপে মুণ্ডু ছিটকে যাবে। আর-কিছু হবার নেই, ধড়ের দিকে মুণ্ডুর চেয়ে-থাকা, এ-ছাড়া। ৭টা নাগাদ সে বুঝতে পারল, কানা নয়, খোঁড়া নয়, প্রেমিক নয়; লম্পট নয়, জোচ্চোর, সাধু, ক্লামজি, সোবার, মনমরা, চালাক, স্টুপিড, লাজুক, লোভী, উদাসীন, স্মার্ট, এ-সব কিছুই নয়—[illegible]বণ্ড নয়, বাবা নয়, কমার্শিয়াল ম্যানেজার নয়—সে, সংক্ষেপে, ভীতু। ৭টা নাগাদ আধগজি গদির রিভলভিং চেয়ার বোঁ করে ঘুরিয়ে দেওয়ালের মুখোমুখি শূন্যে দু-হাত ছুঁড়ে সে নিজেই নিজেকে 'ডেস্ট্রয়েড' বলে ঘোষণা করতে শুনল।

এবং ৭টা নাগাদই সে সেই সাহস পেল যা পুরুষমানুষের নয়, মেয়েমানুষের নয়, এমনকী নপুংসকেরও না; যা ভীতুর। অফিস থেকে বেরিয়ে সে, ধ্রুবজ্যোতি মিত্র, একটি ট্যাক্সি নিল। 'সিধা চলিয়ে', ভারী গম্ভীর আর জমকালো গলায় সে বলছে শুনল, 'জলদি।' যেন সে নয়, বুলেটের কথা ভুলে গিয়ে, প্রান্তরের-পর-প্রান্তর ভরিয়ে ডোরাকাটা লাফে, আ-খাওয়া মড়ির দিকে ছুটে চলেছে স্বাধীকারপ্রমত্ত চিতা।

চারতলায় ল্যাচ-কী খুলে ধ্রুব ঘরে ঢুকল। 'সিন্ধু?' অন্ধকারে সে নিচু গলায় ডাকল। সাড়া নেই।

ডাইনিং স্পেসে আলো জ্বলছে। ক-দিন ধরেই অনুভা বলছিল শাড়ি পরাবে, আজ পরিয়েছে। একটা লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে, টেবিলের পাশে, বিনা মশারিতে, এই ভরা

সন্ধেবেলা সিন্ধু চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে। 'ও কীভাবে শুয়ে আছিস, ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার', অনুভাকে কতবার বলতে শুনেছে সে, 'ঠিক হয়ে শো।' তবু তার ভঙ্গিমা পাল্টায়নি। ঘুমিয়ে পড়লে, কিছু যদি মনে থাকে মেয়েটার। স্যুট-টাই না-খুলে সিন্ধুর পাশে বোটা-ছেঁড়া পাতার মতো ধ্রুব খসে পড়ে। তাকে জাগাতে, এত বিপদগ্রস্ত, তবু শাড়ি সরিয়ে স্তনে হাত না-রেখে সে পারে না।

'সিন্ধু', কানের কাছে মুখ এনে সে বলে, 'মান-ইজ্জৎ নয়। অনুভা নয়; মুন নয়, কেউ নয়, ওরে কিছু না।' সে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'সাতবছর পাথর ভাঙতে আমি পারব না।' এত বলে সিন্ধুর ঘুম না-ভাঙা পর্যন্ত সে পাশে পড়ে থাকবে বলে শুয়ে থাকে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠে স্যুট-টাই-পরা ধ্রুবকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখে সিন্ধু এক অবাক কাণ্ড করে! বালিকার গাম্ভীর্যে মুখ ঢলঢলে করে সে ইঙ্গিতে বলে, 'ও-ঘরে।'

অর্থাৎ আজ ও-ঘরে হবে। দিদিমণির বিছানায়।

হাত ধরে তুলে সে ধ্রুবকে তাদের প্রাক্তন দাম্পত্য-বিছানায় নিয়ে যায়। জয়পুরে-কেনা মহার্ঘ চাদরটি অনুভা তাকে দিয়ে আজই পাতিয়েছে। পাখার রেগুলেটার ডানদিকের চরমে ঠেলে দিয়ে লীলাভরে সে নীল আলো জ্বালায়। জয়পুরি কারুকাজের ওপর অবলীলায় শুয়ে পড়ে।

জামা-কাপড় খুলে পা-জামা পরতে-পরতে যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে ধ্রুব বলল, 'হ্যাঁ, কাল কী-যেন বলছিলি? মাকে সব বলেছিস নাকি...'

'মাকে? কী-সব?'

'ওই যে। ডাক্তারফাকতার।'

'আপনি আমাকে তা-ই ভাবলেন জামাইবাবু?' বহু-ভর্ৎসিত ভঙ্গিমায় চিৎ হয়ে শুয়ে সিন্ধু ঠোঁট ফোলায়, 'ছিঃ।'

'কাল যে বলছিলি, ডাক্তার...'

'ও, ওটা। ওটা একটা ঠাট্টা করলুম!' ফিক করে হেসে সে পা দোলায়, 'আমি শাড়ি পরেছি।' ধ্রুবর সাড়া নেই দেখে অভিমানে সে এ-বার হরিণীর কালো ঘনিয়ে আনে চোখে, 'মাক বলব, আমি কি এত খারাপ মেয়ে।' তার বুক ফুলে-ফুলে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে আবার বলে, 'ছিঃ।' বলে অনুভার বালিশে মুখ গোঁজে।

মেঘ-ডাকাডাকি হচ্ছিল সকাল থেকেই। ঝোড়ো হাওয়ায় জানালার একটা পাল্লা হুস করে খুলে গেল। চমকে উঠে সিন্ধু বন্ধ করতে যাচ্ছিল, ধ্রুব বাধা দিল। প্রয়োজন কী, আকাশ ছাড়া, ও-দিকে তো কিছু নেই!

বাইরে এ-গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষা নামল। যেন মাত্র একবছর পরে নয়। যেন কত খরার পরে—আবার। জানালার শার্সি আবার মেঘমেদুর হয়ে উঠছে, সেখানে আবার, ঘন-ঘন বিদ্যুৎ। বাইরের পাগল হাওয়া আর ঘরের ঝুলন্ত খৈতান ঘরের মধ্যে যে-পরস্পর-বিরোধিতা তৈরি করেছে, বোধহয় সেইজন্যে, পোড়ামাটির কারুকার্যময় শেড-দেওয়া নীল বাল্বটি এমন রীতি-গর্হিত দুলছে।

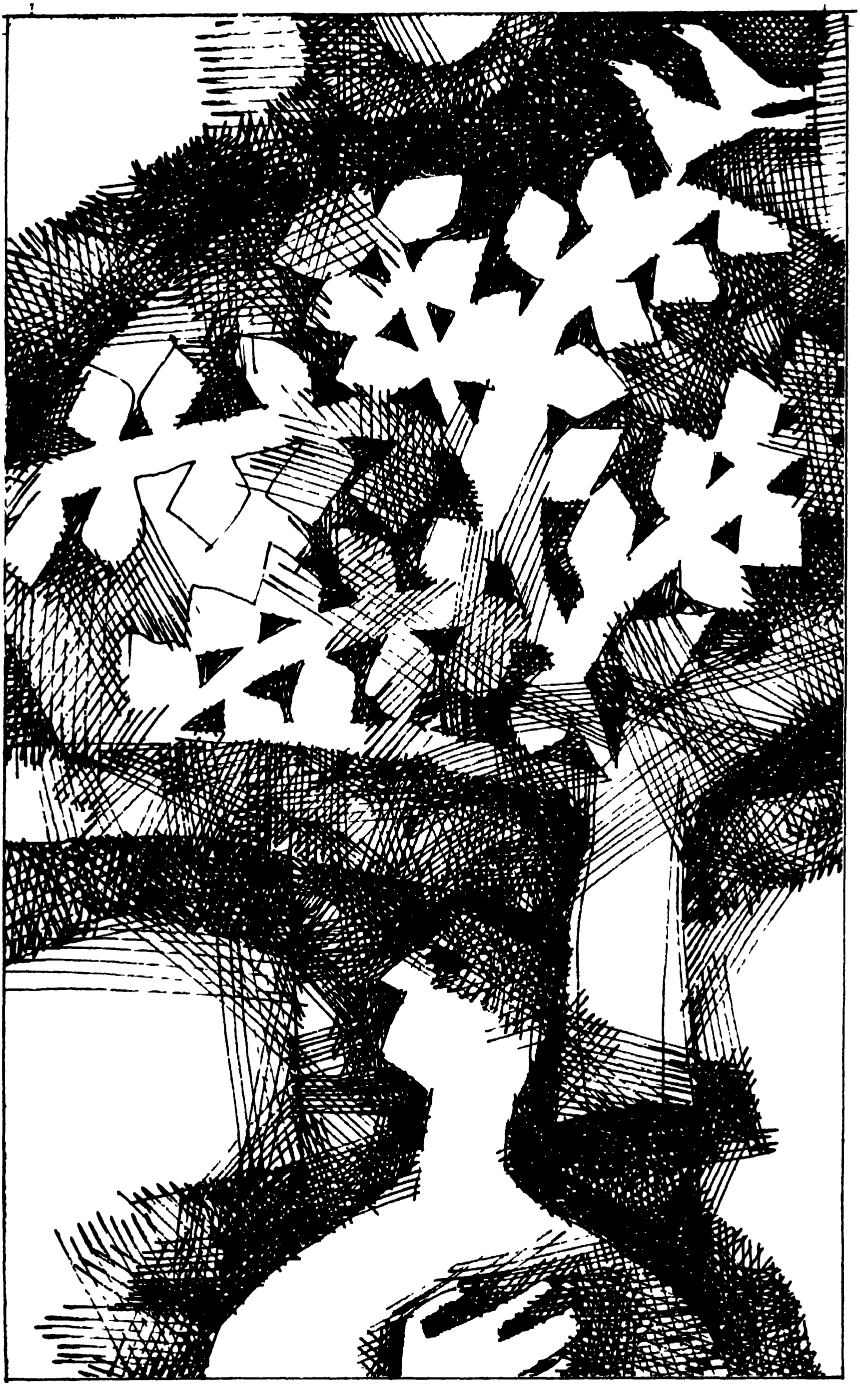
কট করে একটি শার্সি ফাটার শব্দে ধ্রুবর জীবন জুড়ে ঝন-ঝন করে সব কাচ ভেঙে পড়ল। ষোলো বছরের হাল্কা বালিকাকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বিয়াল্লিশ বছরের বালক। এবং আগে যা কখনও করেনি, মনেও হয়নি যে করা যায়, সে তার মুখ চুমায়-চুমায় ভরিয়ে দিতে লাগল।

অনুভার পাউডার-ব্লু ছ-ফিট গোদরেজের সামনে সে তাকে দাঁড় করায়। অনুভার ভ্যানিটি থেকে চাবি বের করে ব্যগ্র কাঁপা হাতে সে আলমারি হাট করে খুলে ফ্যালে। বাঁ-দিকে ওয়াড্রোবে ঝোলানো, তা অন্তত খান-পনেরো শাড়ি। পিছনের গোপন চেম্বার থেকে বের করে এনে সে অনুভার গয়নার বাক্স ভাঁজ-করা শাড়ির ডাঁই-এর ওপর রাখে। রেখে ডালা খুলে ফ্যালে। এখন, ঝলমলে রত্নগুহার সামনে, মর্জিনার সঙ্গে, গাধার পিঠে আলিবাবার মতো, সে যেন।

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, উন্মুক্ত আলমারির দিকে ইঙ্গিত করে ধ্রুব সিন্ধুকে বলে, 'বেছে নে।'

শাড়ি না-নিয়ে, দেখুন-দেখুন, জড়োয়া-সেট তর্জনীর ঠেলায় সরিয়ে, কত সপ্রতিভভাবে ইমিটেশান-হিরের রোল্ড-গোল্ডের নাকছাবিটি তুলে নিয়ে নাকের পাটায় পরছে মেয়েটা! লাল ভেলভেটের ডালা-সংলগ্ন আয়নায় ফুটে উঠেছে প্রতিবিম্ব। কী দুর্ধর্ষ মানিয়েছে ওর গর্বিত, সপ্রতিভ ককেটিশ মুখে?

আ, পছন্দ আছে মেয়েটার! ●





উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাতে বকুলগাছটায় অনেক ফুল এসেছে এ-বার। ফুলে-ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে, মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে-আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু-চারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে-উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাতের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফ্যালে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দ্যাখে। পাগল। তবু এখনও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রং, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে-যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু, তুষারের মনে হয়, এখনও অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু, তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচবছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে-থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এইসব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে-দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর-কিছু নেই। প্রথম-প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা আক্রোশ প্রতিশোধ—এইসব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে-আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনও ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে-বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ-গিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে-অদৃশ্য আবহমণ্ডল, তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা-ঘরে দ্যাখা দেয়।

কোনও পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনও তাকায়নি। এখন তাকায়! ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাসমতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে-খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট-শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাসমতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস, রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচবছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ, লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একইরকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল, স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওইসব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবা দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন, তখন দেখবে। সময়মতো স্নান-খাওয়া, সময়মতো সবকিছু। এইসব তখন চলবে না—

বলতে-বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান-করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনও কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা-চুল খুলতে-খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুলগাছের নিবিড় থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না কি? করে। তবু, অভ্যাস। পাঁচবছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচবছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ করছে ও। ভয় করলে কি চলে?

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক-হয়ে-থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধী মুখের কাছে উড়ে-উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট-জোড়া ছ-সাতবছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ও-ই একবার। তা-ও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে-ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাত-ঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম-চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্না ঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে, তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল, তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত, টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম..। তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে! যদি আক্রমণ করে! তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনও ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায়।

চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা-জানলা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে-আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল, ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ও তো কোনও ক্ষতি করছে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দু-বেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে-খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে-উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। একধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল-কুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত, আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজই কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়!

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে-দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গতবছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের। জুনিয়ার থেকে এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকণ্ডিশন-করা ঘরখানায়

সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দ্যাখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নাড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে-সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ-আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায়-আটকে-থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির-গোছা-হাতে দারোয়ান এ-ঘর ও-ঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোনও-কোনওদিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনও-কোনওদিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে। দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইটকাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট-মিক্সার, ক্রেন-হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চাছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং-টং করে ছুঁড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে-ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিকে আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনও শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙক্ষা জাগে : ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কীসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দ্যায়, কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন-তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে

উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্য এখনও পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একুট ভাবে, তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যে-দিকে তুষারের বাসা। সে-দিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁ-দিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব? কোথায়? তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে-ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এ-বার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর-মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কী-একটা মনে-পড়ি-পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাতবছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য-কেনা এক-প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরনো বাড়ির তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে তুষার ভাবে—এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক-ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাতবছর আগেকার সেই নিনি এখনও এখানে আছে কি না সন্দেহ। যদি না-থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে, ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে, তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে। চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরেজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডানদিকের

একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচবছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছ! বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কি না! তোমার স্বামী-পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ও-সব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন-কাগজে-ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া-করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখন সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিয়ো আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভিতরে তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে, নিনি বার-বার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো, এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হোয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বার-বার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকাময় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরের তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ, ইচ্ছা, আনন্দময় আবরণ-উন্মোচন; তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান-ধার দেখিয়ে বলে—গতবছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচবছরে অনেককিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাতে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল। পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। পুরনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। তখনও নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি, চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ ধরে হাঁটল সে। এখনও মাঝে-মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে-যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে, এখানে নয়, এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভুতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে-করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারি বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না। আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না-খেলে চলে না—

কাঁদতে-কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে

যাওনি? তোমার ঠোঁটে-গালে-শার্টে লিপিস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুলগাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে-মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়?

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে-খেতে জিগ্যেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব? মঙ্গলা রোজ রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে, ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুলগাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে-খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝ না, অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে-মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দ্যাখো না? তার বাঁ-গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে, দ্যাখো না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রং। চেয়ে দ্যাখো না, অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনও গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করবে।

—তোমার কোনও নিয়ম না-মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ, অরুণ? তোমার মুক্তি নেই?

ডাল-তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাতের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর-দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝকো আঁধার আর-একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি-পাথরের টুং-টুং শব্দ। অবিরল, অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো, কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দ্যাখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো না?

বৃথা।

অবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু, আর-কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে-বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভেতরটা ধক্-ধক্ করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দু-হাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকার, উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন-হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি-বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা-একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুম-ভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে-আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন-হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে : চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে-আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভিরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দ্যাখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেক দূরে হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনওদিন ওঠে না। হেঁটে-হেঁটে চলে যায় বহুদূর। কী-একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে-মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে, সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনও-বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ, তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেটের মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা : সোমা। অনেকক্ষণ ছবি-দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে-আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি।—এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্দুর তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলং-ও দেখা।

—অন্য কোথাও—অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে-মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। একমাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে-মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিক্‌টেশন দিতে-দিতে বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী-একটা ঘিরে আছে চারিদিকে। ওটা কী! ওটা কেন। কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়র সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে-দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও, ভাই। আরও জোরে....আরও জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন-হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক-একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে না আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দ্যায় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে। যাবে, অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে-চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু-বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দ্যান। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন?

—বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! চমকায়। জাল-বদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে-মাঝে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক-রাতে তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।

—চলো, অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনওদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে, কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার-ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দ্যাখো কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন-ঠিন শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দ্যাখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা! খালাসিদের যে-নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা-ফালা। খাকি প্যান্টের রং পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল! পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধী বকুলফুল ছেয়ে আছে ওর মাথায়, জটায়, ঘাড়ে।

কাঁপা-হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেতে লাগল।

মাঝে-মাঝে বিড়-বিড় করে তুষার বলছিল—খাও, অরুণ খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার! নিয়ে এল ঘরে।

—এই দ্যাখো, আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দ্যাখো ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দ্যাখো ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টেবিল। এই দ্যাখো, আরও কত-কী...

ঘুরে-ঘুরে অরুণকে সব দ্যাখায় তুষার।

মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে, এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, অরুণ? ইচ্ছে করে না এইসব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে?

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো, অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে?

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না, অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দ্যাখো।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে-আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুলগাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুল-কুল করে বয়ে চলে তার অন্য-লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দ্যাখে, নিশ্চিন্তে বকুলগাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দ্যাখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না, অরুণ? বকুলগাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে-থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনও সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থর-থর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এ-বার। বকুলগাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরনো কম্বল পাঠিয়ে দ্যায় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে-মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনও! কে জানে! মাঝে-মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনও দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর ওই-যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তা হলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

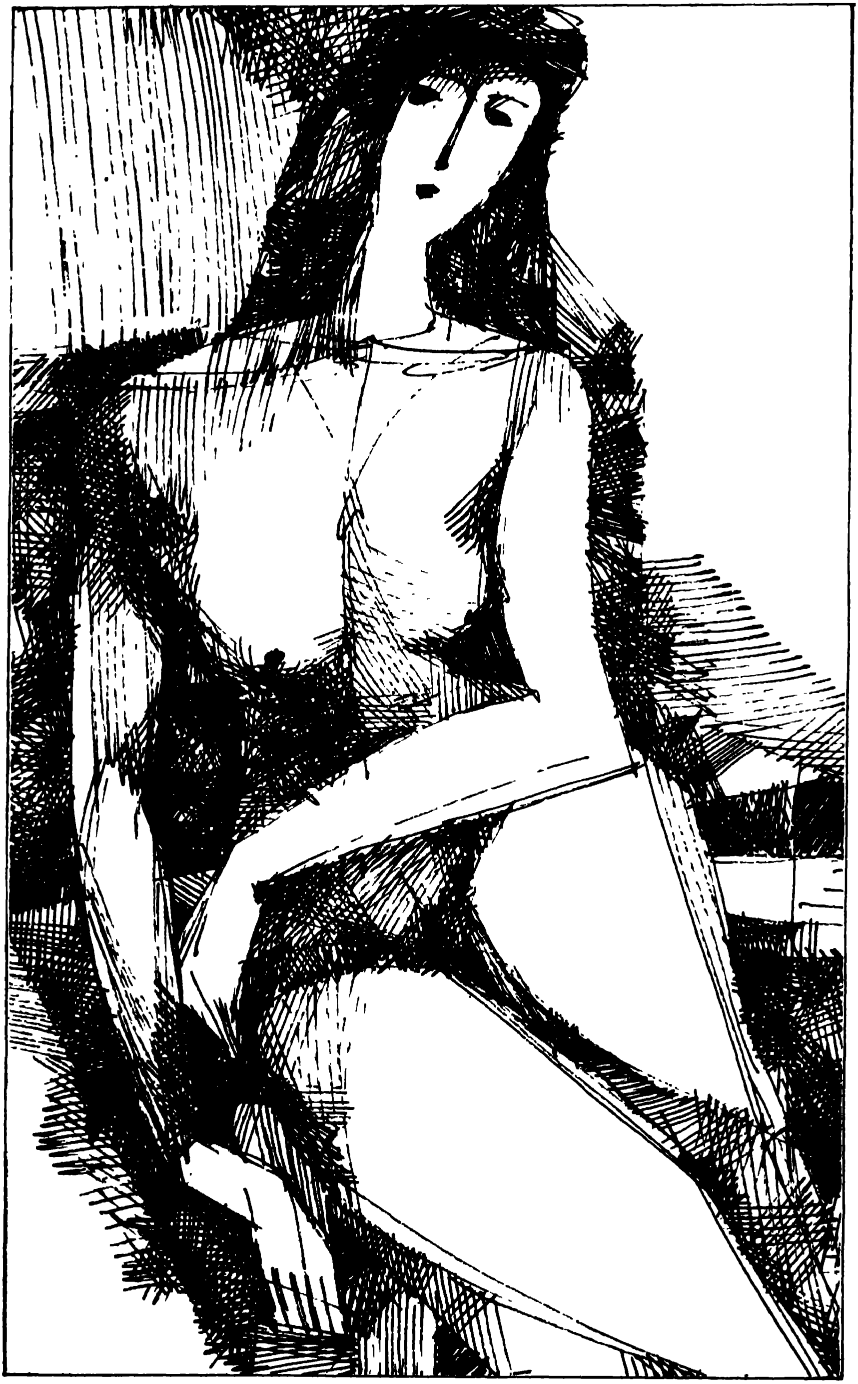
আবার বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সবসময় উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন-হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুলগাছটার গোড়ায় পাগলকে দ্যাখে। দু-জনে দু-জনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন-শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দ্যায় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দ্যায়, দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোখা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে। তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারিদিকে আধো-আলো, আধো-অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি, স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনও ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দ্যাখা দ্যায় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়। পাগল বসে থাকে। ●





পরী পয়রা

ডানদিকে শাল আর চল্লার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে উঠলে সোজা লোধাশুলি। আরও এগিয়ে গেলে শালবনী। ঝাড়গ্রাম।

মুঠিয়া জায়গাটা বাংলা আর ওড়িশার সীমান্তবর্তী। পয়রা পদবিটা শহরের লোকের বিশেষ পরিচিত নয়। এই পয়রাদের কাজ স্যাকরাদেরই মতো। গাঁয়ে-গঞ্জেও স্যাকরা থাকে।

মদন পয়রা পরীর বর। বয়সে বছর-বারোর ব্যবধান দু-জনের। মদন বাড়ি এসে গয়না বানিয়ে বালেশ্বরে বড় মহাজনের দোকানে অর্ডারি গয়না সাপ্লাই করে। কখনওসখনও নিজের পছন্দসই ডিজাইনের গয়না নিয়ে বাংরিপোসি আর ঝাড়ফুকুরিয়ার মধ্যে সপ্তাহে যে একদিনের হাট লাগে সেখানে গিয়ে বেচে আসে। তবে সে-হাটে বিকোয় রুপোর গয়নাই বেশি। সরু কোমরের, করৌঞ্জ আর নিমের তেল-মাখা তন্বী মেয়েরা আসে মাঝবয়সী কালো কবুতরের মতো। বুকের আর বগলতলির ঘামের গন্ধে ছেয়ে যায় হাট, মুরগি আর মুরগির ডিমের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিশে।

শেষবেলা অবধি কেনা-বেচা করে জঙ্গলের পথ ধরে অনেকখানি এসে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মুঠিয়া গ্রামে ফেরে মদন রাতের বেলা। কখনও চাঁদ থাকে। কখনও থাকে না। গ্রামের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাঁড়িয়া-খাওয়া সুখে অতখানি পথ যেন উড়েই আসে মদন। শরীর তখন পাখির শরীর হয়ে যায়। রাতপাখির মতো। বসন্তের বনের হাওয়া শালের পাতায় ফুরফুর করে। তার শরীরেও। যেন পালকে ভরে গেছে বলে মনে হয় শরীর।

মদনকে মুঠিয়া গ্রামের অনেকেই হিংসে করে। বিঘে-পাঁচেক ডাঙা জমি। পঁচিশ বিঘা ধান-জমি। তদুপরি এই সোনা-রুপার ব্যবসা। কিন্তু এইসবও কিছু নয়। হিংসে করে পরীর জন্যে। ডানা-কাটা পরীরই মতো রূপ ছিল পরীর। এখন তিরিশে এসে সে-রূপে বান ডেকেছে।

সোনা-রুপোয় মুড়ে রাখে পরীকে মদন, তবু পরীর মন পায় না। ছেলে-মেয়ে নেই ওদের। তার জন্যেও দুঃখ নেই মদনের। যদি বুঝতে পারত, একটিবারেরও জন্যে, পরী কী চায় তার কাছ থেকে? কীসে তার সুখ? তবে বর্তে যেত সে।

ও যা-কিছু চায়, সবই পরী দ্যায় তাকে। যা খেতে ইচ্ছে হয়, রেঁধে দ্যায়। যখন আদর করতে ইচ্ছে করে, আদর করতে দ্যায়। যেমন করে চায় ও, তেমন করেই দ্যায়। অনেক পুরুষ-বন্ধুদের কাছে মদন শোনে তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে নানা অনুযোগের কথা। গণেশ কোকশাস্ত্রর বই এনে দিয়েছিল একটা কলকাতা থেকে। কামশাস্ত্রর ছবিওয়ালা বই-ও। সব

ছবিকেই ও তার শোবার ঘরের বিছানায় ফ্রেমে বাঁধিয়েছে একবার বা একাধিকবার। পরীর কিছুতেই আপত্তি নেই।

কিন্তু সব দিয়েও পরী যেন কিছুই দ্যায় না মদনকে। কী-যে সে তার নিজের কাছে রাখে, তা বুঝতে পারে না মদন তার সব বুদ্ধি দু-হাতে জড়ো করেও। বুঝতে পারে না বলেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরের চড়াইয়ের মতো ছটফট করে।

পরী কথা বলে না আদর খাওয়ার সময়। বিলিতি পুতুলের মতো মদনের কথামতো কাজ করে যায়। তখন পরীর মুখে এক আশ্চর্য হাসি লেগে থাকে। প্রদীপের পলতে নয় সে-হাসি। ভালবাসার হাওয়া লেগে তা বাড়ে-কমে না। ইলেকটিরির বাল্বের মতো স্থির সমান উজ্জ্বলতায় জ্বলতে থাকে তা। মাঝে-মাঝেই মদনের মনে হয় যে, তার কোনও মানুষীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি; বিয়ে হয়েছে কোনও সত্যি পরীরই সঙ্গে। যে-পরীরা গা-ছমছম জ্যোৎস্না-রাতে শালের বনে কি সুবর্ণরেখার সোনার মতো বালুভূমিতে খেলে বেড়ায়। মেয়েমানুষটার বুক-চিবুক দু-হাতের মধ্যে নিয়ে, তার নিঃশ্বাসের মিষ্টি গন্ধে নিজের বিড়ি-ফোঁকা দুর্গন্ধি মুখ সুগন্ধি করে তুলেও মেয়েমানুষটার মনের কাছে কোনওদিনও আসতে পারেনি গত পনেরো বছরে।

পরী রাতের পর রাত তাকে বনের পরীর মতো কুহকের রাজ্যে নিয়ে যায়। সর্বস্বান্ত হয়ে মদন পয়রা হাহাকার করে। যাকে অন্য যে-কেউই সুখের চরম বলে জানত, তা পেয়েও মদন বুঝতে পারে, সুখের বাড়ি অনেক দূরে।

পরীর কোনও দোষ নেই। শরীরে কোনও রাগ নেই। সৌন্দর্যে কোনও খুঁত নেই। তার গায়ের চামড়া জলপিপির গাঁয়ের মতো উজ্জ্বল। অথচ কুসুমফুলের মতো নরম লাল। পরীকে সুবর্ণরেখা নদীর বালির মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে খুঁড়ে-খুঁড়ে দেখেও তার মনের সোনার এক-কণাও তার নখে তুলতে পারেনি মদন।

দোষ বলতে একটাই। প্রতিবছর বসন্তর রাতে, দোলের চাঁদের পনেরো দিন আগে থেকে পরীকে যেন পরীতে পায়। চাঁদ যত বড় হতে থাকে, পরীর পাগলামি ততই বাড়ে।

রাতের বেলা সে দরজা খুলে বেরিয়ে গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে সুবর্ণরেখার দিকে চলে যায়, যেখানে অসমসাহসী পুরুষও একা-একা যেতে সাহস পায় না গভীর রাতে। মজা এই-ই যে, ঠিক সেইসব দিনেই মদনকে ঘুমে পায়। পরী শেষরাতে যখন নদী থেকে ফিরে আসে, তখন ওর ঘুম ভাঙে। আর, যখন যায়, তখন গভীর ঘুমে মড়ার মতো পড়ে থাকে। ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে মদন এই পনেরো দিন রাত নামলেই একাধিকবার আদর করে পরীকে। তৃপ্ত নারীর ঘুম সাপের কামড়ও টের পায় না, এ-কথা কে-না জানে। তবু পরী তারপরও ঠিক বেরিয়ে যায়, মদন যা-কিছু চায় সব দিয়ে তারপরও পরীর অনেকই উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত সে কোথায় কার জন্যে যে বয়ে নিয়ে যায়, নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে, সে এক গভীর রহস্য।

পরী গত পনেরো বছরে দিনে গড়ে পনেরোটি কথাও বলেনি। পাঁচ-প্রশ্নর উত্তর একটি হ্যাঁ অথবা একটি না-তে সারে। মুখে সেই ইলেকটিরির বাল্বের হাসি লেগে থাকে সবসময়েই। বাড়া-কমা নেই কোনও।

পরীর বাড়ি যে-গ্রামে, সেই গ্রাম নদীর ওপারে। সেই গ্রামে এক মাতাল গেঁজেল

জুয়াখেলায়-সর্বস্ব-খোয়ানো পুরুষের বাস। সে মদনেরই বয়সী হবে। নাম তার খেয়ালি। খেয়ালির সবকিছুই গেছে। গ্রামের কোণে এক পড়ো-পড়ো কুঁড়েতে তার বাস। মাধুকরী করে খায় সে। সবই দোষ। গুণের মধ্যে, সে গান গায়। সে-গানও কাউকে শোনাবার জন্যে নয়। কেউ শুনতেও চায় না। বনে-বনে, দিনে-রাতে, সেই একা-পাগল গান গেয়ে-গেয়ে ফেরে।

কানাঘুষোয় শুনেছিল মদন যে ছেলেবেলায় পরীর সঙ্গে তার ভাব ছিল খুব, পরীর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন। মদন এ-ও শুনেছিল যে, পরীর বিয়ের পর থেকেই খেয়ালি মানুষটা অমন হয়ে যায়। দাবা খেলে, যুধিষ্ঠিরের মতো সব খোয়ায় একে-একে। মন দিয়ে খেললে ওকে হারাতে পারে এমন লোক কমই ছিল দশটা গাঁয়ে। কিন্তু মানুষটা হারবে বলেই পণ করে যেন খেলতে বসত। তারপর নেশা শুরু করে।

খেয়ালির সঙ্গেও পরীর বিয়ে হতে পারত। কিন্তু জাতে তারা ছিল মুচি। মরা পশুর চামড়া শুকিয়ে তা দিয়ে জুতো বানাত। যে-ঢোল মন্দিরে বাজে, সেই ঢোলের চামড়া আসত তাদেরই ঘর থেকে, যে-খোলে ঠাকুর দেবতার নাম-কীর্তন হয়, সেই খোলের চামড়াও আসত তাদের বাড়ি থেকেই ; তবু অন্যের চোখে তারা জাতে নিচু।

পরীরা ছিল স্বর্ণকার। দেবীর গয়না বানাত তার বাপ। তার মেয়ের সঙ্গে খেয়ালির বিয়ে হলে সমাজে ঠাঁই দিত না কেউই তাদের। তাই পরীর বিয়ে দিয়েছিল বাপ খগেন পাল্টি-ঘরে মদনের সঙ্গে।

বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই পরী। বাপকে অমান্য করেনি। কিন্তু বিয়ের পর একদিনের জন্যেও আর বাপের বাড়ি যায়নি। পা দ্যায়নি বাপের গাঁয়ে। অনেক ঝুলোঝুলি সাধাসাধিতেও না। শুধুই হেসেছে। ইলেকটিরি-হাসি।

মায়ের মৃত্যুতেও তাকে কেউই নিয়ে যেতে পারেনি! নিজ-গাঁয়ে মরা-মায়ের মুখ দেখতে। সুবর্ণরেখার জলের পাশে সে তর্পণ আর কাজ সেরেছে। নদীর এ-পাশে।

বড় অদ্ভুত চরিত্রের মেয়েছেলে বটে!

সকলেই বলে এ-কথা।

মদন কিন্তু বড় ভালবাসে তার পরীকে। শুধু ছটফট করে মরে সব সময়ে, যা পরী তাকে দ্যায়নি, তা পাবার জন্যে। প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল মাটির ঘরে শালকাঠের তক্তপোশের ওপর শিমুলতুলোর তোষকের ওপরে বিছানো খড়্গপুর-থেকে-কিনে-আনা ফুলকাটা নরম বিছানায় চাদরের ওপর পরীর পাশে শুয়ে পরীকে বার-বার বলে, তুমি আমার হও, পরি তুমি আমার! তোমাকে পুরোপুরি দাও আমাকে, একটুও বাকি না-রেখে।

পরী মুখে সেই ইলেকটিরি-হাসি হেসে, খাট থেকে নেমে, সায়া আর লালপেড়ে শাড়ি খুলে আলনায় রাখে। তারপরে তার হাঁটু সমান চুলের অর্ধেক সামনে এনে জঘন ঢাকে। অন্যপাশ থাকে পেছনে। নিতম্ব ছেয়ে। পরীর হাসি বলে, এই তো আমি! নাও আমাকে! নাও! না-বলে বলে, এর চেয়েও বড় পাওয়া বলে অপর কিছু কি জানে পুরুষেরা?

নেয় মদন! খাট থেকে নেমে তাকে কোলে করে তুলে এনে শোওয়ায় খাটে। আঁতিপাতি

করে পরীর শরীরের সব রহস্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু পরীর শরীরের আড়ালে যা থাকে, কিছু কি থাকে, যা মদন পেতে চায়, তা একদিনের জন্যেও পায় না।

পরী হেসে বলে, এই তো আমি!

এই-তুমিই কি সবটুকু তুমি?

আর কী বাকি আছে আমার? মেয়েদের শরীরই তো সবটুকু। আর কী!

আর কিছু নেই?

আর কী?

তুমি আমার নও।

তবে আমি কার? এতভাবে এতবার দিয়েও কি দেওয়া হল না?

না, না। তুমি কী-যেন লুকিয়ে রাখো। কী-যেন দাও না আমাকে পরি!

আর-কিছু নেই। একজন মেয়ের যা-কিছু আছে, থাকতে পারে, সবই তো পেয়েছ। আর কী চাও?

তা আমি জানি না। শুধু জানি যে, তুমি, তোমার মধ্যে যে-আর-একজন আছে, তাকে লুকিয়ে রাখো সব সময়। তাকে দাও না কখনও আমাকে।

একদিন পরী মদনকে বলেছিল, তুমি অহল্যার গল্প জানো তো? আমরা মেয়েরা, এ-দেশের সব মেয়েরা, অহল্যারই মতো পাথর হয়ে গেছি। তোমাদেরই চোখের অভিশাপে! শরীরের পাথরেই আমাদের বাস। তোমাদের বীর্য ধারণ করি জরায়ুতে। গর্ভে রাখি তোমাদের সন্তান। আবার তা ফিরিয়ে দিই। তোমাদেরই ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদের অসম্পূর্ণ দান সম্পূর্ণ করি আমরা। রেঁধে খাওয়াই। রোগে সেবা করি। তোমরা মরে গেলে মাথার চুল কেটে ফেলি। নিরামিষ খাই। জীবনের এক-আকাশ আলোকে নিভিয়ে দিয়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। এই-ই তো তোমরা চেয়েছিলে চিরদিন। এই চেয়েছিলে বলেই এর চেয়ে বেশি-কিছু চেয়ে আমাদের বিব্রত কোরো না, কষ্ট দিয়ো না।

এত কথা মদন কিংবা পরী পয়রা দু-জনের কেউই স্পষ্ট করে বলে না। এমন ভাষাও তাদের নেই। তবে চোখ বলে। চোখ যা বলে, তা কি মুখ কোনওদিনও বলতে পেরেছে?

আজ চতুর্দশী। পলাশ-শিমুল-কুসুমের ফুল আর পাতা সেদ্ধ করে ঘরে-ঘরে ছেলেমেয়েরা রং বানিয়েছে। কাল সকালে দোল খেলবে বলে। শটি আর রং মিশিয়ে আবির বানানো হয়েছে ঘরে-ঘরে। হরিসভায় দোলোৎসব হবে রাতে। ঘরে-ঘরে মিষ্টি বানানো হয়েছে। রং-দিতে-আসা ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবে বলে। গাঁয়ের পাড়াতুতো দেওর আর বউদিদের চোখে ঘুম নেই, কাল সকালে দোলের অছিলায় স্পর্শসুখের শিহরিত আনন্দের স্বপ্নে।

পরীর পাগলামি আজ তুঙ্গে। মদন তার বেয়াল্লিশ বছরের যৌবনের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে প্রথম রাত থেকে বহুভাবে আদর করেছে পরীকে। আজ পরীকে সে আদরের স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবেই। পরীকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে এখন নিজেই মরা মানুষের মতো ঘুমিয়ে আছে মদন। পুরুষের ভূমিকা ফুরিয়ে যাবার, দাতার; নারীর পূর্ণ হবার, গ্রহীতার।

রাত এখন অনেক। নদীপারে শেয়াল ডাকছে। শাল, মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধে মাতাল-হয়ে-যাওয়া ঝড় তুলেছে চাঁদের বনে-বনে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের পলতে কাঁপছে ঘরে-ঢোকা দামাল হাওয়ায়।

নগ্না পরী বিছানা ছেড়ে নামল। তার এলোকেশী নগ্না শরীরের ছায়া প্রদীপের দেওয়ালে নড়ে উঠল। শুধুমাত্র শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে পড়ল পরী। একটা খরিশ-কেউটে হিস-হিস করে চলে গেল প্রায় পায়ের ওপর দিয়েই। কামড়াল না। ভাল হত কামড়ালে। এই স্থির-হয়ে-থাকা ইলেকটিরি-হাসির জীবনে পচা-পানায়-ভরা, সমান-সুখের একঘেয়ে জীবনে, তবু কিছু হঠাৎ-জ্বালার সুখ অথবা বিষ চারিয়ে যেত।

পরী ভাবছিল, সুখ মানেই তো বিষ। এই সমাজে। বিষের মতোই পরিত্যজ্য সব সুখ, যা চামচে-মাপা, স্বামী-দত্ত নয়; সব সুখ। এই সমাজ-সংসারের কৃপণ হাতের কুনকে-ঢালা সুখ। ভারি ইচ্ছে করে, একদিন সাপের কামড় খেয়ে দেখতে। এই খবিশ কেউটেও তো এই পয়রা গ্রামেরই সাপ। ভুল লোককে ভুল করে সাপও কামড়ায় না কি এখানে। ছিঃ! ছিঃ।

কুকুর ডেকে উঠল। শুঁড়িদের বাড়ির একটা মদ্দা আর মাদি ওর পিছু নিল কিছুটা। তারপর আর সাহস পেল না। গ্রামের কুকুরগুলোও সাপটারই মতো। নতুন জায়গায় যেতে, নতুন-কিছু করতে ভয় পায়।

পরী চলল আঁচল লুটিয়ে, সুবর্ণরেখার দিকে। শালবনের গভীরে আসতেই এ-বার তার মনে হতে লাগল যে, সে সত্যিই পরী। সত্যি-সত্যিই পরী হয়ে যাচ্ছে পরী পয়রা! আঁচলের জায়গায় তার ফিনফিনে কুসুমের পাতার মতো পাতলা আর কুসুম-লাল ডানা গজিয়ে গেছে মস্ত দুটি। উড়ে চলল পরী। তার স্বামীর আদরে-আদরে পুরনো-হয়ে-যাওয়া শরীর, তার সকাল-থেকে-সন্ধের নিয়মবদ্ধ জীবন, সব পিছনে ফেলে এসে সে যেন সদ্য-ঋতুমতী কোনও পঞ্চদশী হয়ে গেল। অচুম্বিতা, অনাঘ্রাতা, প্রত্যাশাতে ভরপুর। উড়ে এল একেবারে সুবর্ণরেখার মধ্যে। যেখানে বড়-বড় কালো-কালো পাথর আছে সোনালি বালির মধ্যে। চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় বালি এখন রুপোলি। শাড়ি খুলে ফেলে সেই পাথরের স্তূপের ওপর পায়ের ওপর পা রেখে বসল পরী।

হু-হু হাওয়া আসছে তাদের গ্রাম থেকে। খেয়ালি কী করছে কে জানে? এতবছর এই দোলের আগের চাঁদের রাতে পরী এখানে এসে বসে শুধু সেই মানুষটা আসবে বলে। আহা! কী তার গলা! গাত্রের কী ভাব! পরীর জন্যেই এমন করে নষ্ট হয়ে গেল মানুষটা, সর্বস্বান্ত। দু-বেলা দু-মুঠো ভাতও জোটে না খেয়ালির। অথচ পরীর কিছুই করবার নেই। ও পেট পুরে খায়। ভাল শাড়ি পরে, কোমরের পৈঁছা থেকে গলার সীতাহার, পায়ের পায়জোর, নাকের নথ, সবই পরে। যেন, সোনা দিয়েই পেট ভরে একজন মানুষীর! হয়তো ভরে! যাদের ভরে! কারও-কারও। পরী তাদের মতো নয়। তার মনের মানুষটার জন্যে যদি একটু-কিছুও করতে পারত! মানুষটা যদি একবারও এসে সামনে দাঁড়ায় পরী পয়রা তার স্বামীর দেওয়া শাড়িটা পর্যন্ত এই বালিতে ছেড়ে রেখে তার হাত ধরে নিরাবরণ হয়ে চলে যাবে, সে যেখানে নিয়ে যাবে। সেই নরকে।

অনেক বছর আগে, এক দোলের রাতে, গোয়ালঘরের পাশে দাঁড়িয়ে, গরুর গায়ের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, চোনার গন্ধ আর জাবনার গন্ধের সঙ্গে মিলে-যাওয়া দোল-পূর্ণিমার রাতের সব গন্ধর মধ্যে, খেয়ালি চোদ্দো বছরের পরীকে চুমু খেয়েছিল তাদের গ্রামে। বঞ্চিত চুমু। চুরির চুমু। ব্যথার চুমু। প্রেমের চুমু। সেই রাতেই পরী জেনেছিল, প্রথম ও শেষবারের মতো, যে, পরীর মধ্যে এক অন্য পরী আছে।

সে আর এল না। কোনওদিনও আসেনি। কই আর এল? আসবে না, জানে। যারা পরীদের ডানা গজাতে জানে, যাদের ঠোঁটে কুসুম ফুলের মসৃণতা, যাদের গলায় পাগল-কোকিলের গান, সেইসব পুরুষ নারীর জীবনে ক্ষণিকের জন্যেই আসে। এসেই, পরক্ষণেই, হারিয়ে যায়। দূর থেকে পুলক ভরে ডাক পাঠায় বাসন্তী হাওয়ায়। চেয়ে থাকে, সন্ধেতারার চাউনি হয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে, চৈত্রের দুপুরে শালের বনে। কিন্তু তারা জীবনে আর আসে না।

পরী পয়রারই মতো সব নারীরই জীবন, সব নারীরই শরীর, মদন পয়রাদেরই জন্যে। অভ্যেসের-খোঁটায়-বাঁধা গরুর মতো সুখের জাবনাতে জাব খায় তারা। খরিশ-কেউটের কামড় তাদের জন্যে নয়।

পরী জানে।

তবু পরী পয়রা এ-ও জানে যে, অভ্যেসের বাঁধন এখনও তাকে পুরোপুরি বাঁধতে পারেনি। পরীর ভেতরের পরীর ডানা-দুটি এখন বছরের এই কটি দিনে জল-ফড়িংয়ের ডানারই মতো ফরফর করে ওঠে। বাঁধন ছেড়ে উড়ে যেতে চায় সব নারীর মধ্যেই যে-দ্বিতীয় নারী থাকে, সে গ্রীষ্মবনের খয়েরি তিতিরের মতো ছটফট করে উঠে বলতে চায়, এ নয় গো! এ নয়! জীবনের মানে এ নয়! বাঁচার মানে এ নয়!

পরী জানে যে, এ-দেশের সব পরীরই মুক্তির আরও অনেক অনেকই দেরি আছে। খেয়ালিরাও তো পুরুষই! নারীকে মুক্ত করতে পারে, পরীর মধ্যের পরীকে ডানা মেলে উড়তে দিতে পারে, একমাত্র পুরুষের মতো পুরুষরাই। মদন পয়রাও নয়, খেয়ালি মুচিও নয়।

প্রথমজন, প্রেমের কিছু বোঝে না।

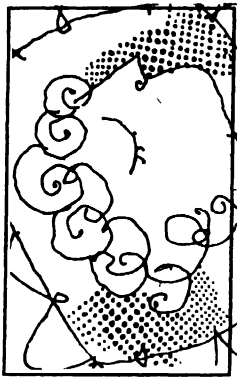
দ্বিতীয়জন, প্রেমে যে সাহসের দরকার, তা রাখে না।

যে-দেশের পুরুষেরা এমন, সে-দেশের পরীরা সন্ধেতারার দিকে চেয়ে-চেয়েই চিরদিন দিন গুনবে।

ডান পা-টাকে এ-বার বাঁ-পায়ের ওপরে করল পরী। নিজের অনাবৃত ঊরুর উপরে অন্য ঊরুর পরশে শিহর লাগল। আরও-একটু বসে থাকবে। মদন পয়রার স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এমন একা-একা নিজের এক ঊরুতে অন্য ঊরুর উষ্ণতায় ধন্য হয়ে বাঁচাও ঢের ভাল ছিল। এ-জন্মে হল না!

কাল সকালে গ্রামের যে-ছোট-ছোট মেয়েরা পুলকভরে দোল খেলবে চিকন চিৎকারে, ওরা যেন সত্যিকারের পরীর জীবন পায়! পরী পয়রার জীবন নয়। সত্যিকারের স্বাধীন, উড়াল পরীর জীবন।

পরী ভাবে যে, ও বেঁচে উঠবে ওদের মধ্যে। অন্য জন্মে, অন্য জীবনে! ●



বাপের চা

তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা।

রোজ সকালে রান্নাঘরের দিক থেকে এই কথাটি ছোট্ট পাখির ডানার ঝাপটার মতো উড়ে আসে। রমেন নিজের ঘরে কুটকুটে কম্বলের আসনে বসে শোনে। দিনের প্রথম কাকের মতো বউয়ের হাঁক-ডাক।

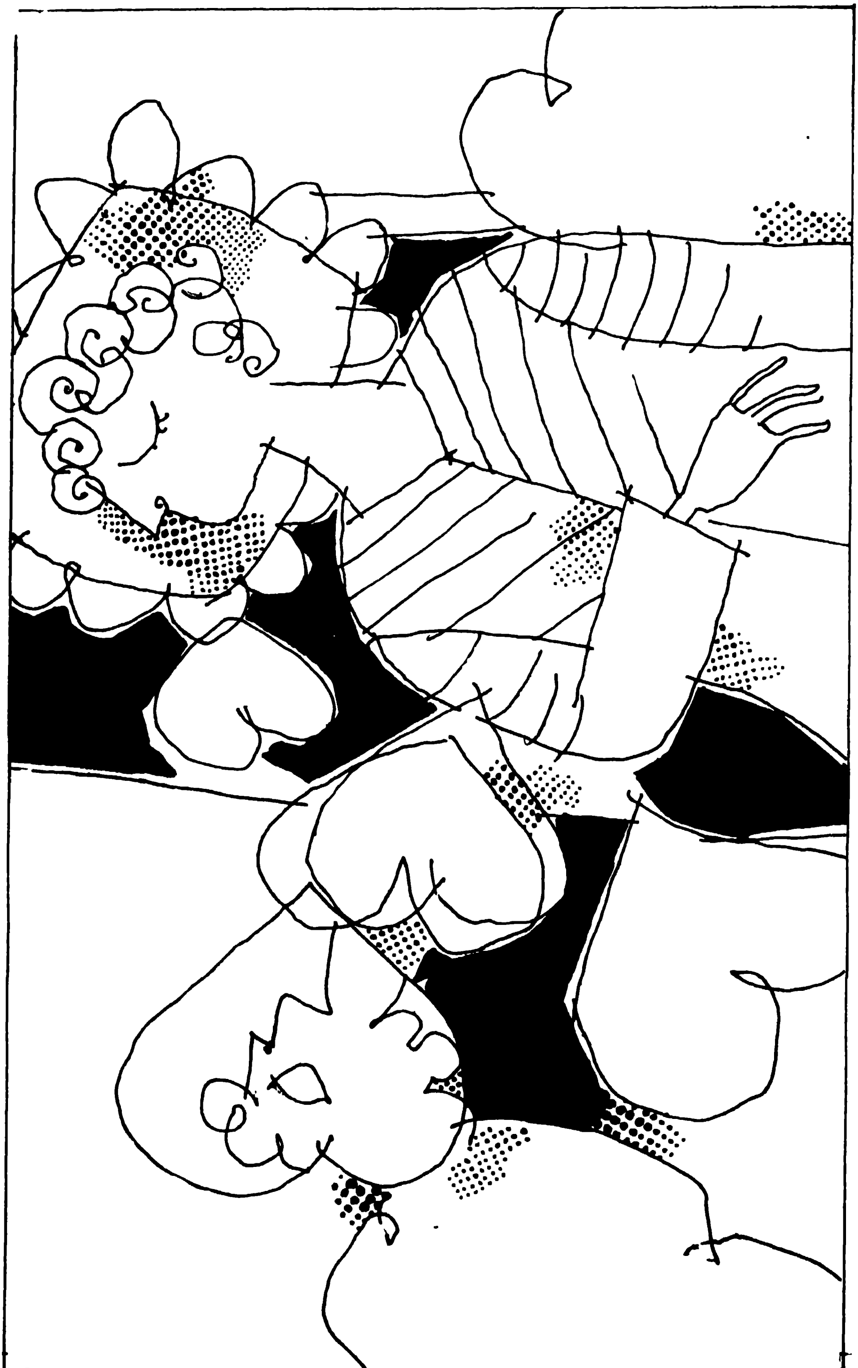
স্ত্রী নীপা মোটামুটি শিক্ষিতা, তবু কেন যে বাপ বলে! বাপ শব্দটার মধ্যে এমন-একটা তাচ্ছিল্য আছে, শুনলেই গা রি-রি করে। বহুবার বলেছে, সোজা করে বলেছে বাঁকিয়ে বলেছে, কোনও কাজ হয়নি। নীপার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা সরকারের মতো, বিদ্যুৎ অথবা দুগ্ধ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মতো, কি পুলিশ বিভাগের মতো, চলছে চলবে। রমেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর কী হবে ভ্যাজার-ভ্যাজার করে! জীবন তো প্রায় মেরে এনেছে। আর কটা বছর? পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ষাটে চাকরি থেকে বসে যাবে। বাষট্টিতে অথর্ব। তেষট্টিতে ফৌত। মিটে গেল ঝামেলা। সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছে। ফার্স্ট থিং ইন দি মরনিং, হাত-মুখ ধুয়ে চোখ বুজে ১০৮-বার। জপ করতে-করতে কিছু কানে না-আসাই উচিত। তবু এসে যায়। এই তো সবে হাতেখড়ি হয়েছে। জপ-সিদ্ধ হতে সময় লাগবে। তাই কানে আসে—তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা। শোনে, আর চমক ওঠে। ভাবে, আহা! সংসারে এই তার খাতির! মাসে প্রায় তিন-হাজারের মতো ঢালে। ঢেলে-ঢেলে দেউলে হয়ে যাবার যাবার দাখিল। নিজের একজোড়া জুতো কিনতে হলে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গাদি খেলার অবস্থা। ঢুকব কি ঢুকব না। দু-পা যায়,তো তিন-পা পিছিয়ে আসে। নেশা করে কেনাকাটা করতে পারলেই ভাল হয়। যা-হবার ঘোরে হয়ে যাক। একটা মারিজুয়ানার ট্যাবলেট খেয়ে দোকানে ঢোকো। জামা কেনো, জুতো কেনো, ছাতা কেনো। যা-সব দাম হয়েছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অথচ ও-পক্ষের মুখ থেকে কথা খসা-মাত্র শাড়ি, স্লিপার, শ্যাম্পু, সেন্ট, সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট, মায় সপ্তাহে একটি করে লটারির টিকিট এসে যাচ্ছে। এত তেল ঢেলেও সংসারে স্নেহের বড় অভাব।

নীপাকে রমেন একদিন বুঝিয়ে বলেছিল, দ্যাখো, আমি হলাম তোমার সেই রাজহংস, যে ডেলি একটা করে সোনার ডিম পাড়ে। আমাকে একটু স্নেহ-যত্ন করলে, তোমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হবে না গো!

নীপা উত্তর দিয়েছিল, তুমি আমার একটি অশ্ব। সারা জীবন অশ্ব-ডিম্বই পেড়ে গেলে।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা-ই। মাথা গোঁজার একটি আস্তানা আজও হল না। আজও উত্তর-ভারত,



হিমালয় ঘোরা হল না। হিরের একটা আংটির শখ ছিল, হল না।...যাকে বিয়ে করব ভেবেছিলুম, তার বউয়ের ভাগ্য শুনবে? আমেরিকায় গিয়ে বসে আছে। বছরে একবার প্লেনে চেপে দেশে আসে। সেই ছেলে এখন বিশ হাজার টাকা মাইনে পায়।

আমেরিকা, বিশ হাজার! রমেন হাঁ হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

হাঁ-টা বুজিয়ে ফ্যালো। বলে নীপা উঠে গিয়েছিল বিছানা থেকে।

আর-একদিন রমেন বলেছিল, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলে না, নীপা। নীপা সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিল, দাঁত আজকাল বাঁধানো যায়, সে-দাঁতে কড়মড় করে মাংসের হাড়ও চিবনো যায়।

রমেন অবাক হয়ে ভেবেছিল, সে মরলে এই মহিলা শ্রাদ্ধের বদলে কী করবে? মনে হয়, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে।

রমেন জপ করে আর ভাবে। ভাবতে-ভাবতে অতীতের ঘটনায় চলে যায়। সেই সময় নীপার যে-কথায় যে-উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাথায় আসেনি, এখন সেইসব মানানসই চোখা উত্তর খুঁজে বের করে। যতক্ষণ জপ-ধ্যান, ততক্ষণই নীপার সঙ্গে মনে-মনে ধুম ঝগড়া। শেষে বিরক্ত হয়ে আসন পাট করে উঠে পড়ে। ইষ্ট-দেবী আর গুরুদেবের ছবির সামনে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভেউ-ভেউ করে বলে, প্রভু, কিছুই হল না, কিছুই হল না আমার। কামিনী-কাঞ্চনে একেবারে লেবড়ে আছি, গুরু!

গুরু বলেছিলেন, রমেন্দ্রনাথ, এইবার ধীরে-ধীরে মনটাকে সংসার থেকে তুলে নাও। ঢুকে পড়েছ, বেশ করেছ, বেরুবার কৌশলটাও এ-বার শিখতে হবে। সংসার বের করে দেবার আগে নিজে বেরিয়ে এসো সসম্মানে। সবসময় ভাববে, ওরা আমার কে! গালাগাল দিয়েই ভাববে, ও শালারা, আমার কেউ নয়। মনে-মনে গাইবে :

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়।
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ॥
দু-চার দিনের জন্য ভবে।
কর্তা বলে সবাই মানে ॥
সেই কর্তারে দেবে ফেলে।
কালাকালের কর্তা এসে ॥
যার জন্যে মরো ভেবে।
সে কি তোমার সঙ্গে যাবে ॥
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া।
অমঙ্গল হবে বলে ॥

রমেন কিছুক্ষণ হায় প্রভু, হায় প্রভু করে চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখে বাপের চা কেউ নিয়ে আসেনি। রান্নাঘরের সামনে, কেলে মিটসেফের মাথার ওপর স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে খোলা পড়ে আছে।

প্রত্যাশাই মানুষের দুঃখের কারণ। নীপা চা বয়ে আনবে না, জানা কথা, কিন্তু মেয়ে রুমার

আনতে কী হয়! প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায়? রান্নাঘরের দিকে আজকাল আর যেতে ইচ্ছে করে না। ওদের মুখ দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। অকৃতজ্ঞ স্বার্থপরের দল। নীপা মুখে জর্দাপান পুরে জদ্দন বাঈয়ের মতো চাকা-পানা মুখ নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। যেন ভিমরুলের চাক। খোঁচালেই ঝাঁক-ঝাঁক কথার ভিমরুল উড়ে আসবে। আর, রুমা মনে হয় বিশ্বসুন্দরী হবার সাধনা করছে। সারা মুখে দুধের সর মেখে আয়নার সামনে এলোচুলে দাঁড়িয়ে। রমেনের কাছে সিক্রেট খবর আছে, রুমার দামড়া-দামড়া অনেক ছেলে-বন্ধু জুটেছে। তাই সবসময় কেমন একটা উড়ু-উড়ু রোমান্টিক ভাব। আর ছেলে! তিনি তো পরিহিতব্রতে ব্যস্ত। নাইবার, খাবার, লেখাপড়া করার অবসর নেই। তেনারও আবার এক প্রেমিকা জুটে গেছে। শহরের সেই এলাকার রাস্তা-জরিপের পুণ্য কর্তব্যে তিনি ব্রতী। গোঁফ আর চুলের চেকনাই নিয়ে ভীষণ বিব্রত। বম্বের মডেলের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। প্রেম-সেবা করতে গিয়ে পিতা-মাতার সেবার তিলার্ধ সময় নেই।

স্টিলের গেলাসটা তুলে নিতে-নিতে রমেন মেয়েকে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে, এইটা আর এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না, মা?

মেয়ে সুর করে বললে, তুমি তো আহ্নিক করছ বাবা?

এখনও করছি?

আহা, করছিলে তো!

অন্য সময় নীপার সঙ্গে রুমার লেগেই থাকে। নীপা হয়তো বললে, কী রে পটের বিবি হয়ে বসে আছিস, আটাটা মেখে দিয়ে একটু উপকার করতে কী হয়!

নীপার মুখের ওপর রুমার উত্তর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, যাও তো, তোমার কেবল বসে-বসে হুকুম। আমি পারছি না, পারব না। নিজে মেখে নাও।

পারবি না?

না, না, না।

আচ্ছা, নিজের দরকারের সময় তুই আসিস আমার কাছে!

তখন একেবারে অন্য সুর।

সংসারের কাজ নিয়ে, শাড়ি পরা নিয়ে, বিছানা করা নিয়ে, কলেজ থেকে সোজা বাড়ি না-ফেরা নিয়ে দু-জনে অনবরতই চুলোচুলি হচ্ছে। কিন্তু বাঙালি দল পাকাতে ওস্তাদ। যেই রমেন কিছু বলবে, অমনি নীপা রুমার দলে।

নীপা বললে, তোমার ভণ্ডামি কোনদিন কতক্ষণ চলবে ও জানবে কী করে! তখন তো আবার কেউ ঘরে ঢুকলেও, পরে-পরে, খ্যাঁক-খ্যাঁক করবে।

রমেন বললে ভণ্ডামি! ধ্যান, জপ ভণ্ডামি!

কার ধ্যান, কীসের ধ্যান সে তো আমি জানি।

এরপর আর কথা বাড়ানো চলে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন পেট আলগা হয়, সেইরকম মুখও আলগা হয়। নীপার মুখের এখন আর কোনও রাখঢাক নেই। মেয়ের সামনে নরক গুলজার না-হওয়াই ভাল।

রমেনের একটা দুর্বলতা নীপা জানে। আর শেষমেশ সেইটা চেপে ধরেই নীপা জিতে যায়। মানুষের সব দুর্বলতাই গোটাকতক 'ম'-এর মধ্যে ঢুকে আছে। হয় এই 'ম', না-হয় ওই 'ম'।

এক পাড়ায় এ-বাড়ি, ও-বাড়ি একটা মেলামেশা গড়ে ওঠেই। কারুর সঙ্গে খুব হলায়-গলায়, কারুর সঙ্গে দেঁতো হাসি, আর প্রশ্নোত্তর, কী কেমন আছেন? ভাল আছি।

সাতাশ নম্বর বাড়ির হাসিদির সঙ্গে প্রথম হলায়-গলায় হয়েছিল নীপার। আসা-যাওয়া। তরকারি-চালাচালি। একসঙ্গে সিনেমা-দ্যাখা। শাড়ি-পাল্টাপাল্টি। রমেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কী কেমন আছেন-এর। একটু হাসি। প্রতি-হাসি। রমেন মাঝে-মধ্যেই বউ ভাল মুডে থাকলে, দু-একটা মন্তব্য করত, আহা এই বয়সেও হাসিদির চুল দেখেছ? হাসিদির রং দেখেছ? হাসিদির ঠমক দেখেছ? শাড়ি পরার ধরন দেখেছ?

মুড ভাল থাকলে নীপা বলত, যাও না, কাজলটাজল পরিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে দি। রাতটা কাটিয়ে এসো। ভদ্রমহিলামার স্বামী সপ্তাহে একবার বাড়ি আসেন। একটিমাত্র ছেলে হস্টেলে থেকে পড়ে।

আর-এক মুডে থাকলে তেড়ে উঠত, বউকে সেবা করতে জানলে ওইরকম ঠমক-ঠামকই থাকে। বউ আর বিলিতি কুকুর এক-জাতের জিনিস। তোয়াজে রাখতে হয়, বুঝলে? তোয়াজে!

যার বরাতে যা ঘটে। রমেন একদিন গাড়ি করে বাড়ি ফিরছে। পথে হাসির সঙ্গে দেখা। বউবাজারের মোড়ে, বাস-স্টপে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। রমেনের ভেতরটা ছলকে উঠল। থার্মোমিটারের পারার মতো ঝট-ঝট করে বয়েস নেমে গেল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললে, উঠে আসুন। উঠে আসুন।

একগাল হেসে, গালে টোল ফেলে, শরীর দুলিয়ে, একপাশের বুকের আঁচল খসিয়ে, গাড়ি কাঁপিয়ে হাসি রমেনের পাশে ধপাস করে বসল। ঘুরে দরজা বন্ধ করার সময় রমেনের গায়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল। ল্যাত করে খোঁপার ধাক্কা লেগে গেল নাকে।

সারাটা পথ হাসির হাসি আর নানা গল্পে রমেন একেবারে মশগুল। হাসির আবার থেকে-থেকে 'মাইরি' বলার অভ্যাস। তেমন মজার কথা হলে, 'যান' বলে দু-হাত দিয়ে ঠেলাও মারে। মাত্র আধঘণ্টার পথ, তার মধ্যেই নিবিড় আলাপ। কাঁধে কাঁধ লেগে গেল। হাতে হাত ঠেকল। মনের কথা, প্রাণের কথা। সিনেমা-থিয়েটারের শখের কথা। ভাল লাগার কথা। সব কথাই হল। একবারও নীপার প্রসঙ্গ হল না। দু-জনের কারুরই মনে রইল না, আলাপের সুত্রপাত নীপাকে দিয়েই। রমেনের কেবলই মনে হতে লাগল, তার বিয়েটিয়ে হয়নি।

হাসি বেশ চালাক মেয়ে। মাতাল কিন্তু তালে ভুল হয় না। বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় বললে, আমাকে এইখানেই নামিয়ে দিন।

রমেন হাঁ হাঁ করে উঠল, কেন, কেন?

হাসি মুচকি হেসে বললে, কারণ আছে, মশাই। আমাদের দু-জনকেই সংসার করে খেতে হবে।

সেই কেস গড়াতে-গড়াতে প্রায় ফ্র্যাকচার-কেস হবার দাখিল। দুপুরে হাসি একদিন রমেনের অফিসে গিয়ে হাজির। অফিস থেকে কেটে সিনেমায়। সিনেমার পর রেস্তোরাঁ। পরে একদিন গঙ্গার ধারে। তারপর একদিন ট্যাক্সি-ভ্রমণ। রমেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে আর খরচ করে।

আর রাতে শুয়ে-শুয়ে নানা উদ্ভট পরিকল্পনা। হাসিকে নিয়ে দূর কোনও দেশে পালিয়ে গেলে কেমন হয়! ইলোপমেন্ট। এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। কোনও রোমান্স নেই। অ্যাডভেঞ্চার নেই। বউ যেন টেরিলিনের প্যান্ট। ছেঁড়ে না, ফাটে না, ফুটো হয় না। মাঝে-মাঝে সেলাই খুলে যায়। শেষের দিকে রংটা একটু চটে যায়। না-ফেলে দিলে, সারা জীবনই শরীরে লেপ্টে থাকবে।

সারা বিশ্বে স্ত্রীদের গুপ্তচর ছড়ানো থাকে। রমেন একদিন ধরা পড়ে গেল। পাড়াতুতো ঠাকুরপো এসে খবর দিয়ে গেল নীপাকে। দাদাকে দেখেছে কলকাতার ভূতঘাটে বসে হেসে-হেসে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। কোলের কাছে হাসিবউদি।

রাতে রমেনের খুব ঝাড়ফুঁক হল। নীপা তাড়াতাড়ি খাইয়ে স্বামীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দোরে খিল দিলে। রমেন ভাবলে, আহা, অনেকদিন পর আজ বুঝি প্রেম ওতলাল। এমন চাদিনী রাত! পিউ কাঁহা পাখি ফুকরোচ্ছে আকাশে।

আলো নিভল। তারপর ঝাড় কাকে বলে! বুড়ো দামড়া, প্রেম হচ্ছে, প্রেম! তুমি আমার পাঁঠা। ধড়ে কাটলে ধড়ে, ন্যাজে কাটলে ন্যাজে। ইয়ারকি পেয়েছ? নীপা ভয় দেখালে—আত্মহত্যা করে পুলিশকে স্রেফ দুটি লাইন লিখে যাব। তখন বুঝবে, কত ধানে কত চাল। এই বউ মারার যুগে সোজা চালান হয়ে যাবে হাজতে। চোদ্দো বছর ঘোরাও ঘানি।

পরের দিন হাসিকেও ঝেড়ে এল নীপা।

হয়ে গেল পরকীয়া। প্রেমের সমাধি তীরে রমেন বসে রইল মনমরা হয়ে।

স্ত্রী হল মোচা, পরস্ত্রী হল রেজালা। মনের দুঃখে রমেন শেষে দীক্ষা নিয়ে নিল। সংসার থেকে রমেনের মন উঠে গেছে। সে এখন হারিয়ে যেতে চায়। হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে দেখতে চায়, নীপা অ্যান্ড হার পার্টি কোন সুরে সানাই বাজায়! রোজ টিভি-তে দ্যাখে কত ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি কেমন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে! কোথায় যায়, কীভাবে যায়! টেকনিকটা কী? কাকে জিগ্যেস করে? লালবাজারের মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডে লোক নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে যায়, সে কি একবার গিয়ে জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ মশাই, বলতে পারেন, কীভাবে হারিয়ে যেতে হয়?

সন্ধেবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে রোজই ভাবে, আজ চলার মুখটা ঘুরিয়ে দেবে।

পারে না কিছুতেই। ভয় হয়, এই অচেনা পৃথিবী। কোথায় যাবে। কে দেখবে। তবু নীপা তাকে চেনে। সে নীপাকে চেনে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, নীপাকে সে ভালই বাসে। লঙ্কা না-পড়লে তরকারির রং খোলে না, স্বাদ আসে না। রোজ সকালে, বিশ বছরের পরিচিত গলায়, ওরে তোর বাপের চা-টা নিয়ে যা—না-শুনলে মনেই হয় না, বেঁচে আছে, আর-একটা দিন শুরু হয়েছে। ●



কুচি-কুচি কাগজ

বিকেল তিনটের কিছু পরে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল দ্বিজেন।

'একটা খবর শুনলাম। খবরটা কি সত্যি?'

নীলা এইরকমই আশঙ্কা করেছিল। যতই চেপে রাখুক, খবরটা দ্বিজেনের কানে যাবে। এই অফিসে কোনও কথা পড়তে পায় না। তার ওপর, একজনের বিয়ে, সে চলে যাচ্ছে লম্বা ছুটি নিয়ে—এইরকম একটা খবর! তবু, দ্বিজেন যে সরাসরি এসে প্রশ্ন করবে, জানতে চাইবে, এতটা ভাবেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় নীলা এমনই বিমূঢ় বোধ করল যে মাথা তুলতে পারল না। দ্বিজেনের প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে আদৌ কিছু বলা যায় কি না, এই দ্বিধা আরও সঙ্কুচিত করে ফেলল তাকে।

দ্বিধার পর্ব অবশ্য অনেকদিন ধরেই চলছিল। আজও, অনেকক্ষণ ধরেই। সেই সকালে ফুটপাথ ছেড়ে লিফ্‌টে পা দেবার পর থেকেই। তার পরেও সময় গেছে অনেকটা।

ছুটির দরখাস্তটা সেকশন-ইনচার্জ বিমলবাবুর টেবিলে রাখতে উনি চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ছুটির দরকার বলেছিলেন। তা বলে তিন মাস। বিয়ের ব্যাপার নাকি?'

প্রশ্নের ধরনে ভদ্রতা। তবু নীলা বুঝতেই পারল, আসলে গুজবটা বিমলবাবুও শুনেছেন, ওঁর চোখের দৃষ্টিতেও 'জানি' ভাব স্পষ্ট।

নীলা শুধু হাসল। ভাঙল না কিছু।

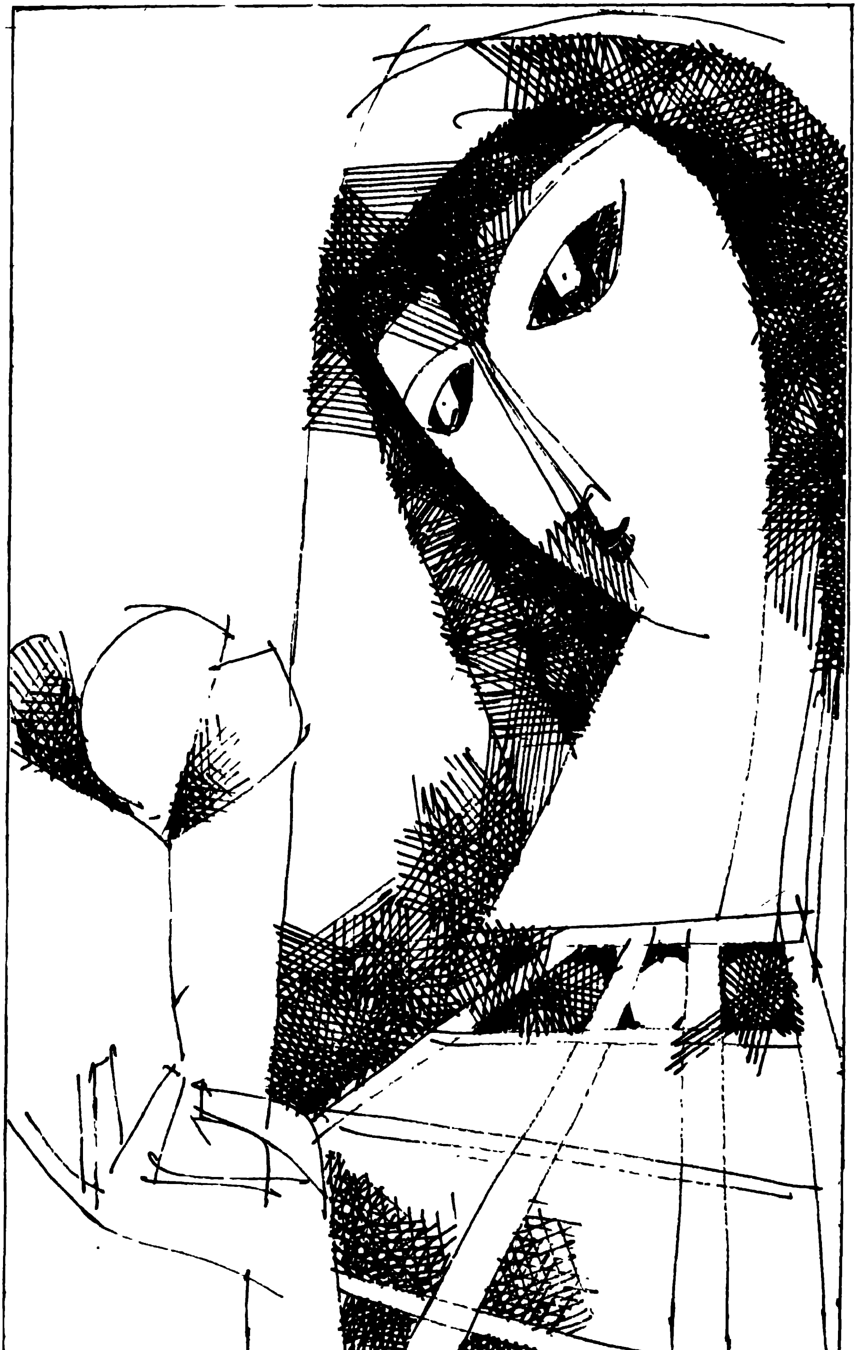
'পাত্রটি কে?'

বেয়াড়া প্রশ্ন। নীলা স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করল। বিমলবাবু জানেন না, নিজের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে নীলার মনের ক্ষতটাকেই উসকে দিচ্ছেন তিনি। এই মুহূর্তে ওঁকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিছু-একটা জবাব দেবার চেষ্টায় নীলার হঠাৎই মনে পড়ল তার মামাতো ভাই অশোক কাজ করে ছিন্দাওয়ারায়, এক ছুটিতে ক-দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে। পরের কথাগুলোও ভেবে ফেলল চটপট। অস্বস্তি আড়াল করে বলল, 'ছিন্দাওয়ারায় থাকে। মধ্যপ্রদেশে। সরকারি অফিসার।'

'তাই নাকি!' ঈষৎ চিন্তি দেখাল বিমলবাবুকে। সময় নিয়ে বললেন, 'আমি যেন অন্যরকম শুনেছিলাম। যাই হোক, খুব ভাল। কন্‌গ্র্যাচুলেশন।'

আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু, ওই বলাটুকুই বা কম কী। ভুরুর সমান্য ওঠা-নামাতেই ভিত দুলে উঠল। তাকে আর দ্বিজনেকে নিয়ে রটনা তা হলে অনেক দূরই পৌঁছেছিল,



দু-জনের বিয়েটিয়ে হবে, এমনও শুনেছিলেন হয়তো। সাবধানী কথাবার্তার মধ্যে ওই সরল খোঁচাটুকু সহজেই ধরতে পারল নীলা।

তখন থেকেই বিষণ্ণ। পেণ্ডুলামের মতো একটা অপরাধবোধ সারাক্ষণ দুলতে থাকল বুকে। তখন থেকেই প্রার্থনা, হে ভগবান, আমার প্রবঞ্চনা ক্ষমা করো—দ্বিজেন যেন না-জানে।

দ্বিজেন বসে চারতলায়। আগে এই ফ্লোরেই বসত, তিন টেবিলের দূরত্বে ব্যবধান ছিল না কোনও। সেকশন বদলের পর থেকে ওপরেই বসছে। নিজের কাজ করতে-করতে সুসময়ে অনেকদিন চোখ তুলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাকিয়ে থাকত নীলা। আজও, ওর বসবার জায়গাটা আন্দাজ করে, মনে-মনে সারাক্ষণ সিঁড়ির পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল নীলা। তা হলেও দুর্ভাবনা গেল না। ভালবাসা বড় আদরের, যে পায় কিংবা দেয় সেই শুধু বুঝতে পারে। দ্বিজেনকেও কম দ্যায়নি সে। তবু ইদানীং দ্বিজেনের গড়িমসি ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, উত্তাপ চলে গেছে, পুরনো ভালবাসায় ওর আর মন নেই তেমন। নিজের মা, ভাই, বোন, সংসারের দায়, দায়িত্ব, অসম্ভব ভারের কথা তুলে এড়িয়ে যাচ্ছে বিয়ের ব্যাপারটা। এ-ভাবে কত আর অপেক্ষা করতে পারে মানুষ! বিশেষত সে, দেখতে-দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছে তিরিশ। মা চাপ দিচ্ছে, দাদাও। গোপনে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কাগজে। মোটামুটি সুন্দরী সে, শিক্ষিতা, নিতান্তই সাধারণ হলেও চাকরিও একটা করে। আশপাশে সুপাত্রেরও অভাব নেই।

দ্বিজেনকে নিয়ে দ্বিধাটা নিজের মনেও এসেছিল। যে চলেই যাবে, তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখায় নিঃশ্বাসের ভার ছাড়া আর কিছুই বাড়ে না। অসম্ভবের জের টানতে-টানতে বড় ছোট লাগত নিজেকে। ভালবাসার একটা লক্ষ্য থাকে, সেটা কি বিয়েই নয়? মনঃস্থির করার জন্যে, সুতরাং দূরত্ব সৃষ্টির কথাই ভেবেছিল নীলা। কষ্ট হবে, তবু। এ-সব দ্বিজেনকে বলা যেত না। আর কাউকেও না। 'বিয়ে করছি' বললে দূরত্বের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয় না।

দ্বিজেনকে কিছু জানতে দেবে না, ও কিছু টের পাবার আগেই চলে যাওয়া যাবে—এই ধরনের ভাবনা থেকেই ছুটির দরখাস্তটা দিতে দেরি করেছিল দু-দিন। এই দু-দিন ওর ছোঁয়াচ বাঁচানোর জন্যে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঘুরেছে প্রায়। অফিস ছুটির পরেই যত সমস্যা। পরশু বিকেল চারটেয় তাই মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিল নীলা—পিওনকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে অসুবিধে হয়নি কোনও। পরশুর জের টেনেছে কাল। বাকি আজকের দিনটা।

সন্দেহ ও আশঙ্কার মধ্যে টিফিন পর্যন্ত কেটে যেতে ভেবেছিল, বাঁচলুম, ফাঁড়া কেটে গেল; সে যে আজই ছুটিতে যাচ্ছে এই খবরটা হয়তো দ্বিজেন পর্যন্ত পৌঁছয়নি এখনও। আজ না-হোক কাল সে জানবেই, ততক্ষণে বিপদসীমানা থেকে নীলা অনেক দূরে। ভাবতে-ভাবতেই দীর্ঘশ্বাস তোলপাড় করেছিল বুকে।

সেই দ্বিজেনই অবশেষে সামনে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার গলায় জিগ্যেস করল, 'খবরটা কি সত্যি?'

আশেপাশে পুরো অফিস। এই মুহূর্তে অসংখ্য চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি ও চাপা কৌতুক অনুমান করতে অসুবিধে হল না নীলার, এমনও মনে হল এই মুহূর্তটির জন্যেই আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল কেউ-কেউ। মাথা নিচু করে বসে থাকতে-থাকতেই ঘন থেকে ঝাপসা হয়ে এল চোখ, এলোপাথাড়ি শব্দ ভাঙতে শুরু করল বুকে, নিঃশ্বাস দ্রুত—যেন ভয়-পাওয়া শরীর নিয়ে দৌড়ে এসেছে অনেকটা রাস্তা। দ্বিজেন যে এমন পাগলের মতো ছুটে এসে জেরা করবে, ভাবেনি। জানলে আগেই একটা ভূমিকা করে বলা যেত; আমাকে ক্ষমা করে দাও। মা আজ আছে, কাল থাকবে না। দাদাকে বিশ্বাস নেই, তারও সংসার আছে। তারপর? বয়স বাড়ছে, এরপর দামও কমবে। আমার জীবনে সিকিউরিটির বড় অভাব। এ-ছাড়া আর উপায় ছিল না।

দ্বিজেন তবু মরিয়া। গলার রুক্ষ এবং স্পষ্ট স্বর শুনে অবশ্য মনে হয় উত্তরটা ও জেনেই এসেছে, এখন পাঁচজনের সামনে নীলাকে অপমান করা ছাড়া আর-কোনও উদ্দেশ্য নেই।

'কী! চুপ করে রইলে যে?' ঘুঁসি মারবার ধরনে একটা হাত টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল দ্বিজেন। একটু ঝুঁকে দাঁড়াল সামনে।

ইতিমধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল নীলা। একই সময়ে দুঃখ ও রাগ উত্তেজিত করে তুলল তাকে। চাপা গলায় বলল, 'এটা অফিস। কিছু জানার থাকলে বাড়িতে এসো।'

'ভাল! নাটক তো ভালই শিখেছ!' নিষ্ঠুর মুখে হাসল দ্বিজেন, 'ঠিক আছে। বাড়িতেই আসব তা হলে।'

যেমন এসেছিল তেমনি হঠাৎই আবার চলে গেল দ্বিজেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলতে পারল না নীলা, দ্বিজেনের কথা শ্লেষটুকু বিঁধে থাকল কানে। অনেকক্ষণ একইভাবে দু-আঙুলে কপাল টিপে ধরে বসে থাকল সে। আস্তে-আস্তে সমস্ত উত্তেজনা নেমে যেতে দিল শরীর ও মন থেকে। এবং ভাবল, সন্দেহটাই সত্যি হচ্ছে তা হলে! এই নিষ্ঠুর অভদ্র যুবকটিই তার প্রেমিক!

কয়েক মুহূর্তের ঘটনার মধ্যে দিয়েই দ্বিজেন যেন নিজের ভেতরের চেহারাটা স্পষ্ট করে দিয়েছে নীলার কাছে। যত বড় প্রবঞ্চনাই সে করে থাকুক, দ্বিজেনের বোঝা উচিত ছিল নীলা মেয়ে, এক-অফিস মেয়ে-পুরুষের সামনে তার সঙ্গে এই ধরনের অশালীন ব্যবহার করা অনুচিত। এই লোকটিই কিনা রেস্তোরাঁর নির্জনে মুঠোর মধ্যে তার হাত নিয়ে বলেছিল, 'যতই চাপ থাক সংসারের, এ-বার আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে না।'

কতদিন আগেকার কথা? দু-বছর? তিনবছর!

দ্বিজেনে সম্পর্কে যত ভাবছিল ততই যেন একটা দুরূহ ভার নেমে যাচ্ছিল বুক থেকে। ভাবতে অবাক লাগছিল নীলার, এই লোকটি সম্পর্কে কী সাঙঘাতিক দুর্বলতাই না ছিল তার মনে, ক-দিন আগে পর্যন্তও একে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে কল্পন করতে পারত না। এমনকী, খানিক আগে পর্যন্তও, দ্বিজেনকে ঠকাচ্ছে ভেবে সে কি নিজেকে অপরাধী মনে করেনি!

যা হয়েছে হয়েছে, নীলা ভাবল, আপাতত বোধহয় বেঁচে গেল। এই ঘটনাটা না-ঘটলে দ্বিজনেকে চেনা যেত না ঠিকঠাক। ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তার ভাবনাই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। জোর করে বিয়ে হলে এই লোকটিই হয়তো কোনওদিন তার জীবনটাকে বিষময় করে তুলত।

নিজের দূরে থাকার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অস্পষ্ট এক-ধরনের সুখও অনুভব করতে শুরু করেছিল নীলা। তাকে অপমান করার ফল দ্বিজেনকেও তিলে-তিলে ভোগ করতে হবে। এখন অনেকদিন আসবে না সে, হয়তো কোনওদিনই আসবে না। কিন্তু এই অফিসে দ্বিজেনকে আসতে হবে প্রতিদিন। আর প্রতিদিনই প্রতিটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়বে নীলা ছিল, নীলা তাকে প্রবঞ্চিত করে গেছে।

বেলা পড়ে আসছিল। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীলা দেখল চারটে বেজে গেছে। ছুটি হবে সাড়ে-পাঁচটায়। বলা যায় না, প্রতিশোধ নেবার জন্যে দ্বিজেন অন্য-কোনও ফন্দিও আঁটতে পারে। নিতান্তই অফিস এটা, এমনও হতে পারে ইচ্ছে থাকলেও বাড়াবাড়ি করতে পারেনি দ্বিজেন। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যদি ধরা পড়ে যায়, কী করবে বলা যায় না।

দুঃখে, হতাশায় ভারাক্রান্ত লাগছিল নিজেকে। আরও বেশি অপদস্থ হবার ভয়ে তৎপর হল নীলা। সিট থেকে উঠে কাগজপত্র গুছিয়ে নিল, টয়লেট গিয়ে জল দিল চোখে-মুখে।

কাছাকাছি টেবিলে রত্নাদি বসে। একটু আগে দ্বিজেন যখন কথা বলছিল, তখন হাঁ করে লক্ষ করছিল দু-জনকে। সমস্তই শুনেছে। তারপরেও কথা বলেনি একটিও।

কী মনে হওয়ায় আপাতত রত্নারই সামনে দিয়ে দাঁড়াল নীলা।

'রত্নাদি, আজ চলে যাচ্ছি—'

'যাচ্ছ!' একই ধরনের মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রত্না। কিছু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, আগেভাগে চলে যাওয়াই ভাল। সাবধানে যেয়ো। আমিই খুঁজে নেব পরে—'

নীলার কিছু বলবার ছিল না। আর কারও সঙ্গে চোখাচোখি এড়িয়ে দাঁত ঠোঁট চেপে ধরে দ্রুত পায়ে এগোল লিফ্‌ট-এর দিকে।

লিফ্‌টটা নেমে আসছিল ওপর থেকে। এই ফ্লোরে থামা-মাত্র কিছুটা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল নীলা। মানসিক ক্লান্তি তবু তাকে ছাড়ল না।

একটু-বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লিফ্‌টম্যান চেনা, নামতে-নামতেই লোকটি একটি খাম বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'দিদিমণি, আপনার চিঠি।'

অল্প ইতস্তত করল নীলা। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে অবাক হয়েই সাদা খামের মুখটা ছিঁড়ল। চার-ভাঁজ-করা কাগজটি খুলতেই প্রবল শীত ছড়িয়ে গেল ওর শরীরে। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েও স্থাণুবৎ, বাইরে দাঁড়িয়ে আদ্যোপান্ত পড়ল সে—

"আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা কোরো। যা করেছি তা নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই, না-হলে

সকলের কাছে ছোট হয়ে যেতাম। এটা ঠিক, তোমার বিয়ের খবরে আমি খুশি হইনি—হবার যে কথাও নয়, তা তুমিও বুঝবে। অন্তত এটুকু আমার অভিনয় নয়।

"তবে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। মাথার ওপর বিরাট সংসারের বোঝা নিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারব, এ-আশা আমার ক্রমশই চলে যাচ্ছিল। সত্যিই তো, তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করবে! তোমার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হয়েছি, ততই দোষী মনে হয়েছে নিজেকে। মনে হয়েছে ঠকাচ্ছি তোমাকে। তোমার ভালবাসার সুযোগ নিচ্ছি। হয়তো নিজের স্বার্থেই তুমি বিয়ের ডিসিসন নিয়েছ, তাতে আমিই বেঁচে গেলাম। তোমার অভাবে আমার জীবন অন্যরকম হয়ে যাবে। তবু, প্রার্থনা করি, তোমার ভবিষ্যৎ সুখের হোক।

"ছুটির পরে আবার দ্যাখা হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে আজ আমি আগেই যাচ্ছি। লিফ্‌টম্যানের হাতে এই চিঠি দিয়ে গেলাম। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না। —দ্বিজেন।

"**পুনশ্চ** : চিঠি শেষ করে বুঝতে পারলাম তোমাকে ছাড়া কী কষ্টকর! আর তো তোমার ওপর কোনও দাবি নেই, তবু নির্লজ্জের মতো প্রার্থনা করছি, শুধু একবার দেখা করো। আমি এখন থেকেই বসে থাকব সেখানে—যতক্ষণ না-আসো। আর কারুর স্ত্রী হবার আগে নীলাকে একবার দেখতে চাই—শেষবার। দেখবে, যাকে এতদিন ভালবেসেছিলে সে শুধুই অভদ্র নয়। —দ্বি।"

স্তম্ভিত, চিঠিটা একবার পড়ার পরও শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আরও-একবার পড়ল নীলা। পড়তে-পড়তে ঢোক গিলল। নড়তে পারছিল না। একটা ফাঁকা হাওয়া ছটফট করতে লাগল বুকের ভিতর। লিফ্‌ট-এর সামনে অপেক্ষারত লোকজনের ভিড় বাড়তে খেয়াল হল, এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তখন চিঠিটা ব্যাগে ভরে, শূন্য চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে ফুটপাতে নেমে এল নীলা। যেন রাস্তা ও ভিড় নয়, হঠাৎই গোটা আকাশের শূন্যতা ঢুকে পড়ল তার বুকের মধ্যে। সে জানে এখন কী করবে। যেতে-যেতে হঠাৎ একটা ট্যাক্সি খালি হতে দেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলা, অনিচ্ছুক ড্রাইভারকে বলল, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না! প্লিজ, একটু নামিয়ে দিন চৌরঙ্গিতে!'

তখন দরজা খুলে দয়ালু ড্রাইভার তাকে ডেকে নিল ভিতরে।

বিকেলের অবিন্যস্ত কলকাতা ট্রাফিকের জাল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে যতই দেরি করাবার চেষ্টা করুক, ইচ্ছেমতো ঠিকই পৌঁছে গেল নীলা। চেনা রেস্তোরাঁয় বেয়ারাদের হাসিমুখ পেরিয়ে ঠিকই উঠে গেল দোতলায়।

এ-জায়গাটা ফাঁকাই থাকে। এখনও ছুটি হয়নি পুরোপুরি, তাই আরও ফাঁকা। ইতস্তত দু-চারজন বসেছিল। ওরই মধ্যে খুঁজে পেল দ্বিজেনকে। জানলার পাশের টেবিলে—ডান হাতে ভর-দেওয়া মাথা, আঙুলে পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট, অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার দিকে ফেরানো।

'কী ভেবেছ আমাকে!' মুখোমুখি বসার তর না-সয়েই এতক্ষণের চেপে-রাখা আবেগে

ফেটে পড়ল নীলা, 'তুমি সেলফিস্! স্বার্থপর! কী করে ভাবলে আমি তোমাকে ছাড়া আর-কাউকে বিয়ে করতে পারব!'

'কী বলছ, নীলা!' আধপোড়া সিগারেটটা তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রেতে গুঁজে সামনে ঝুঁকে এল দ্বিজেন।

এখন ওর দাঁত ঠোঁট-দুটোকেই নিষ্পেষণ করছে। চোখে জল। দ্বিজেনের বাড়ানো হাতটা লোভীর ধরনে মুঠোয় চেপে ধরে নীলা বলল, 'কেন বোঝনি আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম! এতদিন অপেক্ষা করেছি কেন, বুঝলে না—'

'কিন্তু—নীলা—'

'তুমি শয়তান, কাপুরুষ! শুধু চিঠিই লিখতে শিখেছ!'

দ্বিজেনের অপ্রস্তুত হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা টেনে নিল নীলা। ছটফটে হাতে ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে পাগলের মতো ছিঁড়তে লাগল, তারপর একই ভঙ্গিতে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিল খোলা জানলা দিয়ে, বাইরে।

যারা কিছুই জানে না, রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে তারা দেখল, একরাশ কাগজের কুচি হাওয়ায় ভেসে ক্রমশ নেমে আসছে নিচে। ●





অভিজ্ঞান দুষ্মন্তম

দুষ্মন্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চাঁদের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছে দিকবিদিক। আকাশ মাটি মিশে একাকার। চমৎকার। 'উদাসী-বিদেশী-স্বগৃহে-প্রবাসী'-জাতীয় মুখ করে মহারাজা বারান্দার রেলিং-এ ভর দিলেন। চোখ ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। এই ক্ষুদ্র ঝরোকাটি সবচেয়ে উপরের মহলে। এই মহলে কোনও স্ত্রীলোক থাকে না। দুষ্মন্তের বয়স্য বিদূষকের মহল এটা। এই ঝরোকা থেকে অন্তত হংসবাদিকার গানটা শোনা যাবে না। উঃ, প্রাণ খালি করে ছেড়ে দিলে! কী এনার্জি, কী গলার রেঞ্জ! যেখানেই দাঁড়ান না কেন, হংসবাদিকার প্যানপ্যানানি থেকে রেহাই নেই। ঠিক শুনতে পাবেন।

একা কি হংসবাদিকাই? দুষ্মন্তের একটিই মাত্র দোষ। একটু বেশি-বেশি প্রেমে পড়েন। বড্ড রোমান্টিক স্বভাব। আর রূপের প্রতি শিল্পীসুলভ মোহ। দুষ্মন্তের প্রাসাদে আর-কোনও মহল বাকি নেই, কোনও কামরা বাকি নেই, যা তাঁর একজন-না-একজন পরিত্যক্ত পত্নীতে ভরা নয়। এই কারণেই সে-বারে বিদূষক পরামর্শ দিয়েছেন, 'এ-বার থেকে মহারাজের যা করবার বাড়ির বাইরেই করবেন, বাইরেই রেখে আসবেন। বাড়িতে স্থান-সংকুলান হচ্ছে না। আরেকটি প্রাসাদ প্রস্তুত করা দরকার। ততদিন অলমিতি বিস্তরেণ।'

তাই, যখন কন্বমুনির আশ্রমে সেই নির্বোধ মাতৃপিতৃ-পরিচয়হীন রূপসী কন্যাটির সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন, বিদূষক শক্ত হাতে তাঁকে পথ-প্রদর্শন করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই কন্যা ছাড়াই তিনি প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এসেই প্রচার করছেন তাঁর পাঞ্জাছাপের অঙ্গুরীয়টি মৃগয়ায় গিয়ে হারিয়েছে। কেউ খুঁজে পেলে শতমুদ্রা পুরস্কার। ঘোষণা শুনে কেবল মহারানী চন্দ্রবতী ঠোঁট টিপে একটু হেসেছিলেন। চন্দ্রাবতী তাঁর বড়রানী, পাটরানী, প্রথমা পত্নী।

দশবৎসর-কাল চন্দ্রাবতী একলা থাকেন। কেননা, রাজা অপুত্রক বলে প্রায়ই বিবাহ করেন। নিত্য নবীন শয্যাসঙ্গিনীর খোঁজে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই, হৃদয়-জ্বালাও আর মেটে না। চন্দ্রাবতীর এতেই আপত্তি। সে-বার কন্বমুনির আশ্রমে কী ঝামেলাটাই না বেধেছিল! কে ভেবেছিল কন্বমুনির স্বভাব এত আধুনিক? বালিকার গর্ভসঞ্চার যদি হয়েও থাকে, তার ফলে তাকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ না-করে, অথবা বনেই আশু বাণপ্রস্থ-গ্রহণের সুপারমর্শ না-দিয়ে, তিনি যে দুই ছোকরাকে সঙ্গে দিয়ে তাকে রাজসভায় পাঠিয়ে দেবেন, তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? রাজসভায় এসে আসন্নপ্রসবা গাভীর মতো নির্ভরশীল দুই চোখ মেলে সেই মেয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। স্ফীতোদরা, শীর্ণ, নীরক্ত হাত-পা, বনবালাদের অনভ্যস্ত

হাতের গ্রাম্য প্রসাধনের ফলে রাজসভায় তাকে দেখাচ্ছিল হাস্যকর। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে ধমক দিয়ে তাদের রাজসভা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন সে-দিন দুষ্মন্ত, চিনতে না-পারার ভান করে। মেয়েটা জংলি, সরলভাবে ভাবল অঙ্গুরীয় হারিয়ে ফেলেছে বলেই তাকে রাজা চিনতে পারছেন না। কোনও অভিযোগ না-করেই ফিরে গেল।

সবাই অবিশ্যি অমন হয় না। সেই-যে মৎস্যজীবীদের মেয়েটি তেড়ে এসেছিল তার পাড়ার সবকটা ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলেকে নিয়ে? তাকে তো ঘরে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন রাজা দুষ্মন্ত। সে-মেয়েও এখন হংসবাদিকার মতো গান করে, আর মাছ ধরার জাল বোনে। পর-পর দুটি মৃত শিশুর জন্ম দিয়ে তার কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল হয়েছে। বাঁচা গেছে।

দুষ্মন্তের এখন মন-খারাপ। মন-খারাপ রাজনটী রূপবতী লোলাপাঙ্গীর জন্য। লোলাপাঙ্গীর মা অতি চতুরা। সে কিছুতেই মেয়েকে রাজার খপ্পরে পড়তে দিচ্ছে না। মেয়ে আবার খুব মাতৃভক্ত। দুষ্মন্তের মনে লোলাপাঙ্গীর প্রতি আন-লিমিটেড প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। যুবতীটি যেমন রূপে, তেমনি গুণেও তুলনাহীনা। ভাল নাচে, ভাল গায়, ভাল বীণা বাজায়, শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে পারে, কাব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারে, আর এইসব নারীরাই তো শোনা যায় বাৎস্যায়নের শাস্ত্রেও সুদক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু, হায়, সেই বিষয়টাই আর দুষ্মন্তের জানা হচ্ছে না, লোলাপাঙ্গীর মায়ের চতুর বিঘ্নসঞ্চারের ফলে। এই চরাচর-বিস্তৃত রজত চন্দ্রালোকে দুষ্মন্তের প্রাণে লোলাপাঙ্গী-বিরহ প্রবল হয়ে উঠল, তিনি প্রাসাদ-শিখর থেকে নেমে চললেন সারথি অশ্বমেধের খোঁজে। পথেই দ্যাখা বিদূষকের সঙ্গে। এ-মহলটা তাঁরই। বিদূষক বললেন—'লোলাপাঙ্গীর ভাবনা ত্যাগ করুন, মহারাজ। ওর মা ওকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করছে, অতি চতুরা মহিলা, আপনি ওদের জানেন না। জাতটাই আলাদা।' দুষ্মন্তের অহংকারে আরেকটা ঘা লাগল। কী? আমি ওদের জানি না? কেন, ওরা আমার প্রজা নয়? তাঁর জেদ চড়ে গেল।

একদিন লোলাপাঙ্গী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বাতায়নে, দেখলেন একটি পরমা সুন্দরী আশ্রমবালিকা ক্লান্তচরণে দুটি তরুণ সূর্যের মতো সুদর্শন আশ্রমিক যুবার সঙ্গে অশ্রুমোচন করতে-করতে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েটি আসন্ন-প্রসবা। লোলাপাঙ্গী তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে এনে ঘরে বসালেন। ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে শীতল জল-পান খেতে দিলেন। পাখার হাওয়া দিয়ে তাদের পথশ্রম মোচন করতে বললেন দাসীদের। তারপর শুনলেন মেয়েটির নাম শকুন্তলা। সে কন্বমুনির মানুষ-করা মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে অপ্সরী মেনকাদেবীর কন্যা। লোলাপাঙ্গীর মা শলভা নিজেও এই মেনকারই কন্যা—শকুন্তলা যেমন ঋষি ও অপ্সরীর মিলনের ফলে জাত, লোলাপাঙ্গীর মা তেমনি উজ্জয়িনীর মহারাজ এবং মেনকার সঙ্গমজাত কন্যা। শলভা শকুন্তলার সহোদরা ভগিনী—অর্থাৎ শকুন্তলা লোলাপাঙ্গীর ছোটমাসি। এই পরিচয় আবিষ্কার করে, এবং সরলা আশ্রমবালা শকুন্তলার দুরবস্থা দেখে নাগরিকা শলভার মনে যেমন মায়া-মমতা হল, তেমনি রাগও হল রাজার ওপরে। শলভা বললেন—'বোন, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা করো। অ্যায়সা দিন নেহী রহেগা। তোমার স্বামীগৃহে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত

না-করতে পারলে আমার নাম শলভা নয়। কুছ ফিকর মত্ করো।' এই বলে শকুন্তলাকে নিজের কাছে রেখে লোলাপাঙ্গীর মা শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে আশ্রমে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। শকুন্তলা যথাসময়ে পরম সুলক্ষণযুক্ত পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন শলভার গৃহে। তারপর তিনি পুত্র-সমেত শকুন্তলাকে গহন বনের মধ্যে ঋষিদের কাছে এক উদ্ধার আশ্রমে জমা করে দিয়ে এলেন। শিশুর পিতার নাম রেজিস্ট্রি খাতায় লিখিয়ে এলেন মহারাজা দুষ্মন্ত। মাঝে-মাঝে খবর নিতে যান। শকুন্তলা কেবলই বলেন—'কই দিদি, মহারাজ তো এখনও এলেন না?' প্রত্যেকবার রাজনটীর মা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাপ্টা-ঝুমকো সিঁথি-সাতনরিতে ঝম্‌ঝমাঝম্ শব্দ তুলে গেয়ে ওঠেন—'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা আনেওলা! ইতনা জল্‌দি কিঁউ? বহিন তুম ঘাবড়াও মত্—হম্ তেরা সঙ্গ হ্যায়। বে-ফিকর হো যাও।'

বসন্তকাল। পিক-কূজনে দুষ্মন্ত মদন-জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। এমনই-এক ঘোর-লাগা বসন্ত-প্রভাতে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে মহারাজ নটী লোলাপাঙ্গীকে পুষ্প-শোভিত উপবনে তৃণশয্যায় লীলায়িত ভঙ্গিতে চিঠি লিখতে দেখলেন। রাজা উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার কাছে হৃদয়-নিবেদন করলেন। কী ভাগ্যি, মা শলভা কাছাকাছি ছিলেন না বলেই বোধহয়, লোলাপাঙ্গীও রাজার প্রণয়-বাক্য গ্রহণ করলেন। মহারাজার আহ্লাদ দ্যাখে কে? তিনি সাবধানে আরও খানিকক্ষণ নিরীহ প্রণয়লীলা চালিয়ে তাড়াতাড়ি আসল কথাটা পাড়লেন—'সুন্দরি! নিশাকালে আমি তোমার দর্শন প্রার্থনা করি।' মোহিনী লোলাপাঙ্গীর আজ হয়েছে কী? বসন্তের মধুর বাতাসে তিনিও কি ভুললেন? তিনি যে এ-প্রস্তাবেও রাজি! সময় ঠিক হল, মধ্যযাম। রাজা একা, ছদ্মবেশ ধারণ করে যাবেন, লোলাপাঙ্গীর বাতায়নে টোকা দেবেন, তিনবার। লোলাপাঙ্গী নিজের শিরোমণিটি রাজার হাতে সমর্পণ করলেন। দাসীর হাতে ওটি দিলেই দাসী দরোজা খুলে দেবে। এ-বারে শূন্যে মধুর বিদায়-চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন দুষ্মন্তকে লোলাপাঙ্গী—এক যবন শ্রেষ্ঠীর কাছে এই বায়বীয় প্রকাশটি শিক্ষা করেছেন। দুষ্মন্ত মুগ্ধনয়নে রাজনটীর দিকে চেয়ে, কয়েক-পা পিছু হটে, অগত্যা প্রাসাদে ফিরে গেলেন আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে-ভাসতে।

আগ্রহ তাঁর অধীর অতি!

রজনী মধ্যযামিনী। মহারাজকে ছদ্মবেশ ধারণ করতেই হবে। কেননা পাড়াটা ভাল নয়। রাজনটী হলেও থাকেন তো তিনি নটীদের পল্লীতে—সেখানে রাতভর হইচই, আলো। মত্ত নাগরিকের ভিড়, বিদেশি সৈনিক আর শ্রেষ্ঠীদের আনাগোনা। এমনকী ক্ষমতাসীন অমাত্য, রাজপুরুষদেরও অনবরতই সে-পাড়ায় যাতায়াত। দুষ্মন্তকে সবাই চিনে ফেলুক, এটা কাম্য নয়। বিদূষকের সাহায্য নিয়ে দুষ্মন্ত অতি যত্নে নিজেকে এক যবন শ্রেষ্ঠীর মতো করে সাজালেন—দর্পণে দাঁড়িয়ে 'চমৎকার' বলে পিঠ চাপড়ালেন নিজেরই। বিদূষক বললেন—'সত্যিই মহারাজ, চেনা যাচ্ছে না।'

—'এখন লোলাপাঙ্গী নিজে চিনতে পারবে তো?' মহারাজ বললেন—'বিদূষক, বয়স

হয়ে তোমার সাধারণ জ্ঞান কি লুপ্ত হয়েছে? লোলাপাঙ্গীর দাসী আমাকে দরোজা খুলে দেবে, এবং তার চেনা নির্ভর করবে আমার চেহারার ওপর নয়—অভিজ্ঞানের ওপর। এই সেই অভিজ্ঞান।' বলে মহারাজ তাঁর বয়স্যকে একটি শিরোমণি দেখালেন, বৈদুর্যের তৈরি, জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

মাঝরাতে লোলাপাঙ্গীর বাতায়নে টোকা মারতে গিয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত দেখলেন আগেই বাতায়ন খুলে উঁকি মারছে দেহাতি একটি কিশোরী দাসী। অধৈর্য প্রেমিক বললেন—'দোর খোলো গো, দোর খোলো। আমি এসেছি।' দাসী রাজাকে বললে—'তু কৌন রে?' উত্তরে মহারাজ মুঠো খুলে লোলাপাঙ্গীর অভিজ্ঞান-শিরোমণিটি দেখালেন সঙ্গে-সঙ্গে কী-যেন ঘটে গেল। '—ডাকু! ডাকু! পাকড়ো! পাক্‌ড়ো!' বলে চিৎকার করেই দাসী ঠাস করে পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছে—আর অমনি অন্ধকার থেকে দুটো ষণ্ডা-গুণ্ডা, গুঁফো, নেংটিপরা পহেলবাম বেরিয়ে এসে মহারাজকে 'হেঁইও' বলে মাটিতে ঠেসে ধরেছে৷ শুধু কি তাই? —'মার শালা কো! মার শালা কো।' বলে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে ফেলেছে! একজন তাঁর হাত মুচড়ে বৈদুর্যমণিটি কেড়ে নিয়েছে, এবং চেঁচাচ্ছে, 'মিল্ গিয়া, মিল্ গিয়া, একঠো চোরাই মাল মিল্ গিয়া!' অন্যজন ততক্ষণে রাজামশাইয়ের বুকে উঠে বসেছে এবং তাঁর দাড়ি টানতে-টানতে পরিষ্কার যবন ভাষায় বলছে—'কী হে, বাছাধন? বের করো এ-বারে বাকি মালকড়ি সব? নিকালো যো-কুছ্ লিয়া, আভি নিকালো।' বলতে-বলতে জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বাইরে টেনে এনেছে মহারাজের রাজচক্রবর্তী রত্ন-উপবীত, যার কোণে তাঁর অভিজ্ঞান-রাজ-অঙ্গুরীয়টি সযত্নে গ্রন্থিবদ্ধ করা রয়েছে। হাজার হোক বারাঙ্গনাপল্লি তো, ওটি আঙুলে পরিধান করে প্রকাশ্যে সেখানে যাওয়াটা মহারাজ শোভন মনে করেননি। ততক্ষণে রাজকীয় পিঠে বেশ কয়েকটি কিল-ঘুঁষি পড়েছে আর কর্ণকুহরে যা মধুবর্ষণ হচ্ছে, তা বলার নয়। চতুর্দিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়, রাজা দুষ্মন্ত চোখ বুজে মনে-মনে সীতার মতো বলছেন—'হে ধরণী, দ্বিধা হও।' এমন সময়ে লোলাপাঙ্গীর মা পালোয়ানদের ধমকে উঠলেন—'ওরে বুড়বক! করিস কী, করিস কী, থোড়াবহুত গড়বড় তো হো গিয়া কুছ—জরুর। যবনের বুকে কেউ কখনও যজ্ঞোপবীত দেখেছিস? আর এ তো রাজ-উপবীত! ইনি নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী রাজা-রাজড়া হবেন—ছি ছি! ক্যা শরম কি বাত্—ছোড় দো, ছোড় দো, আভি ছোড় দো উনকো'—বলতে-বলতে যে-ই শলভা দুষ্মন্তের যবন-সাজটি টেনে খুলে ফেলেছেন, সঙ্গে-সঙ্গেই রাজার পদতলে পড়ে ক্ষমাও চাইতে শুরু করেছেন—'হে রাম! তৌবা তৌবা! গুড গড। একসকিউজ মি! অপরাধ নেবেন না মহারাজ! দাসীটি বালিকামাত্র—এবং দেহাতি, মহামহিমান্বিত মহারাজকে সে চিনতে পারেনি। আমাদের অসীম সৌভাগ্য আজ আপনি এসেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আজই আমার ঘরে এক চোরও এসেছিল এবং সে আমার রত্ন-পেটিকাটি নিয়ে গেছে। যেহেতু লোলাপাঙ্গীর আর আমার বৈদুর্যমণি-দুটি জোড়ামানিক, তাই দাসী ভুল করেছে—ভেবেছে এটাই বুঝি আমার—' এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে লোলাপাঙ্গী এসে পড়লেন। —'চলুন, রাজন্, চলুন, গৃহমধ্যে বিশ্রাম নেবেন। ছি ছি, আমরা যার-পর-নাই লজ্জিত এবং মর্মাহত। আপনি পরিশ্রান্ত,

বিপর্যস্ত, আপনার শুশ্রূষার প্রয়োজন আছে। এই দাস-দাসীদের বুদ্ধিহীনতাকে আপনি আমার মুখ চেয়ে মার্জনা করুন। ওদের কঠোর শাস্তি দেবেন না যেন!'

আর শাস্তি! কে কাকে দ্যায়? চোরের দায়ে ধরা পড়ে দুষ্মন্ত তখন চোখে সরষেখেত দেখছেন। ষণ্ডাগুণ্ডা লোক-দুটি মুহূর্তেই আশপাশের ভিড় হটিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছে যদিও, তবু মহারাজ লজ্জা রাখবার জায়গা পাচ্ছেন না। হাঁটতে গিয়ে দেখলেন, সোজা করে পা-ও ফেলতে পারছেন না। দেহের চাইতেও মনের চোটটা লেগেছে বেশি। রাজা লোকজনের মাঝখানে এত অপমানিত জীবনে কখনও হননি। শলভার এবং লোলাপাঙ্গীর সেবায় তিনি সকালের আগেই সুস্থ হয়ে উঠলেন, এবং শলভা নিজের রথে সারথিকে দিয়ে মহারাজকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন সূর্যোদয়ের আগেই।

দুষ্মন্ত স্নান করতে গিয়ে সভয়ে আবিষ্কার করলেন, অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়টি উপবীতে বাঁধা নেই। সর্বনাশ করেছে! এখন উপায় কী? তাড়াতাড়ি বিদূষককে পাঠালেন শলভার গৃহে। দুই থলি স্বর্ণমুদ্রা-সমেত। শলভা খুব যত্ন করেই অতিথি-সৎকার করলেন, তারপর আলবোলার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'কেয়া আফশোস কি বাত! লেকিন, ইসমে, বিদূষকবাবু, ম্যায় তো লাচার হুঁ! হ্যাঁ, আংটি একটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বটে, ঠিকই, কিন্তু ও দিয়ে আমি কী-ই-বা করব, তাই আমার ছোট্ট নান্‌হে-মুন্‌হে বোনপোটিকে উপহার দিয়ে দিয়েছি। সে খেলা করবে বলে। আপনি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিন। আংটিটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ও তো ম্যাঁ সচমুচ নহি সম্‌ঝা!'

শুনে বিদূষকের তো মাথায় হাত! শলভার কাছ থেকে উদ্ধার-আশ্রমের ঠিকানা নিয়ে বিদূষক প্রাসাদে ফিরলেন। রাজার সারথিকে প্রথমে বললেন রথ প্রস্তুত করতে। তারপর দুষ্মন্তকে গিয়ে বললেন—'এ আমার একার কর্ম নয়। আংটি উদ্ধার করতে হলে, মহারাজ, আপনি নিজেও চলুন। এ-সব মুনি-ঋষিরা লোক সুবিধের হয় না। যদি না দিতে চায়?'

রাজা কয়েকথলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদূষকের সঙ্গে আশ্রমের খোঁজে বের হলেন। রথ বনের গভীরে প্রবেশ করল। উপায় নেই, ওই অঙ্গুরীয়টি না-পেলে রাজ্যের যাবতীয় রাজকার্য স্থগিত থাকবে।

আশ্রমের ঠিকানায় পৌঁছে বিদূষক দ্যাখেন, পরমা সুন্দরী এক আশ্রমকন্যা বৃক্ষমূলে বসে আছেন, কোলে একটি রাজচক্রবর্তী শিশু। তারই ক্ষুদ্র মুঠির মধ্যে দুষ্মন্তের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে। পদশব্দ পেয়ে কন্যা মুখ তুললেন। বিদূষক দেখলেন, শকুন্তলা!

রাজাকে দেখে শকুন্তলা অবাক হলেন না, তিনি রাজার আশাতেই বসেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক শকুন্তলাকে দেখে রাজা যার-পর-নাই বিস্মিত। তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হল না, এত সুন্দরও মানুষ হয়? আর এই মেয়েকেই কিনা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন? তাঁকে কি ভূতে ধরেছিল? শকুন্তলা উঠে মহারাজকে প্রণাম করলেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে দুষ্মন্ত শর্টে আশীর্বাদ সেরে বললেন—'থাক থাক। তা ইয়ে, কী বলে, হ্যাঁ, শকুন্তলা, তুমি আমার অঙ্গুরীয়টি পেয়েছিলে তো?'

শকুন্তলার বিশাল দুটি সরল চোখ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল—'আপনি কোন অঙ্গুরীয়ের কথা বলছেন, মহারাজ?'

—'কেন, যেটি আমি শলভার হাতে রাজপুত্রের জন্য পাঠালাম?'

—'এটাও তবে আপনারই দেওয়া? আমি ভাবলাম দিদিই বুঝি—'

—'বোকা মেয়ে!' দুষ্মন্ত শকুন্তলার মাথাটি নেড়ে দিয়ে পবিত্র হেসে বললেন—'তোমার দিদি এটি পাবেন কেমন করে—আমি নিজে না-দিলে? রাজবংশের শিলমোহর বলে কথা! ও কি যে-সে আংটি? নাও, ছেলেকে নাও, আংটিটা নাও, রথে ওঠো—ব্যস! আর-কিছু নিতে হবে না।'

শকুন্তলা সলজ্জভাবে বললেন—'ঋষিমশাইকে প্রণাম করে অনুমতিটা নিয়ে আসি?'

বিদূষক বলে ওঠেন, 'সাবধান কিন্তু, মা জননী, অঙ্গুরীয়টি যেন আবার রাজকুমার না-গিলে ফ্যালেন! পেট কেটে তো আর বের করা যাবে না। ও-দিকে আমাদের মহারাজ আবার একটু ভুলো আছেন, জানেনই তো!'

দুষ্মন্তের শাশুড়ি মেনকা তখন আকাশপথে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রের আদেশে আরেক মুনির তপোভঙ্গ করতে। শলভা আর শকুন্তলার কাণ্ড দেখে মৃদু হাসলেন। ●



বেলোয়ারি

মেয়েটি বিষণ্ণ কিন্তু মলিন নয়, বলল, 'তুমি আমাকে ভালবাস না।'

ছেলেটি, এই অবস্থায় ছেলেরা যেমন হয়, কিছুটা নার্ভাস আবার প্রতিবাদে সোচ্চার অথচ মুখ কোনও শব্দ ঠিকঠাক যোগায় না, শুধু চাহনিতে বোঝাল, কথাটা ঠিক নয়।

মেয়েটি পায়ে-পায়ে সরে এল ছেলেটির নিশ্বাসের কাছে, 'তা হলে আমার আঁচল এমন বিবর্ণ কেন? কেন সব রং হারিয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে পড়ল না।'

ছেলেটি বলল, 'এই কথা! আমি পৃথিবীর সব ফুল এনে দিচ্ছি, তারা রঙের সঙ্গে গন্ধও দেবে।'

মেয়েটি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল, যেমন করে বাতাস না-বইলেও দেবদারুর পাতা কাঁপে, 'সে তো আমি নিজেই আনতে পারি। পৃথিবীর ফুলেরা তো ছটফট করছে আমার স্পর্শ পেতে, সে আমি চাই না।'

ছেলেটি এ-বার যেন কিছুটা নিঃস্ব, তার ঝুলিতে অন্যতর বিস্ময় নেই, যা মেয়েটিকে নির্বাক করে দেবে। মেয়েটি মুখ তুলল, তার বুকের ঈষৎ বাইরে যেমন করে সূর্য ওঠার আগে পাখিরা প্রথম ডাক দেয়, 'ওই বুকে যদি এত ভালবাসা তা হলে আকাশটার দিকে তাকাও। ও কেন আমার আঁচলের চেয়ে সুন্দর হবে? পারো না ছোট-ছোট হিরের মতো সবকটা তারাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে এনে আমার আঁচলে ঢেলে দিতে? আমি ওদের বেঁধে রাখব এখানে, বন্ধন সুন্দর করব।'

ছেলেটি এ-বার হাসল। যেন এক-লক্ষ ঢেউ আর সামুদ্রিক ঝড় ডিঙ্গিয়ে, তার নৌকা সদ্য মাটি ছুঁয়েছে। বলল, 'উহুঁ, আমি কখনও ভাবতে পারি না তোমার আঁচল কুণ্ঠিত হয়ে আছে ভারে।'

মেয়েটি বলল, 'বেশ আমি ওই ছোট-ছোট তারাদের আমার আঁচলে বসিয়ে দেব এমন করে যেন পূর্ণিমার আকাশ হার মানে।'

মেয়েটির বুক এ-বার অঞ্জলির মতো ছেলেটির হৃদয় স্পর্শ করছে। ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'না, অত ছোটয়, যা কিনা টুকরো-টুকরো, মনে ভরবে না আমার। যদি এনে দিতেই হয় তা হলে চাঁদটাকেই পেড়ে আনব আকাশ থেকে। বসিয়ে দেব তোমার আঁচলে।'

মেয়েটি বলল, 'যার বুক জুড়ে এমন চাঁদ তার অন্য চাঁদে কী দরকার?' ছেলেটি দু-হাতের বেড়ে নিজেকে সমর্পণ করার মুহূর্তে বলল, 'তবে যে বলছিলে আমি তোমায় ভালবাসি না।'

মেয়েটি গ্রহণ পূর্ণ করল, 'আমি যে আবার নতুন করে ভালবাসলাম, তা-ই।'



তিস্তা বলল, 'কী রকম বোকা-বোকা ব্যাপার সব।'

সুব্রত কিন্তু আচ্ছন্ন ছিল। তিস্তার কথা কানে যেতেই মুখ তুলল, 'বোকা বলছ কেন? প্রেমের স্বাভাবিক এই অভিব্যক্তি তোমার পছন্দ হয়নি?'

'স্বাভাবিক?' তিস্তার চশমার কাচ চক-চক করে উঠল, 'তোমরা ছেলেরা একটু নরম কথা পেলেই গলে যাও। তাই তোমাদের প্রেমে পড়তে সময় লাগে না।'

সুব্রত কথার সুতো সোজা করতে চাইল, 'যা-ই বলো, ছেলে-মেয়ে দুটো কিন্তু খুব ভাল অভিনয় করেছে। এই নেপালি গানটাকে নাটক করা খুব সোজা নয়।' কথাটা শেষ করে সুব্রত আর-একবার তিস্তার দিকে তাকাল। লম্বা, ঈষৎ ডিম্বাটে মুখ, ফেঁপে-ফুলে-থাকা কাঁধ-ছোঁয়া চুল নলেগাঁও জঙ্গলের মতো কালো, হাঁটে যখন, তখন সুব্রতর বুকে শিউলি ঝরার শব্দ হয়। এখন এখানে শীত দাঁত শানায় ভোর রাতে, দিনভর একটা ওম ছড়ানো থাকে। না-গরম না-শীত। পাহাড়গুলো যেন মেজে-ঘষে চমৎকার ফিটফাট হয়ে আছে। বিয়ের ক-দিন আগে থেকে মেয়েরা যেমন নিজেদের সাজায়। তাই এই সন্ধে-পার-হব-হব সময়টায় কুয়াশা নেই, মেঘ নেই এবং তিস্তার শরীরে কোনও পশমের বাড়তি আবরণ নেই। হাল্কা-নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে ওর ভরাট শরীর বর্ষার নদীর মতো। বুকের দিকে তাকালেই মুখ খোলার আগে টইটম্বুর গ্রান্ডিফ্লোরার কথা মনে আসে। তিস্তার পাশে হাঁটলেই সুব্রত অবশ হয়ে যায়। মাত্র আটমাসের আলাপ। আটমাস ধরে একটার-পর-একটা ঘর তুলতে-তুলতে সম্পূর্ণ হয়েছে বুনন, শুধু বোতাম বসানো বাকি।

বাজার-এলাকা ছাড়ালেই পৃথিবীটা শূন্য। তখন কোনও মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। সুব্রত হাত বাড়িয়ে তিস্তার আঙুল তুলে নিল। এত নরম, যেন রক্তের চলাচল অনুভব করা যায়। তিস্তা বলল, 'কী হচ্ছে কী?'

'কেন?'

'কেউ দেখে ফেলবে।'

'ফেলুক।'

'আহা, তোমার আর কী! আমাকে মেয়ে-কলেজে পড়াতে হয়।'

'এত রাত্রে কেউ তোমাকে দ্যাখার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।' তিস্তা অবশ্য হাত সরিয়ে নেয়নি, কিন্তু নিজের আঙুল নিষ্ক্রিয় রেখেছিল। এইরকম নিরাসক্ত তিস্তাই হতে পারে। আটমাসের প্রতিটি দিনে সুব্রত বুঝেছে সে যতটা তিস্তাকে কামনা করে, তার চেয়ে কম তিস্তা তাকে ভালবাসে না। অনেক ছোট-বড় প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এইরকম ভাবতে পারার। অথচ তিস্তা যেন সেই আখরোটের মতো, যা হিরের চেয়েও শক্ত। সুব্রতর হাজার উচ্ছ্বাস ওকে শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, আপ্লুত করে না। এখন তো বিবাহের দিন মোটামুটি স্থির। এখনও তার স্বাধীনতা শুধু হাত ধরায়, কখনও-কখনও চুম্বনে। শেষেরটিতে বড় আপত্তি তিস্তার। অথচ মাঝে-মাঝেই তিস্তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের হাড় করে নেবার বাসনা তীব্র হয় সুব্রতর। ওর বুকের রং গন্ধ স্বাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করার জন্য আকুলিবিকুলি চলে রক্তে। একবার

ওর খোলা কোমরের নরম খাঁজে আঙুল রেখেছিল সুব্রত। চমকে সরে গিয়েছিল তিস্তা, বলেছিল, 'এমন কোরো না।'

'কেন?'

'আমাদের সঙ্গে সারমেয়র কী তফাৎ থাকবে তা হলে?'

স্তম্ভিত সুব্রত কোনওরকমে বলতে পেরেছিল, 'কী আশ্চর্য, যাকে ভালবাসি তাকে মনের মতো করে আদর করতে পারব না?'

'যাকে ভালবাস বলে মনে হয় তার শরীর কি শুধু ভোগের জন্যেই?'

'ভোগ বলছ কেন?'

'সুব্রত, সংযত হলে সবকিছুই স্থির থাকে। প্লিজ। এ-বিষয়ে কথা বলতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমরা অন্য-কিছু নিয়ে কথা বলি, এসো।' তিস্তা মুখ নামিয়েছিল। নামিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল বুক নিংড়ে।

কিন্তু, সেই-যে প্রবাদ, মাটির পাত্র একসময় পাষাণকে ক্ষইয়ে দেয়, সুব্রত তিস্তার নরম এবং উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পেরেছিল একদিন। এবং ওইসময় তাকে সতর্ক থাকতে হত যাতে একটুও বাড়াবাড়ি না-হয়, যা কিনা অমানুষ করে তেমন-কোনও আচরণ না-হয়ে যায়। তিস্তার চারদিকে বাঁধ, সেই বাঁধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত জলের মতো বয়ে যেতে হয় সুব্রতকে।

আজও হাঁটতে-হাঁটতে এই কথাগুলো চট-চট করছিল সুব্রতর মনে। ওর হাতে তিস্তার আঙুল। আর মাথার ওপর প্রতিপদের চাঁদ হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায়। বাঁক পেরোতেই ওদের পা শ্লথ হল। একটু এগিয়ে রাস্তার কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। পেছনে পাহাড়, সামনে অতলান্ত খাদ। সেই খাদ ডিঙিয়ে ছোট-ছোট পাহাড়কে টিলার মতো দ্যাখায় এখান থেকে। ডিমের খোলের মতো জোছনায় মাখামাখি চৌদিক। সেই টিলাগুলোকে বেড় দিয়ে দুটো নদী এসে মিলেছে সামনে। চকচকে নয়, কেমন ফ্যাকাসে, সাদা দেখাচ্ছে তাদের শরীর।

কবে কখন কোন পাহাড়ের বরফ গলে ঝরনা, ঝরনা জড়ো হয়ে বড় ধারা নেমেছিল একদিন। বড় পাথর ভেঙে নুড়ি করে-করে উত্তাল হয়ে ছুটে আসছিল নিচে। সহসা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল কোনও কঠিন বাধা, ধারা বিভক্ত হল। দুই বিনুনির মতো দু-দিকে চলে গেল তারা। এ জানে না ওর খবর, ও পায় না একে। তারপর অনেক পথ ডিঙিয়ে আচমকা ওইখানে এসে দেখা হল দু-জনের। একজন আর-একজনকে দেখে লাস্যভরে বলে উঠল, 'থিস্তা?' এই পাহাড়ি শব্দটির সরল অর্থ, 'এতদিন কোথায় ছিলে?' সেই থেকে যাকে শুধনো হল, যার শরীর একটু গভীর, তার নাম হয়ে গেল তিস্তা। আর যে শুধাল, যার শরীরে দেখার আনন্দে রং বেজেছে, তার নাম রাখা হল রঙ্গিত। একজনের জল সাদা, অন্যজনের জল ঘোলা; পুরুষ এবং প্রকৃতির যেমনটি হয়। রঙ্গিতকে গ্রাস করে নিল তিস্তা।

এ-গল্প এখানে এসে নানান মুখে শোনা। সুব্রতরও যেমন, তিস্তারও তাই। এই পথে হেঁটে গেলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নিচের ঝাপসা নদীদুটো দেখতে ভারি ভাল লাগে। একদিন সুব্রত বলেছিল, 'চলো, রাস্তা খুঁজে নিয়ে ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। তিস্তা মাথা

নেড়েছিল, 'না। দূরে আছে বলেই ওরা রহস্যময়, কাছে গেলে হয়তো আর-পাঁচটা নদীর মতো সাধারণ হয়ে যাবে।'

আপত্তি করেছিল সুব্রত, 'বিশ্বাস করি না, তিস্তা কখনওই সাধারণ হতে পারে না।'

'কেন নয়? তারও গঠন অন্য-পাঁচজনের মতনই। ভালবাসা দিয়েই তো আমরা রহস্যময় করে তুলি।' বলে হেসে ফেলেছিল তিস্তা।

চমকে ফিরে তাকিয়েছিল সুব্রত, কিন্তু মন মানেনি। মনে-মনে জেনেছিল তিস্তার রহস্য কখনও শেষ হবার নয়। আকাশের মতো—সমুদ্র নয়, কারণ তারও তল আছে।

আজ প্রতিপদের জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রঙ্গিত-তিস্তার সঙ্গমের দিকে তাকিয়ে সুব্রত ওর কাঁধ স্পর্শ করল। একটু কি কাঁপুনি জমল তিস্তার শরীরে?

তিস্তা নিচু গলায় বলল, 'তুমি ঠিক ওইরকম, রঙ্গিতের মতো।'

সুব্রতর কণ্ঠ গভীর হল, 'তোমায় বড় আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

তিস্তা তাকাল। চশমাও মাঝে-মাঝে গয়নার মতো সুন্দর করে কাউকে। আর ওইসময় ইঞ্জিনের শব্দ বাজল পাহাড়ে। একটা গাড়ি নামছে ওপর থেকে। চকিতে সরে গেল তিস্তা, বলল "কী যে করো!'

সুব্রত মনে-মনে বলল, আর কটা দিন, তিরিশদিনে যদি মাস হয়—।

ওরা চুপচাপ ওপরে উঠে আসছিল। প্রথম-প্রথম এইরকম চড়াই ভাঙতে অসুবিধে হত সুব্রতর। এই শহরে তিস্তার বাস অবশ্য কিছু আগে থেকে। ওর কলেজ বাসস্থান থেকে মিনিট-দশেক হাঁটলেই। এই শহরে এখন বাড়ি পাওয়া মুশকিল। চন্দ্রালোক হাউসের পিছনে ছোট্ট বাংলো বাড়িটা পেয়ে সুবিধে হয়েছে তিস্তার। ওর এক সহকর্মিনীর সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধে অনেক। মহিলা বয়স্কা, এবং, বোধহয়, শুচিবাইগ্রস্ত। এই আটমাসে একটিবারের জন্যে সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি সুব্রত। তিস্তা জানিয়েছে মহিলা আত্মীয় না-হলে কারও প্রবেশ পছন্দ করে না। একজন স্বাধীনচেতা অধ্যাপিকার এই মানসিকতা কী করে মেনে নেয় তিস্তা, সুব্রত জানে না। মহিলাকে দেখে তার পুরুষ-বিদ্বেষী বলেই মনে হয়। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে তিস্তা ওখানে বেশ আরামে থাকে। শীতের ছুটি পড়লেই চলে যায় বরানগরে। বাপ-মায়ের বড় আদুরে মেয়ে সে। ভবানীপুর থেকে সুব্রতর বাড়ির লোক সেখানে গিয়ে শেষ তথ্যটি জেনে এসেছে।

সুব্রতর চাকরি সরকারি হাসপাতালে। ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি জমেছে বেশ। প্রেমে পড়ার সময় পায়নি এতকাল পড়াশোনা এবং কাজের চাপে। এই পাহাড়ি শহরে এসে যার ঢেউ সব এলোমেলো করে দিল, সে ওই তিস্তা। বরানগরের মেয়ের নাম পাহাড়ি নদীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি রেখেছিলেন তিনি অবশ্যই রসিক। এই আটমাস ধরে হিসেবটা একটু-একটু করে মিলিয়ে আনছিল সুব্রত। এখন চূড়ান্ত ক্ষণের অপেক্ষা।

তিস্তার বাড়ি যদি এই পাহাড়ে, তা হলে সুব্রতর ওই পাহাড়ে। মাঝখানে রাস্তাটা চিরে গেছে দু-দিকে। অফিসের সূত্রেই পাওয়া একতলা প্রায়-কাচের বাড়িটা এখন একটু-একটু করে সেজে উঠেছে। সামনের ছোট বাগানে বীরবাহাদুর রকমারি ফুলের আসর সাজিয়েছে।

দুটো কর্পূরগাছের ফাঁক দিয়ে ভ্যালিটাকে অনেকখানি চোখের সামনে ধরা যায়। বর্ষার মেঘগুলো নেমে আসে সেখানে। ভোরে আকাশ যখনও মেঘে মুখ ধোয়নি, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তাজমহলের চেয়ে সুন্দর দ্যাখায়। আর আছে সুব্রতর প্রিয় ফুল গ্রান্ডিফ্লোরা। বিরাট কুঁড়ি যখন পূর্ণ হয়ে একটু-একটু করে মুখ খুলতে থাকে, তখন বীরবাহাদুর হাতের নাগালে যাকে পায় তাকেই সুতো দিয়ে বেঁধে আসে। মুখ বন্ধ, তাই পেটপোয়াতি মেয়ের মতো আদুরে হয়ে যায় ফুলগুলো। রাত বাড়লেই ওদের শরীর থেকে গন্ধ চুঁইয়ে পড়ে সমস্ত বাগানে, ঘরে-ঘরে। এই বাড়ি এখন যেটুকু অসম্পূর্ণ, তা তিস্তা এলেই পূর্ণতা পাবে।

তিস্তা অবশ্য এখানে এসেছে। রোদ-জড়ানো বিকেলে বাগানের-মধ্যে-ঢুকে-যাওয়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বীরবাহাদুরের হাতের চা খেয়ে গেছে। ঘরে ঢোকেনি। সুব্রত অনুরোধ করলে হাত তুলে থামিয়েছিল, 'সবই যদি এখন জেনে যাই, তা হলে অধিকার নিয়ে যখন আসব, তখন জানার যে কিছু থাকবে না।'

সুব্রত বলেছিল, 'অধিকার কি এখন নেই?'

তিস্তা বলেছিল, 'চোরের মতো!'

কথা বাড়ায়নি সুব্রত। তিস্তার জিভে একধরনের বাঁকা ছুরি আছে, ঢুকে যাওয়ার আগে তার অস্তিত্ব বোঝা গেলে অসাড় হয়ে যেতে হয়।

এই শহরের প্রশংসা করেছিল তিস্তা। মানুষের লোভ সীমিত, চুরিচামারি হয় না বড়-একটা। মেয়েদের বেইজ্জত করার ঘটনা শোনা যায় না। যা-কিছু অসংলগ্ন তা ঘটে ট্যুরিস্টরা এলে। কলকাতার কোনও ছেলে এখানকার মেয়েদের অসম্মান করলে পাহাড়ের মানুষরা তাকে ছিঁড়ে ফেলে, এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুদিন আগে। তিস্তা বলেছিল, 'ঠিক হয়েছে। বরাহের উপযুক্ত শাস্তি।'

সুব্রত বিস্মিত 'বরাহ?'

তিস্তা কঠিন গলায় জবাব দিয়েছিল, 'তা-ই। সমস্ত কলকাতাটাই তো এখন বরাহনগর। তা থেকে মাঝে-মাঝে এইসব বরাহ ছিটকে আসে।'

মনে করিয়ে দিয়েছিল সুব্রত, 'তোমার বাড়ি কিন্তু বরাহনগরে।'

'তাই তো আমি এতটা বলতে পারি।' তিস্তা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

পিচের রাস্তাটা ছেড়ে অনেকটা নিচে নামতে হয় তিস্তাকে। দু-পাশে বড়-বড় গাছের সারি। বিকেল হলেই জায়গাটায় অন্ধকার নামে। যদিও আকাশে চাঁদ, তবু এখানে জ্যোৎস্না ঢোকেনি। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বালল তিস্তা। সুব্রত রোজ এখান থেকেই ফিরে যায়। আজ আরও কয়েক-পা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল, বলল, 'দরজা অবধি পৌঁছে দিই?'

তিস্তা বলল, 'তোমাকে আবার উঠতে হবে।'

'তা হোক।'

সুব্রতর হাত থেকে অনেকক্ষণ আঙুল সরিয়ে নিয়েছে তিস্তা। শেষবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল সুব্রতর। তিস্তা রাজি হল না, কিন্তু মুখে কোনও কথাও বলল না। মোড় ঘুরে থামবিহীন লনটার সামনে আসতেই চোখে পড়ল, বাংলোটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনও জানালায় আলোর ছিটে লেগে নেই। চট করে হানাবাড়ির মতো মনে হয়।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'এত অন্ধকার কেন?'

তিস্তা বলল, 'আমাকেই আলো জ্বালতে হবে।'

'কেন, তিনি কোথায়?'

'ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন। আজ রাত্রে শিলিগুড়িতে থাকবেন।'

'সে কী! তুমি একা থাকবে নাকি এত বড় বাড়িতে?'

'কেন? এটা তো আর বরাহনগর নয়। তা ছাড়া কাঞ্ছি আছে ও-পাশে।' কিন্তু সুব্রতর এটা ভাল লাগছিল না। এই শহরে কোনও ঘটনা ঘটেনি মানে এই নয় যে কখনও ঘটবে না। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? তিস্তা সুব্রতর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবে না, আবার সুব্রতকে এখানে পাহারাও রাখবে না। দরজা খুলে তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল। তার বাঁ-হাত সুইচে, কিন্তু আলো জ্বলছে না। এখানে লোডশেডিং হয় না বলা চলে। তিস্তা বিরক্ত গলায় বলল, 'আলোটার আবার কী হল আজকে!'

'মেইন সুইচটা কোথায়?'

'কেন?'

'ফিউজ তারটা পাল্টাতে হতে পারে।'

'তুমি এ-সব জানো?'

সুব্রত উত্তর দিল না। তিস্তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলতে লাগল। পাশের ঘরে সেটাকে পাওয়া গেল। লক নামিয়ে আঙুল দিয়ে স্ক্রু খুলে দেখল, সন্দেহটা ঠিক। এখন তার পাওয়া যায় কোথায়? সে তিস্তাকে কথাটা বলতে এক-টুকরো জোগাড় হল। ঠিকঠাক করে দিতেই আলো জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধিয়ে। তিস্তা বলল, 'ধন্যবাদ।'

সুব্রত বলল, 'শুকনো ধন্যবাদে চিড়ে ভেজে না। চা খাওয়াতে হবে।'

তিস্তা বিব্রত গলায় জবাব দিল, 'এত রাত্রে চা খেতে হবে না।'

'এমনকিছু রাত হয়নি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে চটির শব্দ পাওয়া গেল, 'কৌন?'

দ্রুত সুব্রতকে ও-পাশের ঘরে ঠেলে দিল তিস্তা, 'কে? কাঞ্ছি?'

'জি মেমসাব।'

'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

'জি।'

'শুয়ে পড়ো তুমি।'

এই ঘরে চমৎকার জ্যোৎস্না কিলবিল করছে। এটাই যে তিস্তার শোওয়ার ঘর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। টেবিলে যে ফ্রেমের ছবিতে তিস্তা হাসছে তা চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়। কিছুক্ষণ বাদেই তিস্তা এল, বেশ নার্ভাস গলায় বলল, 'এটা কী করলে বলো তো? যদি দেখে ফেলত!'

'আফটার অল তোমাদের ঝি। ওকে ভয় করার কী আছে?'

'মিসেস সোম জেনে যেতেন। ব্যস হয়ে যেত!'

'পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন চা খাওয়াও।'

'দোহাই, প্লিজ, আজ আর বায়না কোরো না। বিয়ের পর তুমি যত চাও, তত চা করে দেব।' দ্রুত এগিয়ে এসে তিস্তা যেন অনুনয় এবং প্রতিজ্ঞা করল।

মজা লাগছিল সুব্রতর। এই প্রথম তিস্তাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে এমন। সে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে বুকে টানল, 'তা হলে অন্য-কিছু খাওয়াও।' তিস্তার যেন উভয়সংকট। কোনওরকমে বলল, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তাড়াতাড়ি খাও।'

সুব্রত তিস্তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। উষ্ণ, জবাফুলের কেশরের মতো গভীর নরম স্বাদ। ঠোঁট সরাচ্ছিল না সুব্রত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাসফাঁস করতে লাগল তিস্তা। কিন্তু সুব্রত তার কাঁধ দু-হাতে আঁকড়ে রেখেছে, মুখের চাপে মুখ। কোনওরকমে ঠোঁট সরিয়ে তিস্তা বলল, 'রাক্ষস। এ-ভাবে কেউ চুমু খায়?'

'কীভাবে খায়?' তিস্তার শরীরের গন্ধ এবং ঠোঁটের স্বাদ সুব্রতকে ক্রমশ উষ্ণ করে তুলছিল। সে তিস্তার গলায় ঠোঁট রেখে শুধাল, 'এইভাবে?'

দু-হাতে ওর শরীরের কাঁপন অনুভব করল সুব্রত, তিস্তা অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'জানি না।'

'তিস্তা, তোমায় না-পেলে আমি মরে যাব।'

'লক্ষ্মীটি, অধৈর্য হোয়ো না, আর-কটা দিন অপেক্ষা করো, প্লিজ।'

'কেন, এখন নয় কেন?'

'এখন যদি সব নিয়ে নাও, তা হলে বিয়ের পর আমি তোমাকে কী দেব? আমি তো আর নতুন থাকব না।' দু-হাতে সুব্রতর মাথা নিজের বুক থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হেরে যাচ্ছিল তিস্তা।

'আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যে-দিন আমরা ভালবেসেছি সে-দিনই তো বিয়ে। এতদিন আমাদের কালরাত্রি গেল।' দু-চোখে শুধু তিস্তা আর তিস্তা। ওর বুকের গভীর খাদে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সুব্রত। জামার ধাতব বাঁধনকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

'এই, আমার জামা ছিঁড়ে যাচ্ছে!'

'যাক। বদলে একহাজার জামা দেব।'

বাইরের আবরণ যখন ঘুচল, তখনও ভেতরের আগল সুকঠিন। সুব্রত আনাড়ির মতো তার জট খুলতে ব্যস্ত। একটু-একটু করে তিস্তার শরীর শিথিল হয়ে এসেছে। শেষবার বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে না?'

'ফিরব।'

'না।'

'মানে?'

'এই রাত্রে এ-সব করে তুমি ফিরে যেতে পারবে না।' খুব স্পষ্ট এবং দৃঢ় গলায় উচ্চারণ

করল তিস্তা। চমকে মুখ তুলল সুব্রত। এ কোন তিস্তাকে দেখছে সে! মুহূর্তের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল, 'কিন্তু বীরহাহাদুর...।'

'আমি কিছু জানি না। আমাকে জাগিয়ে তুমি চলে যেতে পারবে না।'

মুহূর্তে যেন হাজারদুয়ারির সবকটি দরজা হাট করে খুলে গেল। কিংবা, এমনও বলা যায়, সমুদ্রের দ্যাখা পেয়ে নদী যেমন অদ্ভুত শান্ত এবং ভরাট হয়, তেমনি সুব্রতর দুই হাতের বাঁধনে তিস্তা টল-টল করছিল। বুকের বন্ধনী মুক্ত করতে বিব্রত যখন সুব্রত, তখন তিস্তা কপট গলায় জানাল, 'তুমি সত্যি আনাড়ি।'

'ছিলাম। কাল থেকে থাকব না।' সুব্রত দেখল অভ্যস্ত হাতে তিস্তা বন্ধন-মুক্ত হল। চোখের সামনে পাকা বেলের স্বর্ণাভা, আধারচ্যুতির জন্যে কিছুটা নিম্নমুখী, কিন্তু চমৎকার। সুব্রত শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। জননীর মতো তাকে আশ্রয় দিল তিস্তা। তার শরীর কাঁপছে, ঈষৎ বেঁকে সে মুখ নামাল সুব্রতর ঘাড়ে। 'আমাকে মুক্ত করে নিজে সেজেগুজে বসে আছ!'

পাউডার, না অন্য গন্ধ, সুব্রত জানে না, কিন্তু মুখ তুলতে ইচ্ছে না-হলেও, সে তুলল। তিস্তা বলল, 'না, এখন থাক।'

শৈশবে মায়ের স্মৃতি অথবা পথে-ঘাটে দেখা সুন্দরীর বক্ষ এতদিন যে-আকর্ষণ করত, তা এখন হাত এবং মুখের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ। সুব্রত জানছিল সুখ কাকে বলে। পৃথিবীতে কতরকমের সুখ রয়েছে, কিন্তু এই সুখ চিরকালের না-হলেও চিরকালই মানুষেরা পেয়ে এসেছে।

তিস্তা বলল, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি গো!'

সুব্রত জবাব দিল বুক এবং পেটের জমিতে মাথা রেখে, 'আমিও।'

'তুমি আমাকে কী দেবে?'

'জানি না। তবে তারা কিংবা চাঁদ পেড়ে আনতে পারব না।'

হাসল তিস্তা, 'তুমি আমাকে তোমার মতো একজনকে দিয়ো।'

'এটা একটু বোকা-বোকা কথা হল না?'

সুব্রতর গলায় এখন সেই ঠাট্টা। তিস্তা আদুরে হল, 'হোক, আর কেউ তো শুনছে না।'

সুব্রতর মনে হল, সন্ধেবেলার ওই চরিত্রদুটোর সংলাপ কি তিস্তার কথাই, অন্য সবাই শুনছিল বলে বোকা-বোকা হয়ে গিয়েছিল? তিস্তার হৃৎপিণ্ড তখন সুব্রতর কানে শব্দ তুলল, ঠিক-ঠিক।

আয়োজন সম্পূর্ণ। জ্যোৎস্নার আলো এখন মশারির মতো মোহিনী।

তিস্তা ডাকল, 'এসো।' তিস্তা এখন একটু-একটু করে গলে-গলে শেষ ঢেউয়ের প্রতীক্ষায়। মাতাল, মদ না-খেয়েও মানুষ যখন সবচেয়ে বেশি মাতাল হয়, তেমনি, সুব্রত নিজেকে মুক্ত করে বিলিয়ে দিতে এবং গ্রহণ করতে হাত বাড়াল।

তিস্তা চাপা গলায় বলল, 'পর্দাটা টেনে দাও, জ্যোৎস্নাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।'

সে-কথায় কান নেই সুব্রতর। তিস্তার শরীর থেকে শেষ আবরণ সরিয়ে ফেলে সে যখন

তীব্রতর হল সেই মুহূর্তেই নজর স্থির হল। ও কী! পলকেই সমস্ত শরীর স্থির। যেন আচমকা বরফ ঘষে দিয়েছে কেউ। নিজের অজ্ঞাতেই শিরারা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তিস্তা অসহিষ্ণু হল, 'কী হল, এসো?'

সুব্রত চোখ বন্ধ করল। তার শরীর ততক্ষণে তলানিতে এসে ঠেকেছে। চোখের পাতায়, এমনকী এই বন্ধ চোখেও, বিশ্বচরাচর জুড়ে, এখন তিস্তার নরম তলপেট। সেখানে সরু-সরু ক্রিমির মত সাদা-সাদা দাগ জ্যোৎস্নায় ঠাস হয়ে আছে। ওপর থেকে নিচে ফাটা-ফাটা হয়ে আছে জঠর।

তিস্তার গলা কানে এল, 'কী হল?'

চোখ খুলল সুব্রত। ওই শরীর তার নয়। কোনও ডাক এই মুহূর্তে শরীরকে চাকর করতে পারছে না। এতদিন যে-তিস্তাকে সে কামনা করে এসেছে এখন চেষ্টা করলেও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই। সাদা দাগগুলো কিলবিল করছে সামনে। বরাহনগরের মেয়ের চুপচাপ প্রতারণাকে উপেক্ষা করার সাধ্য তার শরীরেই নেই। বুকের মধ্যে টনটন করছিল সুব্রতর।

আর তখনই তিস্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দ্রুত হাতে কাপড় সংযত করে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে চলল একটানা।

সুব্রতর মনে হল, তিস্তা তার বুকের কান্নাটাকেও চুরি করে নিয়ে কাঁদছে। ●



শতাব্দী

হ্যাঁরে বদ্যিনাথ, দাদা কি চলে গেছেন?

—হ্যাঁ বউদি, এই তো মিনিট-দশ হল।

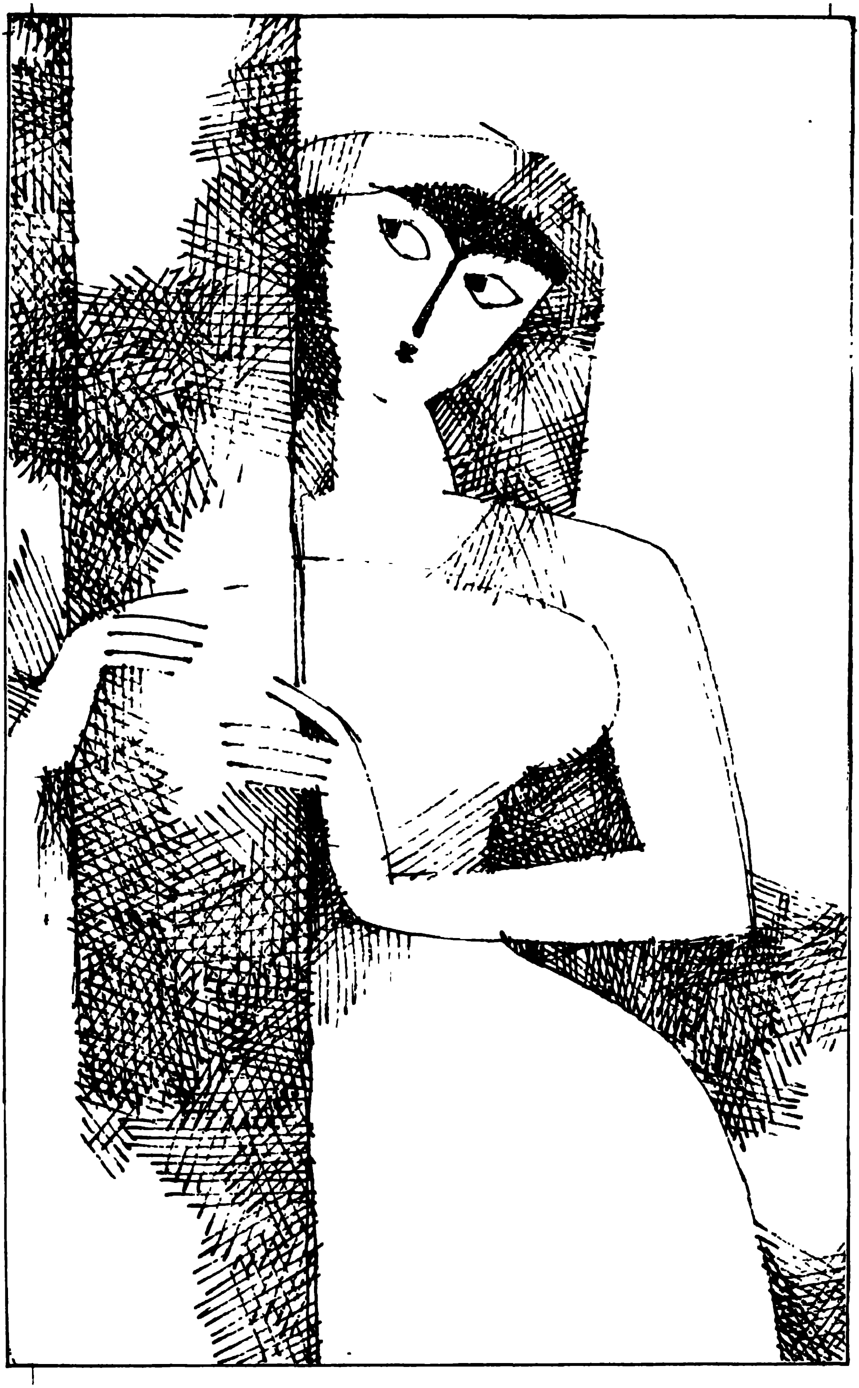
মায়া রান্না করে খেতে দিয়েছে, বদ্যিনাথ চানের জল দিয়েছে। সে চলে গেছে। ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা। তাকে এত কামড়ায় কেন? সে তো এমনটাই চেয়েছিল। ভাল তত্ত্বাবধায়ক সে, সবাই বলে, সে নিজেও জানে। গুছোনো পরিচ্ছন্ন সংসার। এ-দিকের জিনিস ও-দিক হতে পায় না। আলমারির পাল্লা খুললেই হ্যাঙারে পরপর শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে, বার করে নিক যেটা ইচ্ছে। বাথরুমের আয়না খুললেই দাড়িকাটার সরঞ্জাম পর-পর। র‍্যাকে পাটভাঙা তোয়ালে। জুতোর র‍্যাকে চকচকে জুতো। খেতে বসার দু-মিনিট আগে টেবিলে তিন-পদ রান্না সাজানো, যা চাও তা-ই। ঘি খাবে, না মাখন খাবে? বেশ তা-ই। রোজ নয়? মাঝে-মাঝে? ঠিক আছে, সপ্তাহে একদিন কি দু-দিন। নিমপাতাভাজা আলু দিয়ে মেখে একদিন, বেগুন দিয়ে একদিন? একদিন নিমঝোল? ঠিক আছে। মাছ গরম-গরম ভাজাটাই সকালে ভাল লাগে? সব দিন ভাত নয়? অর্ধেক দিন রুটি। তবু যদি মন না-ওঠে? ঠিক এই সময়টাই যে আমার চানের সময়, নইলে চুল শুকোবে না। চুল না-ভিজোলে বড় মাথা ধরে। ভিজে চুল নিয়ে বেরোবার প্রশ্ন নেই। তবে কি চুলটাই কেটে ফেলব! ডানহাতে যেন নাচের মুদ্রা করে পেছনের চুলের গোছা সামনে আনল শাওনি। খানকটা কেটে ফেলেছে। কিন্তু যা আছে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে বেশ সচেতন সে। যতখানি সম্ভব যত্ন নেয়। এই চুল কেটে ন্যাড়া-বোঁচা? আজকাল অর্ধেক মেয়েই এ-রকম। সেই জন্যেই আরও জেদ তার। চলতি ফ্যাশনের পেছনে সে ছোটে না। তার হল স্টাইল—এমনই একটা ধারণা তার আছে। খুব অমূলক কি? ছোট-চুলেরাই তো উচ্ছ্বসিত হয়—ইস শাওনিদি, কী সুন্দর তোমার চুল! দেখলে হিংসে হয়।

—হিংসে হওয়ার কোনও কারণ নেই, ভাই। নিজেরাও রাখতে পারতে অনায়াসেই। ফ্যাশন করবার জন্যেই মাথা মুড়িয়েছ।

—আজকাল সব দরকারের ফ্যাশন, সুবিধের—তা জানো তো শাওনিদি? চুল ছোট হতে-হতে আর আছেটা কী? সামনেটাই একটু ঝাঁপালো। পেছনটা তো টিকটিকির ল্যাজ। তা ছাড়া বিচ্ছিরি কোঁকড়া।

—বিচ্ছিরি কোঁকড়া? কী যে বলো! কোঁকড়া চুল দেখলে তো পাগল হয়ে যেতাম আমরা। ন্যাচারাল কার্লস! তার তুলনা আছে?

—ধ্যাৎ, একরকম, সব সময়ে মাথাটা একরকমের দেখতে থাকবে। বোরিং-টু-দা পাওয়ার-ইনফিনিটি। প্রার্থনীয় হল সোজা চুল, বা সামান্য ওয়েভি। তোমারটায় সেই সামান্য



ওয়েভ আছে। চুলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই মুগ্ধ পুরুষের সময় কেটে যাবে।

এইবারে কঠিন হয়ে যায় শাওনির ঠোঁটের রেখা। চোখের পাতা। চোয়াল। চিবুক। কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কী লাভ! পুরুষ! পুরুষ! পুরুষ! সবাই যে যেখানে আছে ঠারেঠোরে বলে যাচ্ছে পুরুষের মনোযোগই মেয়েদের সব, পুরুষ একবার তাকালে মেয়েরা কৃত-কৃতার্থ হয়ে যাবে। বিজ্ঞাপন বলছে, সিনেমা বলছে, লোভনীয় মোহনীয় চিত্রভাষ্য বলে যাচ্ছে। পুরুষেরও নারীর মনোযোগই কাম্য, টেক্সটাইল কোম্পানি, মদ-বিক্রেতা এরা সে-কথাও বলছে। হোক সে নারীডাক-মেয়ে, পার্টি-প্রজাপতির ছদ্মবেশে পণ্যস্ত্রী। কিন্তু এই মনোযোগটা স-ব এমন কথা বলতে চাইলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কেউই গুরুত্ব দেবে না এমন ভাবনাকে। অথচ এই মেয়েগুলো! ত্রিশ-ছুঁই-ছুঁই কিংবা সবে-ত্রিশ-পার, যৌবন যাদের এখন কস্তুরীমৃগের মতো করে রেখে দেবার কথা। তারা কারণে-অকারণে পুরুষের মনোযোগের কথা বলে। যদি না-বলে তো ভাবে অন্তত‌পক্ষে। ডিসগাস্টিং!

—কী হল শাওনিদি, রাগ করলে?

—তোদের ওপর রাগ করে লাভ?

—কেন, তুমি স্বরূপদার মনোযোগ চাও না?

—স্বরূপদার মনোযোগ আর পুরুষের মনোযোগ এক হল?

—আচ্ছা, বেশ, তুমি পথ-চলতি পুরুষের প্রশংসার চাহনি চাও না? একটু অ্যাপ্রিসিয়েশন? একটু মুগ্ধতা? খুব খারাপ? সেটা? একটা সভা-সমিতি কি উৎসবে সাজগোজ করে গেছ, কেউ তোমার দিকে চাইল না, চোখ দিয়ে কেউ বলল না, দাউ আর্ট বিউটিফুল, খুব খুশি হবে তুমি শাওনিদি? সত্যি কথা বলো তো?

—তোরা মুড়ি-মুরকির, রসবড়া-রসগোল্লার ডিফরেন্স ধরতে পারিস না, কী-ই-বা বলব তোদের? তবু চেষ্টা করছি বোঝাতে, শুধু পুরুষ কেন, মেয়েরাও কি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে জানে না? তারা করলেও আমার তৃপ্তি। আর যে-পুরুষ আমাকে ছেড়ে আমার চেহারার দিকে চেয়ে থাকবে, তাকে তোরা মুগ্ধই বলিস আর হ্যাংলাই বলিস সে আমার চোখে ছোট হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে আমি আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে দু-দণ্ড ভাবব, কী ছিল সেই সাজগোজে যা আমার নিজেকে আড়াল করে দিল?

—ওঃ, শাওনিদি প্লিজ, ফিলজফিক্যাল কথাবার্তা বোলো না। তোমার রসবড়া-রসগোল্লার তফাত কজন ধরতে পারে গুনে দেখো তো!

আর বেশি কথা বলে না শাওনি। কী দরকার বাবা? এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে শাওনিকে নিয়ে হাসাহাসি ফাজলামি করবে হয়তো। কাউকে প্রভাবিত করবার নেত্রীসুলভ বা গুরুসুলভ ইচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব কোনওটাই নেই তার। নিজের ধারণামতো নিজে চলতে পারলেই সে যথেষ্ট মনে করে। নিজে...আর...আর...সে যাকে জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করেছে, যে তাকে জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করেছে। পারস্পরিকতায় যে স্বীকৃত, সেই সে যদি তার ধারণাগুলোকে মান দেয় তাতেই সে খুশি থাকবে, বর্তে যাবে। আর কী চাওয়ার আছে জীবনে? একখানা ফ্রস্ট-ফ্রি রেফ্রিজারেটর, একটা চার-চাকার যান, একটা কাপড়কাচা কল,

একটা বিদেশি প্রযুক্তিজাত টেলিভিশন সেট এগুলো তো ঠিক চাওয়ার জিনিস নয় জীবনে? এগুলো জীবনযাত্রার উপকরণ। যে মনে করে লাগবে, না-হলেই চলবে না, তার কাছে উপকরণ হিসেবে এগুলোর দাম বেশি। যার মনে হয় না-হলে চলে যায়, তার কাছে এগুলো অবান্তর। শেফালি সমাদ্দার বলে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার একবার মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। তিনি জ্যোৎস্নারাতে নর্মদাবক্ষ থেকে মার্বলরকের সৌন্দর্য দেখতে-দেখতে বলে উঠেছিলেন—খুব সুন্দর, না মিসেস সরকার? কিন্তু জীবনের উচ্চাশার কতটা এর জন্যে স্যাক্রিফাইস করেছি, তা জানেন?

—কতটা? চোখ মার্বেলরকে গচ্ছিত রেখে শাওনি আলগা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

—বোন চায়নার একটা ডিনারসেট, কমপ্লিট উইথ কাটলারি। অবশ্যই রুপোর। সেটটা বিদেশি। উফ্‌ফ্—ভাবলে ভেতরটা যেন কেমন হয়ে যায়! হল না। মেয়ে, আমার ওই হাইস্কুলে-পড়া মেয়ে, জব্বলপুর আসবেই! আসতে হবেই। আরে, ধৈর্য ধরে স্টার টিভিটা দ্যাখ না, কত প্রোগ্রাম করছে আজকাল দেশ-বিদেশের ওপর। না, যাবই। লাইভ দেখব। তা দ্যাখ, জোছনাও প্রতি শুক্লপক্ষে ঝরছে, আর মার্বলরকেরও পাখা নেই। যে-কোনও সময়ে দেখা যাবে। চারবছর পরে বিয়ে লাগিয়ে দেব, হনিমুনে যাস না-হয়। কিন্তু অমন ড্রেসডেন চায়না? আর কি পাব?

শাওনির মনে হল ভদ্রমহিলা যে ফোঁস করে নিশ্বাসটা ফেললেন সেটা গাড়ির এগ্‌জস্ট দিয়ে বেরনো কালো কার্বন-মনোক্সাইডের মতো। নর্মদার জোছনাকে কালো করে দিচ্ছে। সুজিত বলে এক বন্ধু আছে শাওনির। খুব ভগবানে বিশ্বাস করে। সে প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার সময়ে প্রার্থনা করে—হে ভগবান, আমার যেন একটা ফোর-হুইলার হয়।

সুজিতটুজিতের কথা বলে লাভ কী! খোদ শাওনির ঘরেই এইজাতীয় একজন মজুত আছে। প্রোমোশনের সঙ্গেই আসল গাঁটছড়াটা বেঁধেছে মনে হয়। বারোবছর আগে যখন ঘর বেঁধেছিল? মনে হয়েছিল...। না, মনে হওয়ার কথা ভেবে কোনও লাভ নেই! মনে হওয়া জিনিসটা এত ব্যক্তিগত যে তার ওপর নির্ভর করে জীবনের কিছুই চলে না। কিন্তু...কত কোমল ছিল তখন স্বরূপের মুখ! কত ভাবুক ছিল তার চাউনি। কত আদর ছিল দু-হাতে। সুবিচার ছিল ব্যবহারে। স্বরূপ তখন শাওনিকে তার প্রিয় বন্ধু ভাবত। এখন? এখন ভাবে না। শাওনির সম্পর্কে ভাববার তার সময় নেই। যদি বা ভাবে তা হলে শাওনি এখন তার স্ত্রী। ঘরণী-গৃহিণী। খুব খারাপ লাগে খারাপ কথা বলতে, ভাবতে। কিন্তু...কিন্তু শাওনি এখন স্বরূপের মেয়েমানুষও কি? একটা সীমাহীন অন্ধকারে ভরে যেতে থাকে ভেতরটা। অন্ধকার, গ্লানি। শিক্ষা...বুদ্ধি...সর্তকতা...ভালবাসা কিছুই শেষপর্যন্ত কাজে লাগে না জীবনে। তারা কি পরস্পরকে বোঝেনি? সে আর স্বরূপ? দু-জন প্রাপ্তবয়স্ক, ডিগ্রিধারী, চাকুরি-প্রাপ্ত যুবক-যুবতী? স্বরূপ বলেছিল—তোমাকে আমি সুখে রাখব, শাওনি। তুমি আমাকে প্রেমে রেখো।

—আর তুমি? তোমার বুঝি আমাকে প্রেম দিতে লাগবে না?—শাওনি হাসছিল। কত বিশ্বাস তখন জীবনে।

—প্রেম প্রথম শাওনি, তারপর সুখ।

—আমিও তোমাকে সুখে রাখব। দুধে-ভাতে।

এই দেওয়া-কথার অর্ধেকটা তারা রেখেছে। পরস্পরকে তারা সুখ দিয়েছে।

স্বরূপ প্রথম দিল টেলিভিশন সেট। দামি। রঙিন। তারপর দিল ফ্রিজ। প্রশস্ত, দু-কপাট, সুন্দর। তারপরে দিল ভিসিপি। তারপরে একটা চমৎকার সাততলার ফ্ল্যাট। তারপর তেজি স্কুটার। মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ-অভেন, ওয়াটার পিউরিফায়ার, ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন...শাওনি? শাওনি দিয়েছে পুষ্টিকর, রুচিকর, নিত্য-নতুন খাদ্য, ধবধবে জামাকাপড় হাতের কাছে, মুখের কাছে চা, কফি, মশলা, চকচকে জুতো, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের জন্য আপ্যায়ন, ইদানীং দিচ্ছে ড্রিংকস নরম এবং কড়া। দিচ্ছে না শুধু যান্ত্রিকভাবে নিজেকে। স্বরূপ বুঝতে চায় না প্রাণের টানে, প্রেমের টানে যে-চাওয়া, সে-চাওয়া চাইতে পারলেই শাওনি আছে। আছে নিবিড়, ভরাট অথৈ দিঘির জলের মতো, আছে উর্বরী মৃত্তিকার পেলব অভ্যন্তরের মতো, অনন্ত কুয়োর জলে পড়ে-থাকা চাঁদের মতো।

সম্ভবত এ-সব আর চায় না স্বরূপ। তার বড্ড তাড়া। তা ছাড়া, সে জানে দাম দিলাম কিনলাম এনে ফেললাম। ব্যস। আবার কী? এক জিনিস যেমন বার-বার কেনার পরিশ্রম সয় না, এক মানুষকেও তেমনি বার-বার জয় করা লাভ করা এ-সব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে। ঠিক আছে। তা হলে বদ্যিনাথ চানের জল দিক, মায়া খেতে দিক, আলমারির পাল্লা খুললেই পরপর শার্ট, ট্রাউজার্স, টাই, র‍্যাকে ব্রাউন, কালো জুতো, পালিশে নিশপিশ করছে। তা ছাড়া এ তো কোনও প্রতিশোধ নয়। এটা একটা সুবিধের বন্দোবস্ত। এর মধ্যে শাওনির কোনও রাগ নেই। এমন নয়, সে লোকজনের হাতে স্বরূপকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। এ একটা আবশ্যিক ব্যবস্থা। সে-ও তো একটা চাকরি করে! প্রোমোশনে-প্রোমোশনে ছয়লাপ না-হলেও ভালই চাকরি। সৃষ্টিসুন্দর, সন্তোষজনক। এ নিয়ে স্বরূপের সঙ্গে তার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। স্বরূপ হয়তো বলতে পারে—তোমার বেরোবার সময় বরাবর একই ছিল। আমারও। তখন তুমি আমার সঙ্গে খেয়ে নিতে। মাঝে-মাঝে যেমন বেণী তেমনি রবে-র অত্যাচার তোমার সইত। তুমি চুল ভিজোতে না। তা হলে?

কিন্তু এ-কথা বলার অধিকার কি স্বরূপের আছে আর? অধিকার তো আলাদা কথা, মানসিকতা? মানসিকতা আছে তার এ-কথা বলার? যদি বলে তবে সেটা হবে না কি চূড়ান্ত হিপক্রিসি!

সে কি বলে না শনিবার ব্যান্ডেল লোক্যাল ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়ার সেই আনন্দ একটা অপ্রয়োজনীয় রোমান্টিক ভাববিলাস! শনিবার তাকে হিতেশের বাড়ি ছুটতে হবে। হিতেশের একটা পি সি আছে বলে। বহু কাজ, বহু কাজ। এখন। দু-জনে মিলে করবে। ডিগ্রিতে যা নেই, কাজের আগ্রহে, দক্ষতায় তা পুষিয়ে দিতে হবে তাকে। হবেই। নইলে নেক্সট প্রেমোশন ফসকে যাবে।

এ-দিকে সুসময় যে ফসকে যাচ্ছে, জীবন যে ফসকে যাচ্ছে, সে-চেতনা ওর আর নেই। সন্তান ও চায় না। একদম গোড়ার দিকেই বলে দিয়েছিল বাচ্চাকাচ্চা, ও-সব ভুলভাল ব্যাপার। সেটাতেই এখনও সেঁটে আছে ও।

শাওনি অবশ্য বাচ্চা না-থাকা বা থাকাটাকে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা ইস্যু করে তুলতে চায়নি কখনও। পত্রিকাটা হোক ছোট। তবু তার সহ-সম্পাদিকার কাজটার মধ্যে তার মনের এমন-একটা মুক্তি সে এখনও পায়, যে নিজেকে সার্থক মনে করতে অসুবিধে হয় না। বাড়িতে দু-জনেই চাকরি করলে বাচ্চা আনাটা বাচ্চার প্রতি অবিচার এই ধারণাটাও ছিল তার খুবই শক্তিশালী। নিজের ছোটবেলার কথা স্মরণ করে। তবু তো তার মা কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। দশটা-পাঁচটা নয়! কিন্তু যতক্ষণ বাড়িতে একা, লোকের কাছে ততক্ষণ সে যে কী অসহায়বোধ! স্কুলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যদি বা সেটা কাটত, বাড়ি ফিরে মা-হীন বাবা-হীন বাড়িতে ঢোকবার কথা মনে হলেই গা ছমছম করত। শাওনি চায়নি আর-কোনও বাচ্চা তার মতো কষ্ট পাক। তারপর স্বরূপ? স্বরূপের এই চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি তাকে বাবা হবার অধিকারচ্যুত করেছে। একেবারে নিশ্চিতভাবে। পাঁচবছরের শাওনির ধুন্ধুমার জ্বর, ডাক্তার সন্দেহ করছেন এনসেফেলাইটিস। বাবা ট্যুরে। সাতদিনের আগে আসবেন না। বেশিও হতে পারে। দুপুর রাত। একটা লোক নেই। মা পাশে জলের গ্লাস রেখে বাড়ি চাবি দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের বাড়ি ছুটে যাচ্ছে। সেই ঘটনার আর কি পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত তার জীবনে?

চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাচ্চার জন্যে প্রস্তুত হতে পারত সে। কিংবা বাচ্চা জন্মাবার পর অসুবিধে বুঝে চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু স্বরূপ-শাওনি সরকারের বাচ্চা না-হলেও ভারতবর্ষের চলে যাবে—খাবার একটা মুখ, চাকরির একটা উমেদার কম থাকবে, এটা যেমন শাওনি ভুলতে পারে না, তেমনই ভোলে না সন্তান তাকে পূর্ণতা দেবেই এমন-কোনও গ্যারান্টি নেই। তার অধ্যাপিকা-মা, সেলসম্যান-বাবা তো দৌড়োদৌড়ি করে তাকে মানুষ করেছেন, কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে পঞ্চান্ন বছরের পরিশ্রমজীর্ণ মাকে কি তার বুড়ো মনে হত না? মনে হত না মা গত যুগের মানুষ, ক্রমেই রক্ষণশীল হয়ে যাচ্ছে, স্বরূপকে মায়ের তেমন পছন্দ হয়নি বলে কি সে মায়ের ওপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেনি? বাবা গত হয়েছেন, মা একলা এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকতেন শেষটায়। যেত, মাঝে-মাঝেই যেত, কিন্তু তাদের দু-জনের সংসারে কি মাকে ঠাঁই দিতে কখনও ডেকেছে? স্বামী-স্ত্রীর সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি থাকা ভাল না, স্বরূপের এই নীতিতে কি সে সায় দ্যায়নি? আর স্বরূপের ব্যাপার তো আরও খারাপ। স্বরূপের বাবা-মা দু-জনেই জীবিত। এই শহরেরই প্রান্তে থাকেন, ভাইঝির বাড়ির একতলায়। স্বরূপ সেই খুড়তুতো দিদি-জামাইবাবুর ওপর মা-বাবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। টাকা-পয়সা পর্যন্ত দ্যায় না। বাবা-মার তো যা-হোক কিছু সঞ্চয় আছে, পেনশন আছে, কী দরকার। যেন দরকারই সব। দরকারের ওপরে কিছু নেই। বিশেষ-বিশেষ সময়ে মনে করে উপহার, স্বরূপের মনেও থাকে না। সে তো শাওনিরই দায়।

অবশ্য এ-সব কথা তার সম্প্রতি মনে হয়। বিবাহের বারো বছর পর। শ্বশুর-শাশুড়ি এখন দূর গ্রহের মানুষ। নিজের মা মরে বেঁচেছেন। ছেলে-মেয়েদের থেকে তাঁদের কিছু পাওয়া হয়নি এগুলো এখন, আজকাল, মাঝে-মাঝে জ্বলন্ত লোহার ছ্যাঁকার মতো বুকের মাঝখানে লাগে। জ্বলতে থাকে বুকটা। এ-সব ভুলের ক্ষমা নেই। শুধরে নেওয়ার উপায় নেই। সে শুধু

বুঝতে পারে ছেলে-মেয়ে তাকে পূর্ণ করবে এমন-কোনও গ্যারান্টি নেই। নতুন-কোনও ব্যথা-বেদনার উৎস তৈরি করে কী লাভ! উপরন্তু স্বরূপের সাধ্য, ইচ্ছে, স্বরূপের সঙ্গে তার সম্পর্কের চিরত্ব এগুলোর ওপর তার বিশ্বাস খুব পোক্ত নয়, এটা সে বুঝতে পারে। আর স্বরূপ বোধহয় এখনও তার নিজের মানসিকতায় স্থির। বাচ্চাকাচ্চা, ও-সব ভুলভাল ব্যাপার।

—অফিসে বেরোবার সময়ে বলে বেরোও না কেন? কথাটা বলেই শাওনির মনে হল সে ভুল করল। জিজ্ঞাসার ফ্রেমে না-রেখে অন্যভাবে বলা যেত কথাটা। বলে বেরোলে পারো—এটা বললেই ভাল হত। সোজাসুজি জিজ্ঞাসাটা যেন একটা দ্বৈত সমরে আহ্বান।

—বলেই তো বেরোই। স্বরূপ টিভি-র পর্দায় চোখ রেখে বলল। সিগারেটটা মুখের একপাশে চালান দিয়ে।

—কখন আবার বলো?

—চান করলুম, জামাকাপড় পরলুম, খেলুম, জুতো পরলুম—বলা আবার কেমন হবে? যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর, যেমন কর্ম তেমন ফল—শাওনি ভাবল। পত্রিকাটার পাতায় তার চোখ, কিন্তু সে কিছুই পড়ছে না।

—চুমুটুমুও খেতে হবে না কি?—পার্টিং কিস?

আপাদমস্তক রাগে লাল হয়ে গেল শাওনি। এত তিক্ততা? এতটা সিনিক এই লোকটা? সে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে এল। পাখাটা চালিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। শীত-শীত লাগল। পাখা বন্ধ করে দিল। খুবই স্পষ্ট যে সে আঘাত পেয়েছে। কিন্তু স্বরূপ সরকার একবারও ডাকল না, একবারও এল না বারান্দায় বা ঘরে। নিজের ভঙ্গি বদল করল না। ঠিক যেমনভাবে সিগারেট হাতে-মুখে টিভি দেখছিল ঠিক তেমনভাবেই দেখতে লাগল। জঘন্য-জঘন্য বিজ্ঞাপন, তাদের অসম্ভব রূপকথাসদৃশ সুখের প্রলোভন। আদিখ্যেতা এবং মাঝে-মাঝে যতিচিহ্নের মতো সিরিয়াল, নতুন বোতলে পুরনো মদ। একই, সেই একই একঘেয়ে আখ্যান, একই চরিত্র, একই চরিত্রহীনতা।

খেতে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কোনওরকম দেখানেপনা তার অসহ্য। তাই সে উঠল। চোখে-মুখে জল দিল। অভ্যস্ত যত্নে খাবার পরিবেশন করল। তারপর রোজকার মতো দুখানা রুটিকে আট-টুকরো করল দু-হাতে ছিঁড়ে। চারটে টুকরো দুধের বাটিতে ফেলল। আর চারটে আলুকপির ছেঁচকি দিয়ে মুড়ে মুখে পুরতে লাগল একের পর এক, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু খাবারে তার কোনও স্বাদ লাগল না। ডাল নেবে কি না, মাছের কোন টুকরোটা তাকে দেওয়া হবে—এইসব টুকটাক প্রশ্নও সে রোজকার আলগা ভঙ্গিতে করল তার বরকে। কিন্তু তাতে না ছিল কোনও অন্তরঙ্গতা, না কোনও প্রাণ।

রাতে শুতে যাবার সময়ে সে ইচ্ছে করে অনেক দেরি করল। পড়ার ঘরে পত্রিকা স্তূপীকৃত হয়েছে। খবরের কাগজগুলোর রবিবারের পাতা। একটার পর একটা খুলে সে পড়তে লাগল দাগিয়ে-দাগিয়ে। এটা তার দরকার হয়। একটা ডায়েরির পাতায় সামান্য কিছু নোটও করল সে। ঘড়িতে একটা বাজতে তার খেয়াল হল। দু-জনের একমাত্র শোবার ঘরে গিয়ে দেখল সবুজ আলোয় মাখামাখি হয়ে স্বরূপ ঘুমোচ্ছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যেও

এইভাবেই প্রথম বিচ্ছেদ সম্ভব করল শাওনি। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল কোটি-কোটি দম্পতি হয়তো এ-ভাবেই থাকে, এ-ভাবেই সম্ভব করে এ-সব। অন্তত এতকাল করেছে ভারতের মতো দেশে। সম্প্রতি আর করতে চাইছে না। উপায় বেরিয়েছে কিছু। একবিংশতিতে হয়তো আর-কেউই এ-সব সহ্য করতে চাইবে না। বিশেষত সন্তানের দায় না-থাকলে।

স্বরূপ বদলে গেছে। খুব বদলে গেছে। আগেকার প্রতিজ্ঞা সংকল্প এ-সব আর তাকে মনে করিয়ে কোনও লাভ নেই। সে-ভাবে আর ওর মনে পড়বেও না। কতকগুলো কথা মনে পড়াই তো আর মনে-পড়া নয়। তার পেছনে বা তার সঙ্গে যে-আবেগ থাকে, অনুভূতির যে জটিল ঐশ্বর্য থাকে সেগুলোও মনে পড়তে হবে। নইলে নিতান্ত নিছক কতকগুলো কথার স্মৃতিতে বিশেষ-কিছু নেই।

সে? সে-ও কি বদলেছে? বদলেছে বইকী? পঁচিশ বছর আটত্রিশ হয়েছে। সে স্থির হয়েছে। হৃদয়ের কথা বলবার সেই ব্যাকুলতা তাকে ছেড়ে গেছে। প্রেম? আগে না-পেলেও দিতে পারত। উপছে পড়ত অতিরিক্তটুকু। উপছে-পড়ার আনন্দে মাতোয়ালা থাকত। কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত পেল কি না গ্রাহ্যই করত না। এখন করে। না-পেলে আর দিতে ইচ্ছে করে না। এমন নয় যে তার হাতের অঞ্জলিতে প্রেম ভরা আছে, সে মুঠি বন্ধ করে রাখছে। আসল কথাটা হল, উসকে না-দিলে প্রেম আর জন্মাচ্ছে না। ঠাণ্ডা জল জমা রয়েছে বুকে। তাকে তোমার উত্তাপে তাপিত করো তবে সে টগবগ করে ফুটবে, আর তখনই জন্ম হবে সেই রঙিন বাষ্প। অধরা, মাধুর্যময়, বায়বীয়, তবু বুকের মাণিক। নয়নের নিধি সেই ভালবাসা।

ভালবাসা কী? বড্ড ভাবে আজকাল শাওনি। কী সে-জিনিসটা? ভাবটা? সত্যিই ভাব তো? বিশুদ্ধ, বিমূর্ত? পাত্র-ব্যতিরেকে সে থাকে? এই যে সে ভেবেছিল স্বরূপকে না-হলে তার চলবে না, এটা তো ভুল। স্বরূপ কিংবা অরূপ কিংবা বিশ্বরূপ যে-ই হোক না কেন, তার রুচির পরিধির মধ্যে থাকলে বাকি ঘটনাগুলো পর-পরই ঘটত। এখন তো স্বরূপের বিশেষ-কোনও তাৎপর্য নেই তার জীবনে। স্বরূপের জীবনে শাওনিরই বা তাৎপর্য কী? কিচ্ছু না! ভালবাসা কি যৌবনেরই ধর্ম, আরও পরিষ্কার গদ্য করে বলতে গেলে শারীর রসায়ন? হরমোন-সম্ভব? স্বরূপের হরমোনেরা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে, মাত্র এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে? শাওনির হরমোনেরা কি বিরূপ? বিশেষজ্ঞ-ডাক্তারের কাছে যাবে না কি তারা? প্রেমের জন্যে? গেলেই ডাক্তার জিগ্যেস করবেন—নর্ম্যাল লাইফ লিড করছেন তো?

উত্তরে বলতে হবে—না, মানে হ্যাঁ। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার কোনও অভাব নেই। স্বরূপের তো নয়ই। সে একটা রোবো-মানুষের মতো কল-কবজা নাড়ে। শাওনিরও নেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে তার স্বরূপের আগেকার রূপ, আগেকার চেহারা মনে করতে হয়।

—স্বরূপ, স্বরূপ তুমি অমন করে চেয়ো না।

—তুমি অমন করে এলে কেন? নি। নি। তুমি কী পরেছ? কী করেছ আজ?

—কই, বিশেষ-কিছু তো পরিনি, কিছুই করিনি।

—তা হলে? তা হলে আমার ভেতর-অন্দর থেকেই যদি অমন চাউনি উঠে আসে...

—কী দেখছ তুমি? কী দেখতে পাচ্ছ?

—নি, আমার বলবার শক্তি নেই। এক প্রবল অনুভূতির তোড়ে সব হারিয়ে গেছে, সব ঘুরছে।

—কালবৈশাখীর মতো?

—অনেকটা। অনেকটা...হোল্ড ইয়োর টাং, ওহ্, ফর গড্স সেক...

কতদিন স্বরূপ তাকে 'নি' বলে ডাকে না। ডাকলেও বোধহয় ন্যাকা-ন্যাকা শোনাবে এখন। টাং হোল্ড করতে অবশ্য এখনও বলে। বলে কর্কশ, রূঢ় গলায়। আমি চলে যাব—ভেতর থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ত কান্নার মতো উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এল কথাগুলো। আমি চলে যাব!

কাকে বলল শাওনি? স্বরূপ তো সামনে নেই। সে এখন দিল্লি গেছে। কিন্তু এই ঘরে, বাড়িতে স্বরূপ আছে। আছে দেয়ালে, জানলায়, কড়িকাঠে, আছে আলমারিতে, ছবিতে, শয্যায়, চেয়ারে, টেবিলে, সোফায়, মোড়ায়। আলমারির পাল্লা খুলে সারি-সারি ঝুলন্ত পোশাকগুলোকে শাওনি বলল—চলে যাব। টেবিলের ড্রয়ার খুলে তাড়া-তাড়া কাগজপত্র নাড়তেচাড়তে বলে উঠল—যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি শিগগিরই। চান করতে শাওয়ার খুলে, ঊর্ধ্বমুখে জলের তরল আঘাত নিতে-নিতে, জোরালো গলায়, চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কিংবা নজরুলের দেশপ্রেমমূলক গানের প্রদীপ্ত সুরে বলে উঠল—যাব, আমি চলে যাব। যাচ্ছি আমি যাচ্ছি চলে, সকল ফেলে সকল ভুলে, যাব যাব, সব হারাব, ফিরব না আর ফিরব না গো, যাবই যাব।

চান সেরে বেরিয়ে, শাড়ি পরতে-পরতে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে, শূন্য ঘরে ঘুরতে-ঘুরতে, অন্যমনস্কভাবে ভাত খেতে-খেতে শাওনি দেখল, বা বুঝল এই বাসার সর্বত্র যেমন স্বরূপ আছে, তেমনই সে-ও আছে। কোণে-কোণে। ছবিতে, শয্যায়, চেয়ারে, টেবিলে, সোফায়, মোড়ায়, জানলায়, দরজায়, পর্দায়, পাপোষে...সর্বত্র। শাওনিকে 'চলে যাব' বলতে তার গলা আটকে গেল। ফিসফিসানির বেশি উঠল না গলাটা।

কিন্তু এমনই ভেতরে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছিল সে চতুর্দিকে-ছড়িয়ে-থাকা শাওনির মুখোমুখি হবার জন্য, সে মিনিবাসে অফিস যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে উঠল—যাব। একটু পরে আরও জোর গলায়। পাশের ভদ্রলোক চমকে ফিরে তাকালেন। একটু গুটিসুটি মেরে বসলেন। একটু সংযত সতর্ক হয়ে গেল সে। কিন্তু লজ্জা পেল না। মানুষ যখন তার জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোর মোকাবিলা করে তখন লজ্জা-সংকোচ এ-সব অতি তুচ্ছ মনে হয়। কী এসে যায় মিনিবাসের সহযাত্রী যদি তাকে ছিটগ্রস্ত ভাবেন? কিচ্ছু না।

ক-দিন ধরেই রাস্তা পার হচ্ছিল সে যান্ত্রিক অভ্যাসে। লাল আলো, হলুদ আলো, সবুজ আলো সমস্তই চেতনার ভেতরে জ্বলে, নেভে। ধাবমান, গর্জমান যান-মিছিল পার হয়ে, অফিসের দরজায় পৌঁছে চড়াৎ করে সে জ্ঞানে ফিরে আসে। সে কী? কখন সে রাস্তা পেরোল? বাস থেকে ঠিকঠাক স্টপে নামল কী করে? কখন কীভাবে সবটাই তার অজ্ঞাতে

ঘটে গেছে। হঠাৎ শিউরে ওঠে সে। যদি কোনও গাড়ি ওস্তাদ খেলুড়ের মতো তাকে হেড মারত? শূন্যে লাফিয়ে উঠে ফুটপাথের শানে কিংবা অন্য-কোনও খেলুড়ে গাড়ির সামনে পিছনে, নাকে মাথায় আছড়ে পড়ত! না, না, অমন সমাপ্তি সে চায় না। না, সতর্ক হতে হবে। অমন হারিয়ে গেলে চলবে না।

এই মেজাজেই কাঠের-পার্টিশন-করা মাঝারি অফিস-ঘরে ঢুকে সে শুনল মালিক জয়ন্ত শেঠ বলছেন—না, না, মিসেস সরকারকে আমি এ-প্রস্তাবটা দিতে পারি না। হতে পারে একটা কাগজ চালাচ্ছি। তার মানে হৃদয়টাও কাগজের মতো হয়ে যাবে? সুবীর, তুমি একটু ভাবো...

—কী প্রস্তাব? শাওনি সতর্ক চড়া স্বরে বলল এগোতে-এগোতে।

—কুপ্রস্তাব নয়, ঘাবড়াবেন না—সুবীর বলল হেঁকে।

আজ পনেরো বছর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সঙ্গে কাজ করছে, শাওনির এ-সব ইয়ার্কি গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষত সুবীর ছেলেটা খুব ভাল, মজাদার। কিন্তু জয়ন্তবাবুর সামনে? তিনি তো পরস্য পর। এদের মাত্রাজ্ঞান আর কবে হবে?

জয়ন্তবাবু হাসলেনও না, কথাটা শুনেছেন বলেও জানতে দিলেন না। কেজো গলায় বললেন—আসলে ওড়িশায় ছোট্ট করে একটা ব্রাঞ্চ খুলছি। লোক্যাল লোকই নেওয়া হবে। কিন্তু অভিজ্ঞ কারও যাওয়া দরকার। আপনার মতো। অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, এক্সপার্ট যাকে বলে। এইসব চ্যাংড়াদের কাজ নয়।—সুবীর ইত্যাদির দিকে নজরটা ঝাঁটা বুলিয়ে নিলেন তিনি—কিন্তু আপনি ভাববেন না। আমরা ভাবছি। আরও ভাবছি।

—যাব। আমি যাব।

—বলছেন কী, মিসেস সরকার? অফকোর্স ইটস আ প্রোমোশন। অ্যালাউয়েন্স বাবদও ভালই দেওয়া হবে। বাসস্থানের ব্যাপারে মহিলা গেলে আমরা একস্ট্রা কেয়ারও নেব। কিন্তু... এটা...মানে চট করে ফেরত আসতে পারবেন না।

—যাচ্ছি, আমিই যাচ্ছি। প্লিজ ডু দা নিডফুল।

নিজের ছোট কিউবিকলে ঢুকে গেল শাওনি।

হোয়াট?—আপাদমস্তক নাড়া খেয়ে চমকে থমকে বলে উঠল স্বরূপ।

—প্রোমোশন। পুরনো লোক নইলে নতুন ব্রাঞ্চ কে সামলাবে?

—তাই বলে...আর-কেউ ছিল না?...তুমি রাজি হয়ে গেলে?

—কী করব? চাকরি...তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। এরা ওয়েল-ট্রেন্ড। ঘাড়ে ধরে তাড়িয়ে না-দিলে কাজ ছাড়বে না। স্বরূপ কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল। বলল না। একটু পরে বলল—কতদিন লাগবে ব্রাঞ্চটা চালু করতে?

শাওনি বুঝল ও ভেবেছে ব্যবস্থাটা সাময়িক। সে কিছু ভাঙল না। বলল—দেখা যাক।

চুপচাপ টিভি দ্যাখা। এটিএন। অবিশ্রান্ত উদরী নাচ, নিতম্ব নাচ, অবিশ্রান্ত তাল-হ্যাঁচকা খিচুড়ি গান। স্বরূপ দেখছে। দেখুক। শাওনি প্যাকিং করবে। জামা-কাপড়, প্রসাধনী, ওষুধ-

বিষুধ, টিনের খাবার, বিস্কুট, মশলা। যথাসম্ভব কেটে-ছেঁটে। সামান্য-কিছু বই, কাগজপত্র। একটা বাজল। ঘড়ি জানান দিচ্ছে। ভোর সাড়ে-চারটের সময়ে উঠতে হবে। সন্তর্পণে একেবারে পা টিপে-টিপে সবুজ আলোর ঘরে শয্যার ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়ল শাওনি।

—নি, নি, তুমি কেন যাচ্ছ? কেন রাজি হলে? কেন? কেন? নি, তুমি হারিয়ে যাচ্ছ, তুমি যাবে না, যেয়ো না শাওনি, যেয়ো না...নাঃ, স্বরূপ সরকার অঘোরে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। বিয়ার-ঘুম কিংবা হুইস্কি-ঘুম। অনেকক্ষণ বিশুষ্ক চোখে জেগে-জেগে কখন ঘুম এসে গেছে। পাঁচটা বাজার শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শাওনি। পাশে স্বরূপ নেই। বাথরুমের দরজা খুলে যাচ্ছে। পরিষ্কার দাড়ি-কামানো, স্নাত স্বরূপ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা।

—আমি চট করে একটু কফি খেয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বেরোচ্ছি।

চান করার তেমন-সময় আর নেই। চুল বাঁচিয়ে কাক-চান। সিনথেটিক কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ। চুলে বেণী বাঁধা। এই ভাল হল, যেমন বেণী তেমন রইল, চুল ভিজল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে হয়েছে লাগেজ। কপালে কালো টিপ আটকাতে-আটকাতে আয়নার দিকে তাকাল শাওনি। আ-ট-ত্রি-শ বছর বয়স হয়ে গেছে। আঠাশ বছরেও মনে হত আ-ঠা-শ বছর বয়স হয়ে গেছে। আঠারোয় মনে হত আ-ঠা-রো? এখন মনে হয়, একদিন আঠাশ ছিলুম। মনে হয়, যখন আঠারো ছিলুম! কিন্তু আয়নায় কিছু বোঝা যায় না। না-পাওয়ার ভার, না-দেওয়ার ভার, কিচ্ছু না। যুবতী এক, নরম কপালে তারার মতো টিপ পরছে। শুধু চোখদুটোয় ভাল করে চোখ ফেললে বোঝা যাবে সেখানে বাদামি কণীনিকার পেছনে ক্লান্ত সংকল্প ধূসর পর্দা মেলে রয়েছে। চুলের রঙে একটা খয়েরি ছোপ, খড়ের মতো একটা শুষ্কতা যা যত্নের অপেক্ষায় আছে।

—এতগুলো?—স্বরূপ।

—আমি দুটো নিচ্ছি।—শাওনি।

—তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো।—স্বরূপ।

—বাস্কেটটা নিচ্ছি।—শাওনি।

—জল কই?—স্বরূপ।

—মিনার‍্যাল ওয়াটার নিয়ে নেব।—শাওনি।

স্বরূপ চুপ।

শাওনি চুপ।

ভোরবেলা। ভোর। ময়লার গাড়ি। ময়লা। বাতি টিম-টিম। সেলোফেনে সূর্য মোড়া। শুকতারা এখনও। ফিকে। ফালি চাঁদ। শুকিয়ে যাচ্ছে। টুপি মাথায় বৃদ্ধ। ভোরের হাওয়া। কাঁপ-ধরা ঠাণ্ডা। ভিখারি। বেরোচ্ছে। পা নেই। ঠ্যালাগাড়ি। চাকা-অলা। ঠেলছে। একজন। ঠাণ্ডা। স্ট্র্যান্ড রোড থরথরে। থরথর....থরথর। হাওড়া ব্রিজে টিনোসেরাসের পিঠ। কাঁপছে। ফেলে দেবে? গঙ্গা। ময়লা। গমগম গমগম। স্টেশন। জটলায়-জটলায় পুঁটলি-পাঁটলার যাত্রিদল। গ্রুপ-গ্রুপে। নরম, শক্ত লাগেজ নিয়ে ফিটফাট প্যাসেঞ্জার। সরসর-সরসর। খবরদার! খবরদার! যাত্রী ভেদ করে ঠ্যালাগাড়ি। অমুক আপ উইল ডিপার্ট ফ্রম তমুক

প্ল্যাটফর্ম অ্যাট অমুক আওয়ার। টু জিরো টু ওয়ান আপ...টু জিরো টু ওয়ান আপ... কোচ সেভেনটিন...সেভেনটিন। সিট ফর্টিওয়ান...ফর্টিএইট নয়? আটত্রিশ? বিয়াল্লিশ নয়? ফর্টিওয়ান?

—এই যে, জলটা ধরো।

—বেল দিচ্ছে।

কাচের বাইরে স্বরূপ। ভেতরে দৃষ্টি। দ্যাখা যায় না। কাচের গায়ে স্বরূপ নিজেকেই দেখতে পায়। শুকনো চুল। এলোমেলো। উঁচু কলার। কাটা দাগ ভুরুর ওপর। কাচের ভেতরে শাওনি। বাইরে দৃষ্টি বোঝা যায়, দেখা যায় না। কাচের গায়ে শাওনি নিজেকেই দেখতে পায়। গেরুয়া কাঁধ। রুদ্রাক্ষের গলা, কপালের মাঝখানে কড়া কালো, দু-কানে বাসী রক্তের ফোঁটা। ছটা-উনপঞ্চাশ। শতাব্দী এক্সপ্রেস ছাড়ছে। রাইট টাইম। স্বরূপ, স্বরূপ তুমি কি আমাকে ডাকছ? ডাকো স্বরূপ...একবার ডাকার মতো ডাকো...

শাওনি, শাওনি, তুমি কি ফিরে আসছো? ফেরো শাওনি...একবার ফেরার মতো ফেরো...

শতাব্দী এক্সপ্রেস ছেড়ে যায়। ●



চুমুতে কি চোখ বোজে

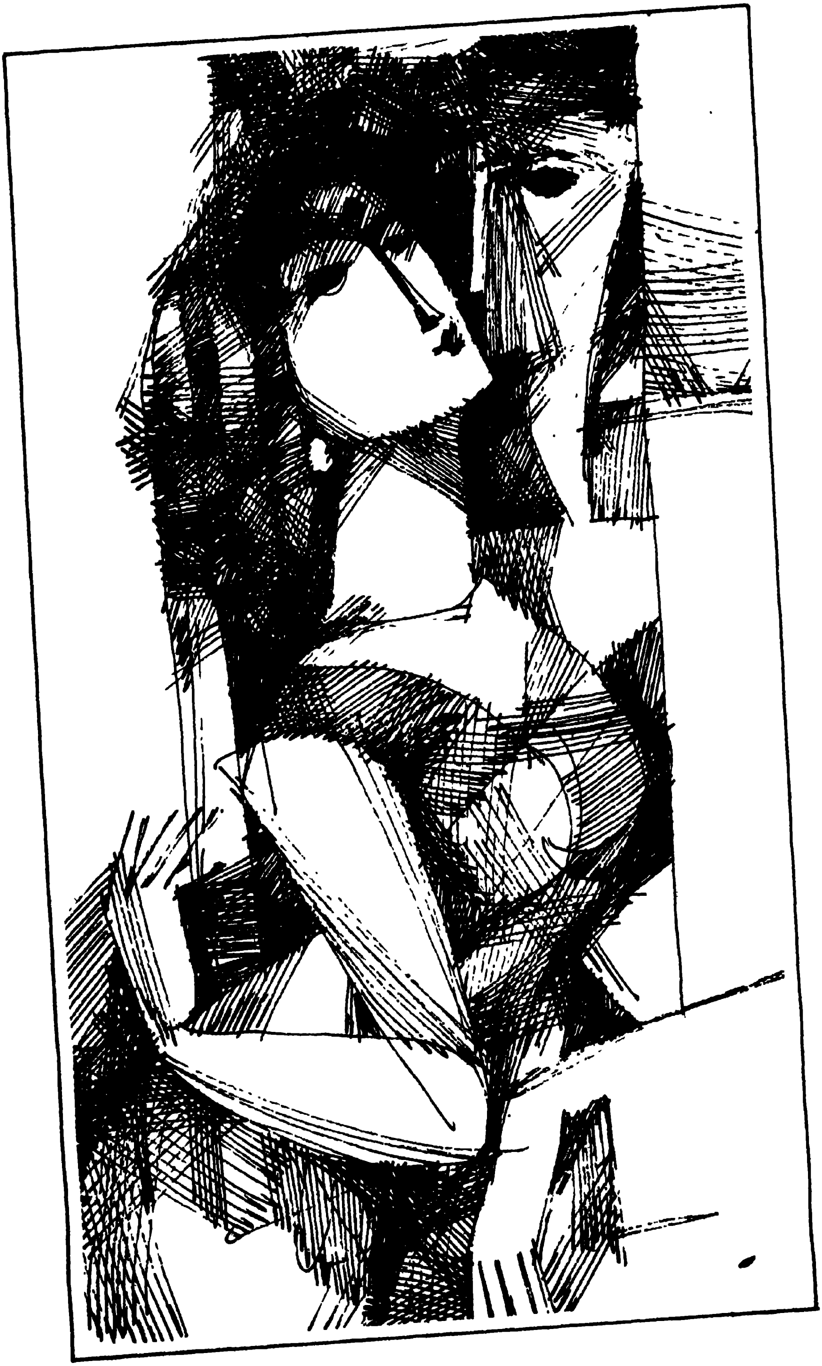
প্রযোজকের বসার ঘর। ঘরটা দারুণভাবে সাজানো। প্রযোজক শ্যামবাবু বগলের নিচে বালিশ দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। ডিভানের সামনে টেনে-আনা সোফায় চিত্রনাট্যকার অমর দাস আর শিল্প-নির্দেশক জ্যোতি সেন। দু-দিকের মুখোমুখি চেয়ারের একটিতে তরুণ পরিচালক তাপস রায়, অন্যটিতে জনপ্রিয় লেখক তথাগত মৈত্র। তথাগতর আসল নাম পাঁচুগোপাল, কিন্তু ছদ্মনামেই তিনি বিখ্যাত। এঁরই একটি গল্প নিয়ে ছবি হবে শ্যামবাবুর প্রযোজনায়। সেই ছবির চিত্রানাট্য শোনাচ্ছেন অমর দাস। বাকি সবাই শুনছেন, মন্তব্য করছেন, চিত্রনাট্যের কিছু-কিছু অংশের সংশোধনও করা হচ্ছে ফাঁকে-ফাঁকে।

এখন কফি-বিরতি। কফির সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণে মশলা-দেওয়া মোটা-মোটা কাজুবাদাম। চিন্তামগ্ন অমরবাবু স্ক্রিপ্টের দিকে চোখ রেখে প্রায় হুড়মুড় করে বাদাম খাচ্ছিলেন, বাকি সবাই দুটো-চারটে করে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। এই সুযোগে এঁদের সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে নেওয়া যাক।

ইচ্ছে করেই এই কাহিনীর চরিত্রদের আমি স্বনামে রেখেছি। কারও ভুয়ো নাম দিইনি। এঁরা কলকাতার সমাজে মোটামুটিভাবে পরিচিত। চিত্রনাট্যকার অমর দাস ছাড়া বাকি তিনজনের বাড়িতে টেলিফোন আছে। এঁদের কথা আমি ঠিক-ঠিক বলছি কি না—ইচ্ছে করলেই আপনারা জেনে নিতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

শ্যামবাবু এখন চিৎ হয়ে শুয়ে খুব দ্রুত পা নাড়াচ্ছেন। কঠিন চিন্তার জট ছাড়াবার সময় তিনি যে-যে ভঙ্গি করে থাকেন, এই ভঙ্গিটি তার একটি। শ্যামবাবুর পুরো নাম শ্যামাদাস মল্লিক। ক্যানাল ইস্ট রোডে তাঁর দুটো ময়দার কল আছে। হালে চিংড়ির রফতানিতে নেমে প্রচুর টাকা এসেছে হাতে। সিনেমা প্রযোজনার পিছনে তাঁর একটিই উদ্দেশ্য—তা হল, গুণিমহলে প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনেকদিনের। কারণ বিএ-পাশ এই মানুষটি লেখাপড়া ভালবাসেন, অথচ ব্যবসার সুবাদে চব্বিশ-ঘণ্টা যাদের সঙ্গে তাঁকে ওঠা-বসা করতে হয় তারা লেখা-পড়ার বিন্দুমাত্র ধার ধারে না। তারা সকাল-সন্ধে-রাত্তিরে শুধু তিনটে জিনিস বোঝে। প্রথমটার নাম ব্যবসা, দ্বিতীয়টার নাম ব্যবসা, তৃতীয়টার নামও ব্যবসা।

শ্যামবাবুর অর্থ এবং মনোবেদনা দুটোই যখন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল, তখন তাঁর সঙ্গে একদিন ঘটনাচক্রে প্রতিভাবান তরুণ চলচ্চিত্র-পরিচালক তাপস রায়ের আলাপ হয়ে



যায়। তাপসের বয়স এখন সাতাশ। পড়াশুনো দুন স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি নিয়ে এমএ পড়তে-পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পড়া ছাড়ার পিছনে দুটো কারণ ছিল। এক, বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর ঘেন্না। দুই, সত্যিকারের আর্ট ফিল্ম বানাবার ঝোঁক। ওর বড়লোক বাবা ছেলের এই পাগলামোকে নির্মমভাবে শোধরাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে উল্টো ফল ফলেছে। শোধরানো তো দূরের কথা, ছেলে আরও বিগড়ে গিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে মেসে থাকতে শুরু করেছে বেশ-কিছুদিন ধরে।

প্রতিভাবান মাত্রই আদর্শবান এবং জেদি হয়। স্বভাবের মধ্যে এই দুটো জিনিস থাকার ফলে তাপস গত পাঁচবছরে বহুবার ঠকেছে। এবং ঠেকেছে। ঠকে-ঠকে বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে ওর কিছুটা শিক্ষা হয়েছে। বাকি শিক্ষাটুকু দিয়েছেন মধ্যবয়স্ক শিল্প-নির্দেশক জ্যোতি সেন। তিনি বলেছেন—আপনি যতই গররাজি থাকুন না কেন, কারও মুখের ওপর কক্ষনো 'না' বলবেন না। 'না'-এর বদলে 'হ্যাঁ' বলেও নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। আসলে একটু ট্যাক্টফুল হতে দোষটা কোথায়?

তাপস এ-পর্যন্ত দুটো মোটে ডকুমেন্টারি ছবি করেছে। দুটো ছবির একটাও রিলিজড হয়নি এখনও। পুরো মাপের কমার্শিয়াল ফিচার ফিল্ম এই প্রথম করতে যাচ্ছে। এটা যদি বাজারে ধরে, পরের বারই ও নিজের ইচ্ছেমতো একটা আর্ট ফিল্ম বানাবে।

যাঁরা সত্যিকারের ছবি বোঝেন তাঁদের কাছে শুনেছি, একজন অসাধারণ ফিল্ম-মেকারের সব গুণই তাপসের মধ্যে আছে। এটা যদি সত্যি হয়, আর তাপস যদি ঠিক-ঠিক সুযোগ পায়, দু-চারবছরের মধ্যেই ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-জগতে একটা নাম হয়ে উঠবে। গদার, ফেলিনি, বার্গম্যান প্রমুখ চলচ্চিত্রকারকে গুলে খেয়েছে তাপস। শুধু তা-ই নয়, ওইসব বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের ত্রুটি এবং দুর্বলতা নিয়ে রীতিমতো সহানুভূতির সঙ্গে বহুবার ওকে আমি আলোচনা করতে শুনেছি।

চিত্রনাট্যকার অমর দাসের নাম আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় শুনেছেন। 'তবু চলে গেলে', 'মিষ্টি ফড়িং', 'পাগলা সাধক' ইত্যাদি সুপারহিট ছবির চিত্রনাট্য ওঁরই লেখা। অমরবাবু বলেন—কলকাতা পয়সা দেয় না, পয়সা দেয় মফস্বল। যে-চিত্রনাট্যকার মেচেদা, ক্যানিং, রায়গঞ্জের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর রাখে, শুধু তার পক্ষেই হিট-সিনারিও লেখা সম্ভব।

শিল্প-নির্দেশক জ্যোতি সেন গুণী মানুষ। পুরনো কলকাতা, মুঘল পিরিয়ডের দিল্লি, এমনকী প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও নিখুঁত সেট বানাতে পারেন। কস্টিউমের ধারণাও অসাধারণ।

জিন্‌সের প্যান্টে কাজুবাদামের মশলামাখা হাত মুছে নিয়ে অমরবাবু বললেন, 'সিনারি-ওর বাকিটা পড়ি তা হলে এ-বার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ুন।' উত্তর দিলেন শ্যামবাবু।

পড়ার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা দিলেন অমরবাবু, 'এই শটটা খুব ডিফিকাল্ট। পঁয়তাল্লিশ বছরের বিপত্নীক মনোজ মুখার্জির সঙ্গে বারোবছরের মেয়ে মুনিয়ার প্রেমের সম্পর্ক এই শটেই এসটাবলিশড্ হবে। মানে দু-জনে দু-জনকে....পড়ছি তা হলে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে স্ক্রিপ্ট পড়তে শুরু করলেন অমরবাবু।

১. শেষ বিকেল। আকাশে গোধূলির আলো। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে শাল-পিয়ালের জঙ্গলে। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে বাসায়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে মোটর রোড। লং টপ শট। দূর থেকে একটা হুডখোলা গাড়ি ছুটে আসছে। ক্যামেরার আরও-কিছুটা কাছে আসার পরে গাড়ির স্ক্রিচিং হল্ট। ওই শব্দে গাছের মাথা থেকে একঝাঁক পাখি লাফিয়ে উঠল আকাশে। কাট।

২. গাড়ির দরজা খোলা। মুনিয়া তীব্রবেগে ছুটছে গাড়ির পেছন দিকে। ওর পরনে আঁটোসাটো ফ্রক। মিড শট। ছোটার তালে-তালে নাচছে কাঁধ পর্যন্ত ছাটা ঠাসা চুল। ডিজলভ্। তারপরেই ক্লোজ-আপে উদ্বিগ্ন মনোজ মুখার্জির মুখ। ওর কপালে ভাঁজ, দৃষ্টি দূরের দিকে। ক্যামেরা ট্র্যাক-ব্যাক্ করতে-করতে ফাঁকা রাস্তা ধরল। রাস্তার কোথাও মুনিয়া নেই। আড়ালে মনোজের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—মু-নি-য়া, মু-ন্‌নু, মুনু-উ-উ-উ...

৩. ক্যামেরা ট্রাক-ফরোয়ার্ড করছে। সামান্য উঁচু-নিচু শূন্য রাস্তা। হঠাৎ ও-পাশের জঙ্গল থেকে একটা বেজি উঠে এসে আড়াআড়িভাবে রাস্তা পার হল। ক্যামেরা এগোচ্ছে। রাস্তার বাঁকের পাশে আন্ডারগ্রোথে কী-যেন নড়ছে। জুম্।

৪. বিগ ক্লোজআপ। একরাশ বুনো ফুল মুনিয়ার নাকের কাছে। ওর চোখে তৃপ্তির চিহ্ন। আড়ালে মনোজের গলা : 'উফ্! পাগলি মেয়ে বটে। এই ফুলের জন্য জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে এদ্দুর আসা!' মিড-লং শট। ফ্রেমের মধ্যে মনোজ আর মুনিয়া। মুনিয়ার কাঁধে মনোজের হাত। মনোজ ভালবাসা-মাখা গলায় মৃদু স্বরে বলল, 'চলো।' কাট।

৫. পাহাড়ের আড়ালে চতুর্দিক-লাল-করে সূর্য ডুবছে। ডিজলভ্।

৬. গাড়ির দু-দিকের দরজা খোলা। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে আছে মনোজ আর মুনিয়া। মুনিয়ার হাতে বুনো ফুলের তোড়া। মুনিয়া অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'বাজে কথা, এ-ফুলের নাম তুমি জানোই না।'

'জানি।'

'কী?'

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'আহা', এর আবার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি আছে। কী নাম?'

'বলব?'

'দুর ছাই, বলো না?'

'ফুলের নামটা আমার খুব প্রিয়। এই ফুল আমি খুব ভালবাসি। এর নাম....মুনিয়া।'

'ইশ্‌শ। তুমি ঢপ দিচ্ছ।'

মনোজের ক্লোজ-আপ। চোখে-মুখে বেদনার ছাপ। বেদনা-মাখা গলায় মনোজ বলল, 'ছিঃ মুনিয়া, তোমাকে কতবার আমি বলেছি না, ওইসব খারাপ কথা বলবে না।'

অবাধ্য মেয়ের ভঙ্গিতে উত্তর দিল মুনিয়া, 'কে বলেছে 'ঢপ' খারাপ কথা? আমার ক্লাসের সব মেয়েরাই বলে, এমনকী ভূগোলের দিদিমণিও।'

দু-হাত দিয়ে মুনিয়াকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসার গলায় মনোজ বলল, 'বন্ধুরা না-জেনে বলে, আর দিদিমণি বলে মজা করে।'

মনোজের হাতের বাঁধন আর-একটু শক্ত হতেই মুনিয়া ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'সরো তো, অসভ্য কোথাকার।'

মনোজের ক্লোজ আপ। ওর চোখে-মুখে একইসঙ্গে ভালবাসার ঢল এবং উপেক্ষিত হওয়ার ব্যথা।

মুনিয়ার ফ্রকের নিচের দিকে টপ-শট ক্লোজ আপ। ফ্রকের পকেট থেকে একটা তোবড়ানো চকোলেট স্লাব বার করে মুনিয়া বলল, 'অসভ্য কোথাকার! দেখেছ আমার চকোলেটের কী দশা হয়েছে। অসভ্য।'

ক্যামেরা তোবড়ানো চকোলেট থেকে টিল্‌ট-আপ্ করল। মনোজের মুখ। ওর মুখে এক-মুহূর্ত আগের সেই হতাশা, বেদনা নেই। ও বুঝতে পেরেছে চকোলেট নষ্ট করার জন্যেই মুনিয়া ওকে 'অসভ্য' বলেছে, অন্য কোনও কারণে নয়। ও ঝলমলে মুখে মুনিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি আস্ত-একটা চকোলেটের দোকান কিনে দেব, মুন্‌নু আমার।' ডিজলভ্।

৭. গাড়ির উইন্ড-শিল্ডের ভেতর দিয়ে মিড-শট। মনোজের চোখে-মুখে প্রেমের বান ডেকেছে, কিন্তু মুনিয়া আড়ষ্ট, চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ। ঠিক এইসময় হুইট-হুই হুউট-হুউট করে প্যাঁচা ডেকে উঠল গাছের মাথায়। অমনি ভয় পেয়ে মনোজকে জড়িয়ে ধরল মুনিয়া। কাট্।

৮. ক্লোজ-আপ। গভীর প্রেমের সঙ্গে মনোজ আলতো করে চুমু খেল মুনিয়ার গালে। আবেশে চোখ বন্ধ করল মুনিয়া। মৃদু গলায় মনোজ বলল...

হঠাৎ অমরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বিজ্ঞ মানুষের ঢঙে শ্যামবাবু বললেন, 'কিন্তু মুনিয়া চোখ বন্ধ করবে কেন?'

অবাক চোখে সফল চিত্রনাট্যকার অমর দাস শ্যামবাবুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'ওটা হয়।'

'কেন হয়?'

'কী আশ্চর্য! মুনিয়ার জীবনে এটা প্রথম পুরুষের চুম্বন। আবেশে, বিহ্বলতায় চোখ বন্ধ হয়ে যাবে না?'

'ঝ্যা!' শ্যামবাবু একটিমাত্র শব্দে অমর দাসের কথাটা উড়িয়ে দিলেন।

শিল্প-নির্দেশক জ্যোতি সেন তর্কটা থামিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে, ওখানে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখুন, পরে আবার ভাবা যাবে।'

এর আগেও চিত্রনাট্যের কোনও-কোনও অংশ নিয়ে তর্ক উঠলে জ্যোতি সেন এই কায়দায় তর্কটা ধামাচাপা দিয়েছিলেন, কিন্তু এ-বার কোনও ফল হল না। অমরবাবু বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'আপনাদের আগেই বলেছি এই শটটা খুব ইমপর্টান্ট। এই শটেই মনোজ এবং মুনিয়ার প্রেমের সম্পর্ক এসট্যাবলিশড্ হবে।'

'তা হোক, কিন্তু বারোবছরের মেয়ে চুমু খেয়ে ঝপ করে চোখ বন্ধ করবে কেন? বারোবছরের মেয়ের মধ্যে সেক্স কতটুকু আসে? আপনাদের বলতে বাধা নেই, আমার জীবনে ঠিক এইধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু মেয়েটা চোখ বন্ধ করা তো দূরের কথা, চুমুটাকেই কোনও গুরুত্ব দেয়নি।'

বিরক্ত অমরবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রবলেমটা কী জানেন, আমরা সবকিছুই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করতে যাই।' বলেই তিনি কেমন-যেন বিচার চাওয়ার ভঙ্গিতে তরুণ প্রতিভাবান পরিচালক তাপস রায়ের দিকে চাইলেন।

ছবির গল্প এবং চিত্রনাট্য তাপসের একেবারেই পছন্দ হয়নি, কিন্তু ও এখন ধাক্কা-খাওয়া জ্ঞানবান যুবক। এ-কূল ও-কূল, দু-কূল সামলে বলল, 'আসলে ফিল্মিক ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা, সব সময় তা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। তবে এটাও দেখতে হবে, অনেকের কাছে সেটা যেন বেশ কনভিনসিং হয়।'

ধোঁয়াটে উত্তর দিতে পেরে তাপস কিছুটা আত্মতৃপ্তি পেল, কিন্তু ওকে চেপে ধরলেন শ্যামবাবু। 'বেশ তো, আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোই তা হলে মিলিয়ে দেখা যাক। আপনি কি কখনও ওইরকম অল্পবয়সি কোনও মেয়েকে চুমু খেয়েছেন?'

তাপস মৃদু হেসে বলল, 'খেয়েছি।'

'বেশ, এ-বার বলুন মেয়েটির ঠিক কী-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? চুমু খাওয়ার পরে সে কি চোখ বুজেছিল?'

তাপস নিঃশব্দে ঠোঁটের হাসি আরও ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওই বয়সের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার সেক্সুয়াল এনকাউন্টার হয়েছিল আন্ডার হেজ অব হুইস্কি। ইন ফ্যাক্ট, মেয়েটির মুখই এখন আমি মনে করতে পারছি না, সুতরাং তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, আমার পক্ষে বলা অসম্ভব।'

তাপসের উত্তরে শ্যামবাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন, আর ঠিক তক্ষুনি পরিচালকের হিতৈষী জ্যোতি সেন পা দিয়ে ঠোক্কর মারলেন তাপসের পায়ে। যার অর্থ তাপসের কাছে খুব পরিষ্কার। অর্থটি হল : ফিফ্‌থ ইয়ারি বাত্তেলা মেরো না এখানে। তোমার সামনে বন্ধুরা বসে নেই, বসে আছেন একজন প্রযোজক। পার্টি বিগড়ে গেলে তোমার কেরিয়ারও বিগড়ে যাবে।

ঠোক্করের মানে মগজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তাপস বলল, 'ন্‌না, আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। ওই শটটা নিয়ে পরে আবার আমরা ভেবে দেখব।'

কিন্তু এ-রকম 'ঠিক আছে'-গোছের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না শ্যামবাবু। উনি সমর্থনের আশায় জনপ্রিয় লেখক তথাগত মৈত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ-ব্যাপারে আপনার কী মত?'

তথাগতবাবু গোড়া থেকেই চুপচাপ থেকে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁর অনেক গল্প নিয়ে সিনেমা হয়েছে, কিন্তু চিত্রনাট্যফিত্রনাট্য নিয়ে উনি কখনওই মাথা ঘামাননি। শ্যামবাবু গল্প-বেচার টাকাটা আজ দেবেন বলেই ওঁর এখানে আসা। বেজার

মুখে কয়েক মুহূর্ত কাটাবার পরে উনি জিগ্যেস করলেন, 'কোন ব্যাপারে আমার মত চাইছেন?'

শ্যামবাবু আবার খোলসা করে বললেন, 'জীবনের প্রথম চুমু পাওয়ার পরে বারোবছরের কোনও মেয়ের কি চোখ বুজে আসে?'

'দেখুন, এ-ব্যাপারে এখানে আমার কোনও মত দেওয়া মানায় না।' হঠাৎ কেমন-যেন অভিমানী-অভিমানী গলায় উত্তর দিলেন তথাগতবাবু।

'কেন, কেন?'

'আমার গল্পের সঙ্গে এই চিত্রনাট্যের কোনও মিলই নেই।'

'সে কী!' অবাক হলেন শ্যামবাবু। কিন্তু কথার খেই ধরে দ্রুত উত্তর দিলেন অমর দাস। 'না না, তা নয়, আসলে ছবি করতে গেলে গল্পের কিছু-কিছু মাইনর চেঞ্জ তো করতেই হয়।'

'এর নাম মাইনর চেঞ্জ! আমার গল্পে পঁয়ত্রিশ-বছরের এক বিধবা মহিলার সঙ্গে চোদ্দো বছরের একটি ছেলের অবৈধ সম্পর্ক ছিল, আর আপনারা কী করেছেন?'

অমরবাবু প্রথম দফায় একটু থতমত খেয়ে গেলেও সামলে নিয়ে বললেন, 'ন্না, আমরা শুধু সেক্স-চেঞ্জ করেছি। ছেলের জায়গায় মেয়ে, আর মেয়ের জায়গায় ছেলে। এ-ছাড়া—'

'এ-ছাড়াও আছে। আমার গল্পে পুরো ঘটনাটা ঘটেছিল একটি গোঁড়া মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে, আর আপনারা এখানে বড়লোক নায়ক-নায়িকাকে হিল্লিদিল্লি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

আবার আপসের গলায় নাক গলালেন শিল্প-নির্দেশক জ্যোতি সেন, 'প্লিজ ব্যাপারটা ও-ভাবে দেখবেন না। ছবিতে সবচেয়ে বড় জিনিস কোনটা? ভিসুয়াল ইমেজ তো! মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের মধ্যেই যদি পুরো ব্যাপারটা ধরে রাখা হত, তা হলে বারবার ক্যামেরার সামনে আসত নোনাধরা দেয়াল, বিচ্ছিরি কলতলা—এইসব। দর্শকদের কি বারবার এইসব ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে ভাল লাগে? তারা চায় একটু পাহাড়, একটু জঙ্গল, একটু সমুদ্রতীর—নয় কি? তা ছাড়া ভেবে দেখুন, কালার ফিল্ম আউটডোরে ফেলতে পারলে সিনেমাটিক এক্সপ্লোরেশনের কত সুবিধে।'

'এগজ্যাক্টলি', ভরাট গলায় সায় দিলেন অমরবাবু। তারপরেই অতি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'এই শটটার পরেই দেখবেন মনোজ আর মুনিয়া মালদার একটি চাষি-পরিবারের অতিথি হয়েছে। একদিকে গরিব চাষি অন্যদিকে বড়লোক প্রেমিক-প্রেমিকা। কী বিউটিফুল কনট্রাস্ট দেখানো যাবে, বলুন তো? দু-দিন দু-রাত্তির ওরা চাষির বাড়িতে থাকবে। অতিথির সেবা করতে গিয়ে গরিব চাষি চড়া সুদে টাকা ধার করবে মহাজনের কাছ থেকে। অথচ চলে আসার সময় মনোজ যখন মোটা একটা টাকার বান্ডিল উপহার দিতে যাবে চাষিকে, তখন চাষি বলবে...ওহ্! ওই জায়গাটার ডায়ালগ লিখতে পেরে আমি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়েছি। চাষি একটা পয়সাও নেবে না, হাত জোড় করে শুধু বলবে, অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করা তো আমার ধর্ম। সোজা কথায় যাকে বলে গরিবের জুতোর বাড়ি বড়লোকের

পিঠে পড়া। সংলাপ এই এলাকার গাঁয়ের ভাষায় লেখা। বিশ্বাস করুন, এটা লিখতে-লিখতে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, হাততালিতে হাউস ফেটে যাচ্ছে।'

অমর দাস এককালে স্টেজে অভিনয় করতেন, ওঁর সংলাপ-পড়া কিংবা কথা-বলার মধ্যে বেশ একটু নাটুকেপনা আছে। ভেবেছিলেন, এত জোর দিয়ে এই কথাগুলো বলার 'পরে লেখক একটু শান্ত হবেন। কিন্তু শান্ত হওয়ার বদলে আরও বিরক্ত হয়ে তথাগতবাবু বললেন, 'আমার গল্পে তো এ-সব ব্যাপার একেবারেই নেই।'

সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন অমর দাস। একটু থেমে উত্তর দিলেন তিনি, 'না, তা নেই, তবে মূল থিমের সঙ্গে মিল রেখে—'

'মিল! আমার গল্পে বিধবা মহিলা আর অল্পবয়েসি ছেলেটার মধ্যে জটিল মানবিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছিল, অনেকটা ইদিপাস কমপ্লেকসের ধাঁচে—আর আপনারা এটাকে নিছক একটা প্রেমের গপ্পো বানিয়ে দিয়েছেন।'

'না না, ইদিপাসের ব্যাপারটা শেষের দিকে একটু আসবে।'

'কী করে আসবে? কী করে আসা সম্ভব? আপনারা তো প্রধান দুটো ক্যারেকটারের সেক্সই চেঞ্জ করে দিয়েছেন।'

ঠিক এইসময় তথাগত মৈত্রের পক্ষ নিয়ে তর্কের মধ্যে ঢুকে পড়লেন শ্যামবাবু—'ন্‌না, এটা ঠিক নয়। মূল গল্প আগাগোড়া পাল্টে দেওয়া অনুচিত। আর ছবির প্রয়োজনে গল্প যদি একেবারেই পাল্টে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে—তা হলে ওই গল্পের সঙ্গে তথাগতবাবুর মতো নামী লেখকের নাম ব্যবহার করা উচিত নয়।'

পাঠক, শ্যামবাবুর এই কথাটা শুনে যে-কারও মনে হতে পারে, শ্যামাদাস মল্লিক ঠিক কথা বলেছেন। একজন দায়িত্বশীল মানুষের কথা তো এইরকমই হওয়া উচিত। বিশেষ করে তিনি যখন একজন লেখকের স্বার্থ দেখছেন। আর লেখক মানে যে-সে লেখক নয়, তথাগত মৈত্রের মতো বিখ্যাত লেখক। কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল, কারণ আমি তথাগতবাবুর অন্ধ ভক্ত। ওঁর লেখা পড়ার সময় কখনও আমি হাসতে-হাসতে, কখনও কাঁদতে-কাঁদতে, কখনও চমকাতে-চমকাতে—ওফ্! ওঁর সব বই-ই আমার বাড়িতে আছে।

তথাগতবাবু আমাকে খুব স্নেহ করেন। খুব হৃদয়বান, খোলা মনের মানুষ। কোনও ব্যাপারে ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। পরে আমাকে বলেছিলেন, 'শ্যামবাবুর ওই কথাটার আসল মানে কী ছিল বলো তো?'

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'এর আবার আসল মানে কী! উনি তো আপনাকেই সাপোর্ট করেছিলেন। আসলে প্রযোজক হলেও লেখাপড়া-জানা মানুষ তো!'

আমার কথা শুনে তথাগতবাবু আমাকে ছোট্ট করে একটা ধমক মেরে বলেছিলেন, 'কচু!'

ধমক খেয়ে আমি শিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ আরও অনেকটা বেড়ে ওঠার পরে তথাগত মৈত্র হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'শ্যামবাবু আসলে ব্যবসায়ী, আমাকে সাপোর্ট করার পেছনে ওর ব্যবসা-বুদ্ধিটাই কাজ করেছিল শুধু। কী বুঝলে?'

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিলাম, 'কিছুই বুঝিনি।'

কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে হেসে নেওয়ার পরে তথাগতবাবু বলেছিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব সহজ। কোনও গল্পের খোলনলচে পালটে দিলে সেই গল্পের জন্য লেখককে টাকা দেওয়ার কোনও মানে হয়? ফালতু প্রেস্টিজ-ইস্যুতে আমাকে কাটিয়ে দিতে পারলে গল্প কেনার জন্যে আমাকে আর একুশ-হাজার টাকা দিতে হত না শ্যামবাবুকে।'

তথাগতবাবুর লোকচরিত্র বোঝার অসামান্য ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়ে আমি বলেছিলাম, 'আশ্চর্য! তা, আপনি তখন কী বললেন?'

'প্রসঙ্গটা বেমালুম চাপা দিয়ে দিলাম।'

'কীভাবে?'

'হঠাৎ গলায় একটু বাড়তি জোর এনে বললাম, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। বলতেই সবাই আমার দিকে তাকাল। আমি তাকালাম শ্যামবাবুর দিকে। তাকিয়ে বললাম, তবে—মেয়েটির বয়েস বারো নয়, এই সাড়ে-বারো/তেরো হবে। যদ্দুর জানি মেয়েটির জীবনে আমিই ছিলাম প্রথম পুরুষ। প্রথমবার চুমু খেতেই মেয়েটির চোখ—ন্‌না, পুরো বোজেনি, তবে আধবোজা-গোছের হয়ে গিয়েছিল।

'সমর্থন পাওয়ার আনন্দে উরুতে থাপ্পড় মেরে শ্যামবাবু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। তবে সেটা আবেশে নয়—আসলে একটা মুখের ওপর আর একটা মুখ চেপে ধরলে এমনিতেই তো চোখ অর্ধেক বুজে আসে। সায় দিয়ে বলেছিলাম, আমারও তাই মনে হয়।'

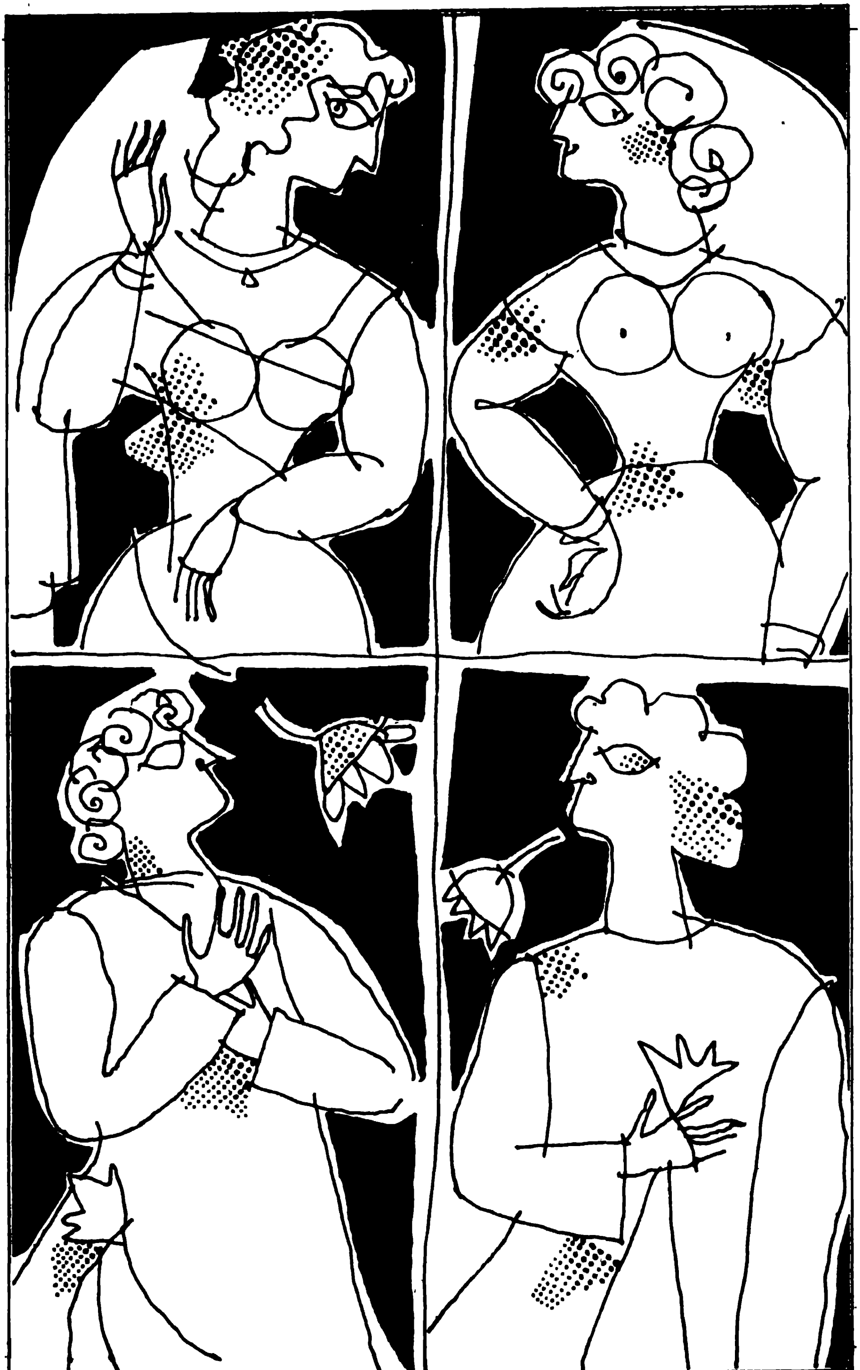
তখন তাপস বলেছিল, 'শটটা আমি অন্যভাবে ভেবে ফেলেছি। সেইসময় তো পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবছিল, তার মানে আকাশে বেলাশেষের শেষ আলো। ওই আলোয় স্পষ্ট ছবি দেখানো ঠিক হবে না। সুতরাং মেয়েটির চোখ খোলা কি বোজা—তা নিয়ে আর কোনও সমস্যা থাকছে না। আবছা আলোয় জাস্ট দুটো ঝাপসা ঘনিষ্ঠ ফিগার, একটা সিলুয়েট।'

চোখ বোজা-খোলার বিদঘুটে ঝামেলাটা তাপসকে সুন্দরভাবে মিটিয়ে দিতে দেখে জ্যোতি সেন হাততালি দিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'একসেলেন্ট।'

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে আর তর্ক করতে চাইছিলেন না চিত্রনাট্যকার অমর দাস, তা ছাড়া তাপস একটা সম্মানজনক দ্বিতীয় পথ খুলে দিয়েছে। অতএব সেটা মেনে নেওয়াই ভাল। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কল্পিত দৃশ্যটা দেখার ভান করে অমরবাবু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এটা চলতে পারে।'

দ্বিতীয় দফায় কফি এসে যাওয়ায় চিত্রনাট্য-পাঠে আর-একটা বিরতি পড়েছিল। সেই ফাঁকে তথাগতবাবু বলেছিলেন, 'শ্যামবাবু, এ-বার আমাকে উঠতে হবে, একটা জরুরি কাজ আছে।'

হ্যাঁ, যাবার আগে গল্প-বেচার চেকটা পেয়েছিলেন লেখক। ●





নমস্কার ভালবাসা

এ-গল্প অন্যভাবেও বলা যেত। আমি এইভাবে বলছি :

রাম ও সত্য দুই বন্ধু। সীতা ও সাবিত্রী দুই বান্ধবী। রাম একদিন সীতাকে এবং সত্য একদিন সাবিত্রীকে ভালবাসতে আরম্ভ করল। পাঁচবছর ধরে ভালাবাসাবাসির পর সীতা ও সাবিত্রী দু-জনেই আমচকা গর্ভধারণ করে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে রাম ও সত্য উভয়ের গর্ভপাত ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু বাদ সাধল সীতা ও সাবিত্রী। তারা বলল, অমন পাপকাজ আমরা করতে পারব না। অতএব তাদের বিয়ে করা ছাড়া রাম ও সত্যর অন্য গতি রইল না।

বিয়ে করার চার-পাঁচবছর পর্যন্ত সকলেই বেশ সুখে-শান্তিতে দিন কাটাল। তারপরেই দেখা দিল সমস্যা। সকলেই বুঝতে পারল তারা কেউ কাউকে আর ভালবাসতে পারছে না। এমনকী, সহ্যও করতে পারছে না। ফলে রাম ও সত্য প্রায়ই মদ খেয়ে রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল। পাশাপাশি সীতা ও সাবিত্রীও দিন-দিন স্বামীদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়তে লাগল। তারা প্রতিদিন বিকেলে শিশুপুত্রদের বাড়ির দাসীদের কাছে গচ্ছিত রেখে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল। শুধু তা-ই নয়, তারা বিষ্ণু ও ইন্দ্র নামের দুই যুবকের সঙ্গে নিয়মিত সিনেমা দেখতে লাগল, ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেতে লাগল, ফুচকা খেতে লাগল, চুমু খেতে লাগল। এবং রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে যে যার প্রেমিকের কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। আর অনেক রাতে স্বামীদের হাতের স্পর্শ পেলেই ঝাঁঝিয়ে উঠতে লাগল, আহ্! জ্বালাতন কোরো না। স্বামীরা এর রহস্য জানতে পারল না।

অবশ্য রাম ও সত্যকে এ-ব্যাপারে খুব-বেশি অপরাধী করা যায় না। কেন করা যায় না, তা জানতে হলে সীতা ও সাবিত্রীর কথা কিছু বলা দরকার। প্রথমে সীতার কথাই ধরা যাক। সীতার গানের গলা নেই, না-থাকলেও বিয়ের আগে তাকে গান শুনতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগ তার মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল। আর রাম রবীন্দ্রসংগীতের কেবল অনুরাগীই নয়, একজন গায়কও। তাই নতুন কোনও রবীন্দ্রসংগীত শিখলে তার প্রথম শ্রোতা হত সীতা। সীতা সে-গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। রাম কোনওদিন সীতার সেই উচ্ছ্বাসকে সন্দেহ করেনি। করার কারণও ঘটেনি। সে সীতাকে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের আসরে যেত। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড কিনে সীতাকে উপহার দিত। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল সীতা আসলে হিন্দি গানেরই ভক্ত। সে দিন-দিন হিন্দি গানের রেকর্ডে বাড়ি ভরিয়ে তুলল। এমনকী ছুটির দিনে রাম হারমনিয়াম নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন করতে বসলে, সীতা পাশের ঘরে হিন্দি গানের রেকর্ড বাজাতে থাকল। এ-নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছে,

ঝগড়া হয়েছে, অশান্তি হয়েছে। সীতার আচরণ তবু বদলায়নি। বিয়ের আগে সীতার কথাবার্তা কত সুন্দর ছিল, মিষ্টি ছিল। তার চোখে সবসময় কেমন-একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকত। বিয়ের পর রাম দেখতে পেল, সীতার মত কর্কশভাষিণী পৃথিবীতে বোধহয় আর একটিও নেই। আর সেই সলজ্জ চোখ-দুটো আস্তে-আস্তে নির্লজ্জ হয়ে উঠল। রাম বুঝতে পারল, সীতা তাকে ঠকিয়েছে।

এ-বার সাবিত্রীর কথায় আসা যাক। সাবিত্রী কবি ছিল না। কবি ছিল সত্য। সত্য রোজ কবিতা লিখত। লিখে সাবিত্রীকে শোনাত। সাবিত্রীকে না-শোনালে মনে শান্তি পেত না। কারণ, তার বেশিরভাগ কবিতারই বিষয় হত সাবিত্রী। সাবিত্রীকে নিয়ে তার নানা স্বপ্ন, দুঃখ, ক্রোধ, অভিমান—সবকিছুই সে খোলাখুলি কবিতায় প্রকাশ করত। একবার সে দুষ্টুমি করে লিখেছিল :

বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
চারিদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না।
কেউ কোথাও নেই।
এসো, সাবিত্রী!
আজ সঙ্গম, সঙ্গম, শুধু সঙ্গম।

সাবিত্রী কবিতাটা শুনে বাইরে খুব রাগ দেখিয়েছিল, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ভারি খুশি হয়েছিল। সত্য এ-সব বুঝত, বুঝতে পারত। সত্যর ধারণা হয়েছিল, পৃথিবীতে তার কবিতার একজনও যদি সমঝদার থেকে থাকে, সে হচ্ছে সাবিত্রী। সাবিত্রীকে নিয়ে সে কবি-সম্মেলনে যেত। আধুনিক কবিতার বই কিনে সাবিত্রীকে উপহার দিত। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, সাবিত্রী কবিতাকেই সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। আগে যে-সাবিত্রী ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে কবিতা শুনত, এখন সেই সাবিত্রী কবিতার নাম শুনলে বিরক্ত হয়। সত্যকে কবিতা লিখতে দেখলে তাকে বাজারে পাঠিয়ে দ্যায়, কিংবা জোর করে রেডিয়ো খুলে দ্যায়। আর সত্য যদি কবিতা পড়তে থাকে, তা হলে কানে আঙুল দিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দ্যায়। কখনও সত্যর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়। সত্য বুঝতে পারল, সাবিত্রী বিয়ের আগে তার সঙ্গে অভিনয় করেছে। কবিতা সাবিত্রীর একদম ভাল লাগে না। তার ভাল লাগে সাজতেগুজতে, ভাল লাগে নিত্য-নতুন শাড়ি পরতে, গয়না পরতে, গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে।

২.

একদিন অফিস ছুটির পর রাম ও সত্য একটি বার-এ গিয়ে বসল। তারপর তারা হুইস্কিতে চুমুক দিতে-দিতে, পাঁপড় খেতে-খেতে কথা বলতে শুরু করল।

রাম : সীতা আমায় ঠকিয়েছে।

সত্য : সাবিত্রীও আমায় ঠকিয়েছে।

রাম : সীতা একদম রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসে না।

সত্য : সাবিত্রী কবিতার নাম শুনলে রেগে যায়।

এইসময় একটু থেমে আবার :

রাম : আমি হিন্দি গানের উৎপাতে মারা যাচ্ছি।

সত্য : আমি শাড়ি-গয়নার উৎপাতে মারা যাচ্ছি।

রাম : সীতার সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব।

সত্য : সাবিত্রীর সঙ্গে ঘর করা চলে না।

এইসময় একটু থেমে আবার :

রাম : কিছু খাওয়া যাক। খিদে পাচ্ছে।

সত্য : আমারও।

রাম : তা হলে দু-প্লেট চিলি-চিকেন বলে দিই।

সত্য : বলে দে।

তারা তখন বেয়ারাকে ডেকে দু-প্লেট চিনি-চিকেনের অর্ডার দিল। একটু পরে বেয়ারা দু-প্লেট চিলি-চিকেন নিয়ে এল। রাম ও সত্য চিলি-চিকেন খেতে-খেতে আবার কথা শুরু করল।

রাম : আমি সীতার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই।

সত্য : আমিও সাবিত্রীর হাত থেকে বাঁচতে চাই।

রাম : আমি সীতাকে ডিভোর্স করব।

সত্য : আমিও সাবিত্রীকে ডিভোর্স করব।

তারপর তারা রাত দশটা পর্যন্ত বসে-বসে আরও মদ খেল। খাবার খেল। খেয়েদেয়ে রাত এগারোটায় ট্যাক্সি করে যে যার বাড়ি ফিরল। সীতা ও সাবিত্রী তখনও বাড়ি ফেরেনি। রাম সীতার জন্যে, সত্য সাবিত্রীর জন্যে অপেক্ষা করল না। করার অবস্থাও ছিল না। তারা প্রায় টলতে-টলতে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ার আগে দু-জনেই নিজের-নিজের বাড়ির দাসীকে জানিয়ে দিল, রাত্রে কিছু খাবে না। খিদে নেই। কিন্তু তারা কেউ ঘুমোতে পারল না। যে যার বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল। একঘণ্টা পরে সীতা বিষ্ণুর এবং সাবিত্রী ইন্দ্রর গাড়িতে করে বাড়ি ফিরল। রাম তার ঘরের জানালা দিয়ে দেখল, সীতাকে একজন গাড়ির দরজা খুলে নামিয়ে দিচ্ছে। সত্যও তার ঘরের জানালা দিয়ে দেখল, সাবিত্রীকে একজন গাড়ির দরজা খুলে নামিয়ে দিচ্ছে।

সীতা ঘরে ঢুকলে রাম জিগ্যেস করল, লোকটা কে?

সীতা উত্তর দিল, বিষ্ণু।

রাম আবার জিগ্যেস করল, বিষ্ণুর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

সীতা উত্তর দিল, ভালবাসার।

এই উত্তর শুনে রাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

আর ও-দিকেও সাবিত্রী ঘরে ঢুকলে সত্য জিগ্যেস করল, লোকটা কে?

সাবিত্রী উত্তর দিল, ইন্দ্র।

সত্য এ-বার রামের মতোই সাবিত্রীকে প্রশ্ন করল, ইন্দ্রর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

সাবিত্রী সীতার মতো উত্তর দিল, ভালবাসার।

উত্তর শুনে সত্যও রামের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

৩.

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। রাম ও সত্য যথারীতি অফিস করতে লাগল। আড্ডা দিতে লাগল, মদ খেতে লাগল। সীতা ও সাবিত্রীও যথারীতি প্রতিদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল, বিষ্ণু ও ইন্দ্রর সঙ্গে প্রেম করতে লাগল, রাত করে বাড়ি ফিরতে লাগল। রাম ও সত্য চুপ করে রইল। সব দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। রাম সীতার সঙ্গে, সত্য সাবিত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে কোনও কথা তুলল না। শুধু তাদের বুকের ভেতরটা থেকে-থেকে খচ-খচ করতে লাগল। তারা ভাবতে লাগল, এ-রকম কেন হল? এ-রকম হওয়ার কি কথা ছিল?

একদিন রাম ও সত্য অফিস ছুটির পর একটা বার-এ গিয়ে বসল। তারপর যথারীতি হুইস্কি খেতে-খেতে, চিলি-চিকেন খেতে-খেতে কথা শুরু করল।

রাম : আমাকে বোধহয় আর কষ্ট করে ডিভোর্সের মামলা করতে হবে না।

সত্য : আমাকেও করতে হবে না।

রাম : সীতা এখন বিষ্ণুকে ভালবাসে।

সত্য : সাবিত্রী এখন ইন্দ্রকে ভালবাসে।

একটু সময় থেমে আবার :

রাম : ভালই হল।

সত্য : হ্যাঁ, ভালই হল।

রাম : বিষ্ণু আমাকে বাঁচাল।

সত্য : ইন্দ্র আমাকে বাঁচাল।

এইসময় একটু থেমে আবার :

রাম : কিন্তু বিষ্ণু আর কতদিন সীতাকে আমার কাছে ফেলে রাখবে?

সত্য : ইন্দ্রই বা আর কতদিন সাবিত্রীকে আমার কাছে ফেলে রাখবে?

রাম : আর কতদিন?

সত্য : আর কতদিন?

৪.

আরও দিন পার হল, মাস পার হল। তারপর একদিন সকালবেলা রামেদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে সীতা নিজের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিল।

রাম জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

সীতা হেসে উত্তর দিল, বিষ্ণুর কাছে।

—কেন?

—তোমার কাছে থাকতে ভাল লাগে না।

—কিন্তু ডিভোর্স তো এখনও হয়নি।

—পরে ওটা করে নেওয়া যাবে।

রাম একটু থেমে জিগ্যেস করল, ছেলেকে সঙ্গে নেবে না?

—না। ও তোমার কাছেই থাকবে।

—তোমার মন-খারাপ করবে না?

—কার জন্যে?

—ছেলের জন্যে!

সীতা একটু থেমে বলল, যদি করে—ছেলে তো পালিয়ে যাচ্ছে না, এখানে এসে দেখে যাব। তারপর আর কথা না-বাড়িয়ে সীতা নিচে নেমে গেল। যেতে-যেতে একবার দাঁড়িয়ে বলল, ভাল কথা, আমি কিন্তু হিন্দি গানের রেকর্ডগুলো নিয়ে যাচ্ছি। তোমার আপত্তি নেই তো?

—না, আপত্তি থাকবে কেন? বরঞ্চ খুশি হলাম।

রাম এই কথা বলে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে সীতাকে গাড়িতে উঠতে দেখল। গাড়িতে উঠে সীতা রামের উদ্দেশে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, বাই-বাই।

রামও সীতার উদ্দেশে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, বাই-বাই।

ওই একইদিনে একই সময়ে সাবিত্রীকেও নিয়ে যাবার জন্যে একটা গাড়ি এল। সাবিত্রী জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

সত্য কিছু বুঝতে না-পেরে জিগ্যেস করল, কোথায়?

—ইন্দ্রর কাছে।

—কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয়। ইন্দ্রকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তুমি আপত্তি কোরো না।

সত্য হেসে বলল, একদিন তুমি আমাকে ভালবেসে আমার কাছে এসেছিলে, এখন ইন্দ্রকে ভালবেসে ইন্দ্রর কাছে যাচ্ছ, পরে বরুণকে ভালবেসে বরুণের কাছে যাবে। আমি কেন আপত্তি করব?

সাবিত্রী খুশি হয়ে বলল, আমি জানি, তুমি এতে আপত্তি করবে না। তুমি যে আমাকে ভীষণ ভালবাস। ইন্দ্রকে কতদিন এ-কথা বলেছি। এই বলে একটু থেমে সাবিত্রী বলল, একটা অনুরোধ করব?

—কী?

—ছেলে কিন্তু তোমার কাছেই থাকবে। আমি কিন্তু ছেলের ঝামেলা ঘাড়ে নেব না।

—বেশ, তাই হবে।

তারপর একটু থেমে সাবিত্রী বলল, আর-একটা অনুরোধ করব?

—কী?

—এই আমার শেষ অনুরোধ।

—কী?

—আমি পরে সময় করে ডিভোর্সের মামলা করব। তুমি যেন তখন ভালবাসার ঝোঁকে গোলমাল পাকিয়ো না, কেমন?

—আচ্ছা।

সাবিত্রী এ-কথা শুনে আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে তর-তর করে নিচে নেমে গেল। গাড়িতে গিয়ে উঠল। সত্য জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখল। গাড়িতে উঠে সীতা সত্যর উদ্দেশে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, বাই-বাই।

সত্যও সাবিত্রীর দেখাদেখি হাত নেড়ে বলল, বাই-বাই।

সীতা চলে গেল। সাবিত্রী চলে গেল। রাম আর সত্য এর জন্যে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করল না। কিংবা দেশভ্রমণেও বেরোল না। নিয়মিত অফিস আর বাড়ি করতে লাগল। করতে-করতে কখনও যেন তারা সবকিছুর ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা ঠিক করল, তাদের একটা-কিছু করা উচিত। কিন্তু কী করা যায়? তারা আলোচনা করতে লাগল। শেষে :

রাম : একটা প্রতিশোধ নেওয়া দরকার।

সত্য : আমারও তাই মনে হয়।

রাম : আমি সীতাকে খুন করব।

সত্য : আমি সাবিত্রীকে।

এই সিদ্ধান্তে আসার পর রাম ও সত্য দুটো রিভলবার জোগাড় করল। তারপর একদিন তারা সকালবেলা বেরিয়ে পড়ল। রাম গেল সীতার ফ্ল্যাটে। সত্য গেল সাবিত্রীর ফ্ল্যাটে।

সীতার ফ্ল্যাটে ঢুকে রাম দেখল, বিষ্ণু আর সীতা পাশাপাশি মুখে হাসি নিয়ে বসে আছে।

বিষ্ণু বলল, বসুন, বসুন।

রাম বলল, না, বসব না।

সীতা বলল, তা হয় না। তোমাকে চা আর পাঁপড় খেতেই হবে। তুমি চা-র সঙ্গে পাঁপড় খেতে ভীষণ ভালবাসতে।

রামের ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে পকেট থেকে রিভলবার বের করে সীতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে গিয়ে যদি ছুঁড়তে না পারে? যদি পলকের মধ্যে বিষ্ণু তার হাতটা চেপে ধরে? রাম দৃশ্যটা কল্পনা করে ভীত হয়ে পড়ল। ফলে সে ঠিক করল, সীতার কাছে প্রথম স্বামী হিসেবে তার যে-সম্মান আছে, সেটুকু নষ্ট না-করাই ভাল।

রাম হেসে বলল, আজ চা-পাঁপড় খাব না। পরে একদিন এসে চা আর পাঁপড় খেয়ে যাব। আমি শুধু দেখতে এলাম তুমি সুখে আছ কি না।

সীতা বলল, খুব সুখে আছি।

এই শুনে রাম আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ও-দিকে সত্য সাবিত্রীর ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল, ইন্দ্র আর সাবিত্রী বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে। সত্যকে দেখে ইন্দ্র উঠে বসল। সাবিত্রী উঠল না। শুয়ে থাকল।

ইন্দ্র বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

সত্য বলল, আজ বসব না। কাজ আছে।

সাবিত্রী শুয়ে-শুয়ে বলল, আহা। ও বলছে যখন, একটু বসোই না।

এই মুহূর্তে সত্যর ইচ্ছে হল পকেট থেকে রিভলবার বের করে সাবিত্রীর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু সে দেখল, ইন্দ্র এমনভাবে বসে আছে, গুলিটা সাবিত্রীর মাথায় না-লেগে ইন্দ্রর গায়ে লাগতে পারে। তবে সে যদি একটু সরে গিয়ে গুলি ছোঁড়ে এবং সে-গুলি যদি সাবিত্রীর মাথায় লাগে তা হলে একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দেবে। সে কি তারপর নিরাপদে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে? কথাটা মনে হতেই তার বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সত্য বলল, তুমি আজ আর কোনও অনুরোধ কোরো না। আজ বসতে আসিনি। আজ একটা কথা তোমাকে শুধু জিগ্যেস করতে এসেছি।

সাবিত্রী কৌতূহলী হয়ে উঠল, কী কথা?

সত্য জিগ্যেস করল, তুমি সুখী হয়েছ?

সাবিত্রী উত্তরে সত্যের সামনে ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে-খেতে বলল, ভীষণ, ভীষণ।

এই শুনে সত্য আর সেখানে দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেল সাবিত্রী তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলছে, এই, চলে গেলে কেন? চা খেয়ে যাও।

৬.

এই গল্পের লেখক যদি বঙ্কিমচন্দ্র হতেন, তা হলে সীতা ও সাবিত্রী মোটেই এ-ভাবে রেহাই পেত না। রাম ও সত্য তাদের 'পাপীয়সি!' বলে সম্বোধন করে গুলি করে মারত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এদের গুলি করে মারতেন না। তবে তিনি রাম ও সত্যকে সংসারের সীমা থেকে বিশ্ব-সংসারের অসীমতার মধ্যে নিয়ে যেতেন। আর শরৎচন্দ্র রাম ও সত্যকে পুরুষ-মানুষ বলে কাশীতে না-পাঠালেও তাদের দূরগামী কোনও ট্রেনে তুলে দিতেন।

কিন্তু হায়! যুগ বদলে গেছে। মানুষ বদলে গেছে। মানুষ এখন দুঃখ পেতে ভালবাসে না। দুঃখ নিয়ে মজা করতে ভালবাসে। তাই রাম ও সত্যর পরিণাম বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মতো হল না। সীতা ও সাবিত্রীর ফ্ল্যাট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের মনে হল, তারা যেন নতুন জন্ম পেয়েছে। এতক্ষণ ভয়ে তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এই জন্যে দু-জনের মধ্যে আবার যখন দেখা হল, তারা প্রথমে কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। শুধু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে তাদের মধ্যে এ-রকম কথাবার্তা হল :

রাম : একদিক দিয়ে এটা ভালই হয়েছে।

সত্য : হ্যাঁ, ভালই হয়েছে।

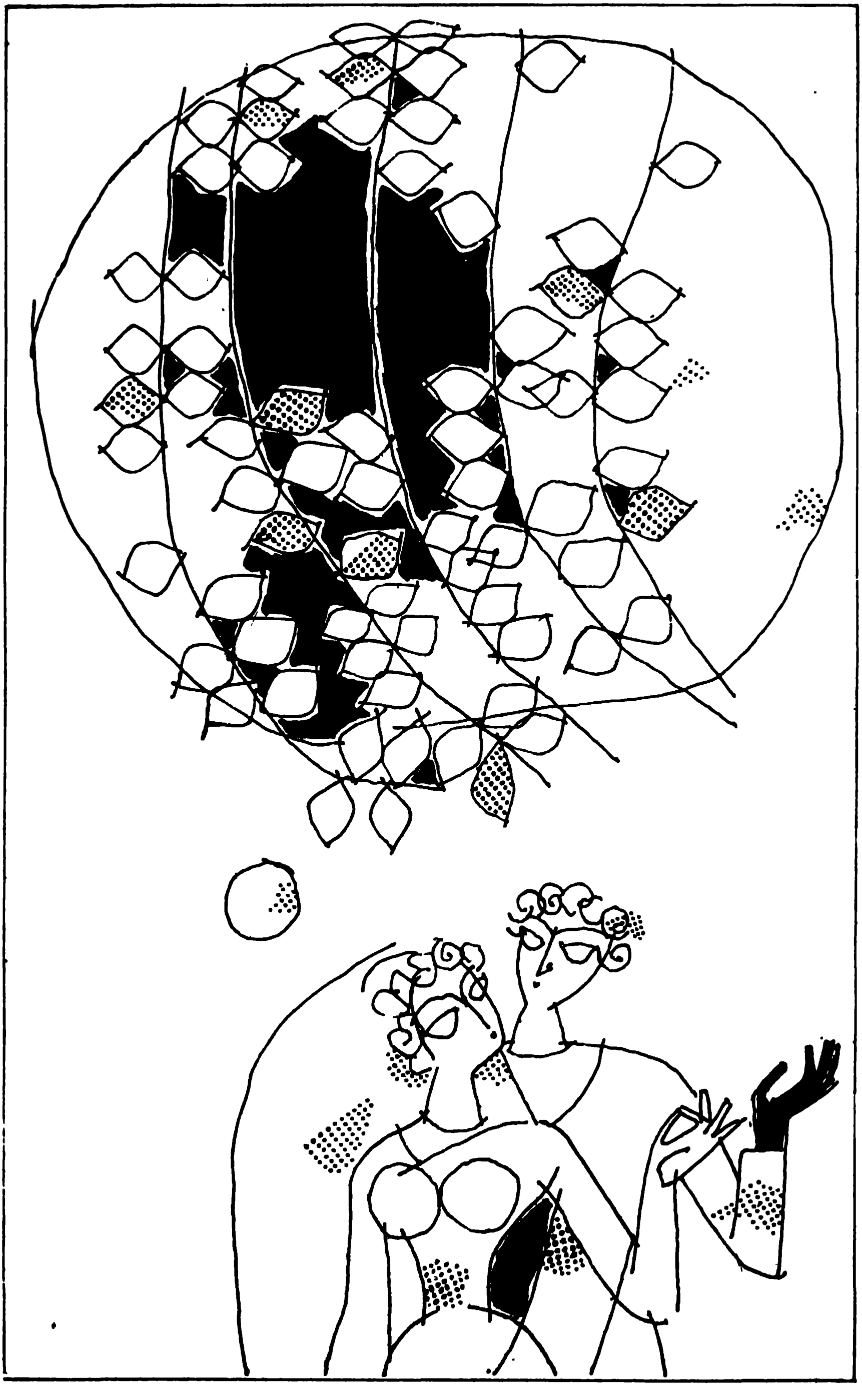
রাম : আমাদের জেল হয়ে যেত।

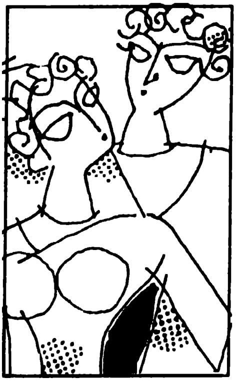
সত্য : ফাঁসিও হয়ে যেতে পারত।

রাম : খুব জোর বেঁচে গেছি।

সত্য : খুব জোর।

তারপর তারা হো-হো করে হাসতে লাগল। ●





একটু-একটু ভালবেসে

তনু বলল, আমি ভাবছিলাম, একদিন যাব। তবে আজ...

অমল ছাড়ার পাত্র নয়, প্লিজ, আজ চলো। আজ বইমেলার খোলা মঞ্চে নামকরা কবিরা আসবেন।

—যেতে পারি, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু।

—ঠিক আছে, তোমার যতক্ষণ খুশি থেকো।

—আমি ছ-টা নাগাদ যেতে পারি।

—ছ-টা?...আচ্ছা। আমি পার্ক স্ট্রিট মেট্রো-স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব।

—বইমেলার দিকে তো? আমি কিন্তু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। তুমি আগে যাবে।

—ঠিক আছে।

—আগে থেকে বলে রাখছি, আমি কিন্তু সাতটার পর থাকতে পারব না।

—ঠিক আছে বাবা।

অমল ফোন নামিয়ে রাখতেই ফোন বেজে উঠল। নারী কণ্ঠ : কী ব্যাপার, তোমার ফোন এত এনগেজ্ড থাকে কেন? ডায়াল করে-করে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল।

অমল নিজেকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করল, কে রে? কার গলা?

ও-পাশ থেকে প্রশ্ন আসে, কী চিনতে পেরেছ, না তা-ও পারনি?

চিনতে না-পেরেও আমল বলে, চিনব না কেন, বাহ্!

—কচু চিনেছ।

'কচু' থেকে বোঝা গেল, এ সুদেষ্ণা। অমল গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, সুদেষ্ণা, তুমি আজও আমায় চিনলে না।

সুদেষ্ণা হাসল, ঠিক আছে, চেনার চেষ্টা করা যাবে। আজ আমি বইমেলায় আসছি। তুমিও চলে এসো।

মনে-মনে অমল বলে, আজই! মুখে বলে, আজ একটু কাজ আছে। কাল।

—না, আমি আজই যাব। তুমিও আসবে।

—আজ?

—কী কচুপোড়া 'আজ-আজ' করছ? বললাম তো আমি আজই যাব।

—ঠিক আছে সাতটা নাগাদ এসো।

—এত দেরিতে? দুর কচু।

—তাতে কী? মেলা তো আটটা পর্যন্ত। তারপরও থাকতে দেয়। বললাম না, তার আগে

আমার একটা কাজ আছে।

—ঠিক আছে। আমি কফি হাউজের কাছে থাকব।

—ঠিক আছে।

দুটোর একটু আগে রচনা এসে উপস্থিত। কাঁধে ব্যাগ। ঠোটে হাসি ও লিপস্টিক। অমল জিগ্যেস করল, আরে, কবে এলে করিমপুর থেকে?

—আজই।

অমল ভাবে, যাবতীয় ঘটনা কি আজই ঘটবে! রচনা আবার বলে, আজ সকালে এসেছি, কালই চলে যাব।

—মাত্র একদিনের জন্য!

—অফিসের কাজ নিয়ে এসেছি। রাইটার্সের কাজ একটার মধ্যে মিটে গেল। ভাবলাম, এসেছি যখন, বইমেলটা দেখে যাই।

—তুমিও বইমেলায় যাবে! আজই?

—হ্যাঁ কাল তো চলে যাব, আজ না-গেলে...তা ছাড়া 'তুমিও' মানে কী? আর-কেউ বলেছে?

—অ্যাঁ? কে আবার বলবে? ও, হ্যাঁ, আমার বস বলছিলেন। একটু আগে...

—তোমার বস তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন?

—যাহ্, কী যে বল! ওটা কথার কথা। একটা বহুজাতিক সংস্থার এত বড় চাকুরে...

—তাতে কী? তুমিও তো বহুজাতিক সংস্থার কী-যেন?

—সেটাই তো তফাত। তিনি বস আর আমি কী-যেন!

—যাহ্, আমি ও-ভাবে কথাটা বলিনি।

—যাক, তুমি তা হলে আজ বইমেলায় যাবে?

—সে-রকমই তো ইচ্ছে।

অমল ভাবছে, ঈস রচনা আসবে বা সুদেষ্ণা ফোন করবে, এ-সব আগে থেকে জানলে তনুকে খামোখা এত তোষামোদ করতে হত না। রচনা সশরীরে এসে পড়েছে, ওকে তো আর 'না' বলা যায় না। তা ছাড়া বেচারা সেই কত দূর থেকে এসেছে। এখানে থাকবে মাত্র একটা দিন। ওর একটা অগ্রাধিকার আছেই। তার ওপর ও তনুর মতো অহঙ্কারী নয়, সুদেষ্ণার মতো সবকিছু হাল্কাভাবে নিয়ে 'দুর.কচু', 'ধ্যাৎ কচু' বলে না। রচনা একটু অভিমানী, এই যা। সব চাইতে ভাল হত, তনুকে আজ ফোন না-করলে আর সুদেষ্ণাকে কাটিয়ে দিতে পারলে। তা হলে আজ নিশ্চিন্তে রচনার সঙ্গে ঘোরাঘুরি, প্রেমট্রেম করা যেত। পুরো সময় ও মনোযোগ ওকেই দেওয়া যেত। এখন একইদিনে তিনধরনের তিন সুন্দরীকে নিয়ে অমল কী করে? এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারি মুশকিলে পড়া গেল। এ-দিকে তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রচনা জিগ্যেস করল, কী হল? এত কী ভাবছ?

—তোমার কথাই ভাবছি।

—ধুত, আমার কথা তুমি কত ভাব!

— বাহ্, কার কথা ভাবব তা হলে? বিশেষ করে তুমি এখন সামনে বসে আছ...

—সেই তো মুশকিল।

—কী মুশকিল?

—সামনে এলে আমার কথা ভাব, আর করিমপুর চলে গেলে...

যাক, ওর কথাই ভাবা হচ্ছিল, রচনা এটা অন্তত বিশ্বাস করেছে। অমল বলল, কী যে বলো!

রচনা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে একটা জেমস ক্লিপ টেনে সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অমল চুরি করে ওর বুকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করে, তোমাদের করিমপুরের খবর কী?

—করিমপুরের আর কী খবর, সীমান্তে যা হয়, ডাকাতরা ওপার থেকে এসে গরু চুরি করে নিয়ে যায়।

খুব আগ্রহ দেখিয়ে অমল প্রশ্ন করে, তাই না কী।

—ধ্যাৎ, তোমার তাতে কী? তোমার গরু, না তোমার ডাকাত?

—তার মানে!

—একটা কথা জিগ্যেস করব?

অমল রচনাকে লক্ষ করতে-করতে প্রশ্ন করে, কী কথা?

রচনা আজ অতিরিক্ত সেজেছে। পরেছে স্লিভলেস পাতলা ব্লাউজ। সঙ্গে ব্যাগে গরম জামাটামা আছে কি না কে জানে? আজই ও করিমপুর থেকে বাসে চেপে এসেছে। ওর ওপর দিয়ে এতটা পথ আসার ধকল গেছে। তারপর অফিসের কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, ও এইমাত্র প্রসাধন সেরে এখানে এসেছে। এত সাজ কার জন্য? বইমেলায় ঘোরার জন্য, না অমলকে প্রভাবিত করতে? অমলের ভারি মায়া হয় মেয়েটার জন্য। সে আবার জিগ্যেস করে, তুমি এখানে কোথায় উঠেছ? মানে রাত কাটাবে কোথায়?

রচনা অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, ভাবছি তোমার বাড়িতে থাকব। তোমার মার সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে!

অমল চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বাড়িতে?

তার চোখের দিকে তাকিয়ে রচনা বলল, আরে বাবা, এত ভয় পেয়ো না। আমরা গ্রামগঞ্জের লোক। আমাদের থাকা-খাওয়ার বিশেষ সমস্যা নেই। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।

—আরেব্বাবা, তুমি তো বাংলা সিনেমার হিরোদের মতো কথা বলছ!

—দেখলে তো এখানেই গোলমাল। এখনও হিরোদের মতো কথা বলছি। হিরোইনদের মতো কথা বলতে শিখিনি।

কী ব্যাপার, মেয়েটা এ-রকম অভিমানের গলায় কথা বলছে কেন? ও তো নিশ্চয় তনু বা সুদেষ্ণার কথা জানে না। তবে? ও কি ভেবেছিল, ও করিমপুরে বদলি হয়ে গেছে বলে অমল

ওকে লম্বা-লম্বা প্রেমপত্র লিখবে? এ-দিকে রচনা বলছে, শেয়ালদায় আমার পুরনো জায়গাতেই উঠেছি।

—সেই মেয়েদের হস্টেলে? ওখানে গেলেই জায়গা পাওয়া যায়?

অন্য দিকে তাকিয়ে রচনা বলে, গেলেই পাওয়া যায়, তা নয়। তবে চেনাশোনা তো, পেয়ে যাই। রচনা আঁচলে গলা ঢাকতে-ঢাকতে বলল তোমাদের ঘরটা বড্ড ঠাণ্ডা, বাইরের থেকেও।

—ঠাণ্ডা তো হবেই এয়ার-কন্ডিশনড...

—এই ঠাণ্ডাতেও এয়ার-কন্ডিশন!

—চারপাশ বন্ধ করে এয়ার-কন্ডিশন...অফিসগুলো তো এখন এ-রকমই হয়। বড়-বড় জানালা, দক্ষিণ খোলা এ-সব চিন্তা তো পুরনো হয়ে গেছে।

—থাকার ঘর তো ও-রকমই হওয়া উচিত?

—থাকার বলতে এখন তো সব ফ্ল্যাট-বাড়ি। ফ্ল্যাটের পাশে ফ্ল্যাট। সেখানেও তো এয়ার-কুলার, এয়ার-কন্ডিশনার...

—তুমি যে কী বল! দেশে ক-জন লোক ফ্ল্যাটে থাকে?

—সে-স্ট্যাটিসটিকস অবশ্য আমার হাতের কাছে নেই। তবে এ-ঘরে এয়ার-কন্ডিশন মেশিন চলার আরেকটা বড় কারণ, এখানে ফ্যাক্স, কম্পিউটার এ-সব আছে। কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট অবশ্য আলাদা। সেখানে ইন্টারনেট...

—ওহ্, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল এ-সব শুনলে আমার মাথা ধরে যায়।

—বলছ কী! জানো, ইউরোপের একটা দেশে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের এক নেতা কী বলেছিলেন, বলেছিলেন, আমরা হেরে গেলাম ফ্যাক্স আর ইন্টারনেটের জন্য। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত দ্রুত আর সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে...

রচনা হাসছে। ওর হাসিটা অমলের মোটেই ভাল লাগছে না। ও কি তার কথা বিশ্বাস করছে না? নাকি ওর হাসির মধ্যে বিদ্রূপ আছে? অমল জিগ্যেস না-করে পারে না :

—হাসছ কেন?

—এমনি।

—এমনি-এমনি কেউ হাসে!

—কেউ হাসে না, কেউ হাসে।

—ও।

—আচ্ছা আর হাসব না। তখন তোমাকে যা বলতে যাচ্ছিলাম...

—বলো?

—তুমি যেখানে কাজ কর, এই যে-বহুজাতিক সংস্থা, এই সংস্থাকে তুমি খুব ভালবাস, তাই না?

—ভালবাসাবাসির কী আছে! আমি পেশাদার। আজ এখানে আছি, কাল হয়তো অন্য জায়গায় থাকব। বেটার অফার পেলে আবার আরেক জায়গায়...

—তবে? তবে সংস্থার প্রতি আনুগত্য, ভালবাসা এ-সবের কোনও মানে নেই?

—আছে আবার নেই-ও?

—মানে?

—দ্যাখো, এটা প্রফেশন্যালদের যুগ। যতক্ষণ এখানে আছি জান, দিয়ে এ-সংস্থার হয়ে লড়ে যাব। অন্য সংস্থার ব্যবসা কেড়ে নেব। আবার কাল অন্য জায়গায় গেলে সে-সংস্থার জন্য প্রাণপাত করব। হয়তো এখনকার সংস্থারও ব্যবসা কাড়ার চেষ্টা করব। এখানে এখন কাজ করছি মানে এ নয় যে এই কোম্পানির সঙ্গে সারা জীবনের মতো আমার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে।

—কী নিষ্ঠুর তোমাদের এই প্রফেশন্যলিজম। আগে দেখেছি, বাবা-জ্যাঠারা যে-কোম্পানিতে কাজ করতেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই থাকতেন। তাঁরা রিটায়ার করার পরও গর্ব করে সেই কোম্পানির নাম বলতেন। মানে একধরনের একাত্মতা...

অমল হাসে, নিষ্ঠুরতার কী আছে? সবকিছুই তো পাল্টে যাচ্ছে।

—সব পাল্টাচ্ছে? সত্যি সব পাল্টাচ্ছে?

—সব।

—ঠিক আছে। আমি আসলে যা জানতে চাইছিলাম, মাল্টি-ন্যাশনালগুলো তো বেশির ভাগই বিদেশি কোম্পানি, কিন্তু ভাব-ভঙ্গি এমন যেন কোম্পানিটা এ-দেশেরই...

—বাঃ, সে তো করতেই হবে। আসল কথা বাজার দখল করা তো? এখন বাজার বলতে বোঝায় শুধু একটা এলাকা বা দেশ নয়। গোটা বিশ্ব। আমি ধরো কনজিউমার গুডসের ব্যবসা করব, তো আমি চাইব গোটা পৃথিবীতে মালটা চালাতে। কেমন? গোটা পৃথিবী বলতে কী বোঝাচ্ছি, যেখানে-যেখানে মালটা চলতে পারে। সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। ঠিক আছে! এখন গোটা পৃথিবী বলতে তুমি হয়তো ভাবছ বিরাট ব্যাপার একটা। না, তা নয়। এখন যাতায়াত যোগাযোগের ব্যবস্থা এত উন্নত হয়েছে যে পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে। আমরা বলি, ওয়ার্লড ভিলেজ। এখন আমি যে-মালটা কলকাতা বা ভারতে বিক্রি করব সেটা কানাডাতেও চালাতে হবে, সিঙ্গাপুরে বা অস্ট্রেলিয়াতেও।...

—সে তো হল। আমি বলছিলাম...

—আসছি, তোমার কথাতেই আসছি। এই যে এক-একটা দেশ...প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আলাদা, ইতিহাস আলাদা। এগুলো বুঝতে হবে। ধরো স্পোর্টস...এক-একধরনের খেলা এক-এক জায়গায় বেশি জনপ্রিয়। সেই-যে সংস্কৃতে আছে না যস্মিন দেশে যদাচার... যে যে-কথা যে-ভাবে বললে সহজে বোঝে আর খুশি হয় সে-কথা সে-ভাবে বলতে হবে। আমাদের দেশেই দ্যাখো না কোথাও দুর্গাপুজো, কোথাও-কোথাও পোঙ্গল, কোথাও আবার গণেশপুজোর সঙ্গে সামিল হতে পারলে সাধারণ লোকের মন পাওয়া যাবে।

—এ তো প্রায় ষড়যন্ত্র।

—যে যে-ভাবে দ্যাখে। কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। দিনে-দিনে প্রতিযোগিতা বেড়েই চলেছে। রাস্তার হোর্ডিং-এর দিকে তাকালেই টের পাবে। ধরো, টিভি। আগে কটা কোম্পানি ছিল। তার মধ্যে কটার নাম এখন শুনতে পাও? আর নতুন-নতুন কত নাম উঠে আসছে। তারপর ধরো...

—থামো বাবা। আর বলতে হবে না। একদিনে এতকিছু আমার মাথায় ঢুকবে না। ছেড়ে দাও। তুমি তা হলে বইমেলায় যাবে না?

—যাব না বলিনি তো!

—তোমার কী কাজ আছে বলছিলে?

—আমরা চারটে, না, সাড়ে-চারটায় বেরোব। বইমেলায় থাকব ধরো সাড়ে-পাঁচটা...

—বাবা, এত হিসেব!

—বললাম যে আমার জরুরি কাজ আছে একটা!

—আমি দু-একটা বই কিনব ভেবেছিলাম। তা আর হবে না বোধহয়।

—একঘণ্টার বেশি সময়ে বই কেনা হবে না!

—গিয়েই হুট করে কেনা যায়! আগে বই ঘেঁটে দেখতে হবে, না যাক গে...

—না, মানে, আমি যদি আগে থেকে জানতাম, তুমি আজ আসবে...

—জানলে কী করতে শুনি?

অমল তো রচনাকে বলতে পারবে না, আগে জানলে সে আজই গায়ে পড়ে তনুকে ফোন করত না, তারপর সুদেষ্ণাকে যা-হোক-কিছু একটা বলে থামাত। সে মুখে বলল, অনেককিছু করতে পারতাম।

রচনা হেসে বলল, তোমার কথাবার্তায়ও বহুজাতিক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে!

কী বলতে চায় মেয়েটা! অমল জিগ্যেস করে, মানে?

রচনা আবার হাসল, বলল, কিছু না।

রচনা এ-বার উঠে দাঁড়িয়ে, যেন দীর্ঘশ্বাস চাপতে-চাপতে বলল, ঠিক আছে। আমি তা হলে চলি এখন।

বিস্মিত অমল জিগ্যেস করে, যাবে! কেন?

বুকের ওপর আঁচল টেনে ঠিক করতে-করতে রচনা বলল, সাড়ে-চারটে বাজতে এখনও অনেক দেরি। এসপ্ল্যানেডে আমার একটু কাজও আছে।

—তা হলে?

—কাজ সেরে আমি পার্ক স্ট্রিটের দিকের গেটে দাঁড়িয়ে থাকব, ও-দিকে গেট হয়েছে তো এ-বারও?

—হয়েছে বোধহয়।

—ঠিক আছে। সময়মতো এসো কিন্তু?

রচনা চলে গেল। ও কি একটু রাগ বা অভিমান নিয়ে গেল? কিন্তু অমলের এখন শুধু রচনাকে নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। তাকে মনে রাখতে হবে, সাড়ে-চারটেয় রচনা বইমেলার গেটের কাছে, ছটায় তনু—মেট্রো স্টেশনে, আর সাতটায় সুদেষ্ণা—কফি হাউজের পাশে। তনু মেট্রো স্টেশন, না কফি হাউজ? সুদেষ্ণা কফি হাউজ না মেট্রো?... এই রে, গুলিয়ে গেছে, লিখে রাখলে ভাল হত। যাঃ! লিখে রাখাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। মোট কথা, মনে রাখতে হবে ছটায় মেট্রো, সাতটায় কফি হাউজ। স্থান-কাল ঠিকই আছে। পাত্রী যে-ই হোক। তফাত কী?

তবে, তফাত থাক না-থাক, তিনজনকে একদিনে ঠিকভাবে সামলানো সহজ কথা নয়। দেখতে হবে, কারও যেন কোনওরকম সন্দেহ না-হয়, বিন্দুবিসর্গও যেন টের না-পায় কেউ, আবার কারও যেন মনে না-হয়, তার ওপর কম মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লেও চলবে না। একটানা উৎসাহ দেখিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে বেশি সাবধান হতে হবে প্রথম ও তৃতীয় নায়িকা সম্পর্কে। প্রথমজন মানে রচনা ইদানীং যেন কেমন বাঁকা-বাঁকা কথা বলছে। ওর মনে কি কোনওরকম সন্দেহ ঢুকেছে, না কি হতাশা দেখা দিয়েছে? মেয়েটাও কেমন-যেন অন্য ধরনের! তৃতীয়জন, তনু বা সুদেষ্ণা যে-ই হোক, তার সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। কারণ সাড়ে-চারটে থেকে ঘোরাঘুরি করে, একইধরনের কথা বলে-বলে অমল স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু, না, কথায় ব্যবহারে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ পড়লে চলবে না। আজ অমলের একধরনের পরীক্ষা। আজ বোঝা যাবে, বিপণনে সে কতটা পেশাদার ও পারদর্শী হয়ে উঠেছে! দ্যাখা যাবে, সে নিজেকে কতটা পরিবেশনযোগ্য করে তুলতে পেরেছে? চাহিদা তৈরি করে বজায় রাখতে পারছে কতটা?...অমলের হঠাৎ রচনার একটা মন্তব্য মনে পড়ে যায় : 'তোমার কথাবার্তায় কেমন বহুজাতিক গন্ধ।'...রচনা কি বিবেকসুন্দরী নাকি!...অমল তো তিনজনকে একসঙ্গে ডাকেনি। সে শুধু তনুকে ফোন করেছিল। বাকি দু-জন নিজে থেকে এসেছে। তনুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর সে যদি বাকি দু-জনকে বীরত্ব দেখিয়ে বলত, না ভাই, আজ তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, তা হলে ভাল হত? ওরা আঘাত পেত না? সুন্দরীদের আঘাত দেওয়া কি ভাল? কোনও দেশের কোনও মহাপুরুষ বলেননি, সুন্দরীদের আহত করা ভাল। তবে? তিনজনকেই একটু-একটু ভালবাসা দিলেই হবে। এই একটু-একটু যোগ করলে বিরাট অঙ্কের ভালবাসা হয়ে যাবে। আহা রে, ভালবাসার আর আগের দিন নেই। দিনের-পর-দিন একজনকেই শুধু পুরো ভালবাসা দিয়ে যাওয়া, পুরো ভালবাসা, গোটা ভালবাসা বলে এখন আর কিছু হয় না। হয়?

বইমেলার গেটের কাছে গিয়ে অমল গাড়ি ছেলে দিল। তাকে এখন ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে হবে। এমনও হতে পারে, মানে পরিস্থিতি সে-রকম হলে মেলার বাইরেও কোনও রেস্তোরাঁয় যেতে হতে পারে। একাধিকবারও যেতে হতে পারে। রেস্তোরাঁয় বা অন্য-কোথাও। ড্রাইভারকে এতসব কিছুর সাক্ষী করে রাখার দরকার নেই।...গাড়ি থেকে নেমে অমল শিস দিতে-দিতে এগোল। গেটের দিকে। ওই তো, রচনা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কেন? একা দাঁড়িয়ে আছে রচনা। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। অমল নিজের হাতের ঘড়ি দেখে নিল। পাঁচটা বাজতে বারো মিনিট বাকি। সে গিয়ে রচনার পেছনে দাঁড়াল। রচনা ঘড়ি দেখছে। পেছন থেকে ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে অমল জিগ্যেস করল, কার জন্য অপেক্ষা করছ?

রচনা দ্রুত পিছন ফিরতে নাকে নাকের ধাক্কা না-বলে বলা উচিত, ঘষা লাগল। অমল একটা আঙুল রচনার নাকের ওপর রেখে ভারি মমতার গলায় জিজ্ঞেস করল, লেগেছে?

অপ্রস্তুত রচনা দু-পা সরে গিয়ে বলল, কী যে করো এত লোকের সামনে!

অমল চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, তা হলে চলো লোকের চোখের আড়ালে!

—ধ্যাত অন্য-কোথাও যেতে হবে না, টিকিট কাউন্টারের দিকে চলো।

পকেট থেকে দুটো কার্ড বার করে অমল বলল, আপনার সেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত।

রচনা হেসে অমলের বাহু ধরতে হাত বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, চলো?

ভেতরে এসে ছোট-বড় প্রায় সব স্টলেই ঢুকতে চায় রচনা। এমনকী লিট্‌ল ম্যাগাজিনের স্টলের দিকেও ছুটে যাচ্ছে। এ তো বড় ঝামেলায় পড়া গেল! খপ করে ওর হাত ধরে অমল বলল, চলো বিদেশের স্টলগুলো দেখা যাক।

ফ্রান্সের স্টলে ঢুকতে গিয়েই চোখ পড়ল, এই রে ভেতরে পরিচিত একজন বসে আছে। কী দরকার ঝামেলা বাড়ানোর? অমল ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না। রচনা জিগ্যেস করল, কী হল?

—চলো, অন্যগুলো আগে দেখি।

রচনা তার মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।...বাংলাদেশের স্টলে একটি মেয়ে রচনাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল। তার মানে সে রচনাকে চেনে, অমলকেও চিনে রাখল। তার মানে তনু বা সুদেষ্ণাকে নিয়ে বাংলাদেশ স্টলের ত্রিসীমানায় আসা যাবে না। ঠিক আছে।

একটা স্টলে শুধু কম্পিউটার, আর-এক জায়গায় ইন্টারনেট ব্যবস্থা দেখে অমলের উৎসাহ বেড়ে গেল আবার। রচনার কাঁধ চেপে ধরে বলল, দেখলে এখানেও আধুনিক বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা পৌঁছে গেছে!

রচনা অমলের মুখের দিকে তাকাল। কাঁধ ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি কি ভাব, এই মেলা, এই শহরটাই সারা দেশ!

—দেশ না-হলেও দেশের একটা ছবি তো এখানে পাওয়া যায়?

—কচু।

এ কী! একজনের মুখে আর-একজনের সংলাপ! ঠিক আছে। ক্ষতি নেই। অমলকেও তো তিনজনের সঙ্গে একইভাবে কথা চালাতে হবে। এ-দিকে রচনা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করছে, তুমি তো রোজ খবরের কাগজ পড়ো?

—নিশ্চয়।

—জেহানাবাদে গণহত্যার খবরটাও নিশ্চয় পড়েছ?

কী বলতে চায় মেয়েটা? অমল শান্তভাবে বলল, পড়েছি। কিন্তু...

—তুমি বলছিলে না, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কোথায় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেছে, বলেছিলে না, পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে—ওয়ার্ল্ড ভিলেজ! তুমি খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ, জেহানাবাদে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। একটা টেলিফোনও নেই। নেই ওয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগও। ঘটনা ঘটে যাওয়ার কত ঘণ্টা পরে প্রশাসন খবরটা পেয়েছে, তারপর পুলিশ সেখানে কখন পৌঁছেছে, পড়নি? তুমি কি বলতে চাইবে জেহানাবাদ বা জেহানাবাদের মতো জায়গাগুলি আমাদের দেশের বাইরে?

এই মেয়েটা তো বড় তার্কিক হয়ে উঠেছে! কিন্তু উত্তেজিত হলে চলবে না। অমল বলল, টেনশন কোরো না তো। তুমি যা বলছ তা ঠিক। আমি যা বলেছি তা-ও ভুল নয়।...তুমি এখন কিছু খাবে? অনেকক্ষণ তো এসেছ, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

রচনা হাসল। সেই অদ্ভুত হাসি। তারপর হাঁটার দিক-পরিবর্তন করে বলল, কফি হাউজে চলো।

কফি হাউজ!—অমল যেন চমকে উঠল। তিনজনের একজন তো কফি হাউজের সামনে দাঁড়াবে বলেছে, সে-ও নিশ্চয় কফি হাউজে ঢুকতে চাইবে। রচনা জিগ্যেস করল, কী হল?

অমল ঢোক গিলে বলল, অন্য-কোনও ভাল জায়গায় চল!

—চলো।

খাবারের দোকানে বসে অমল বলল, আমি কিন্তু বিশেষ-কিছু খাব না।

তাকে আরও বার দুয়েক খাবারের দোকানে ঢুকতে হবে। প্রতিবারই কিছু-না-কিছু খেতে হবে। রচনা জিগ্যেস করে, তুমি তো সোজা অফিস থেকে এসেছ, খাবে না কেন?

উত্তর খুঁজতে হল অমলকে। তারপর বলল, না, মানে, আজ লাঞ্চ একটু হেভি হয়ে গেছে। খেয়েছিও দেরিতে...।

খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়। খাবার আসে। কথাবার্তা চলে। অমল লুকিয়ে হাতের ঘড়ি দ্যাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ঘড়ি দ্যাখাটা রচনার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে, এখন এখানে না-এলেই ভাল হত। তোমার আবার কাজের দেরি হয়ে যাবে।

কথাটা ঠিকই। অমলও তা-ই ভাবছে। কিন্তু মুখে বলল, না, না সে কী কথা।

রচনা বলল, এ-ভাবে একা-একা খাওয়া যায়! ভারি বিচ্ছিরি লাগছে।

অমল কি একটু লজ্জিত হয়! তার কাজে-কথায় কিছুটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে? সে তো সত্যি মেয়েটাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ-রকম তো হওয়ার কথা নয়। পেশাদারদের যে-কোনও ক্ষেত্রে, যে-কোনও কাজ মসৃণভাবে করতে হবে। সময়ের মধ্যে কাজ সারতে হবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে যখন যে আছে, তার যেন কিছুতেই মনে না হয় যে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে। যেন ভুল সংশোধন করতে অমল রচনার প্লেটের চিকেন-কাটলেট থেকে কিছুটা ভেঙে তুলে নিল। মেয়েটার মুখ দেখেই বোঝা গেল, অমল সফল হয়েছে। সাফল্য দু-দিক থেকে। এক, মেয়েটার অস্বস্তি কাটানো গেল; দুই, প্লেটের খাবারের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সময়ও কিছুটা বেঁচে গেল। সহজ অঙ্ক—একই খাদ্য চিবিয়ে গলাধঃকরণ করতে একজনের যে-সময় লাগে, দু-জনের তার চাইতে কম সময় লাগবে।

যাওয়ার আগে রচনা বলল, তোমাকে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করে।

অমল কোনও উত্তর দিল না কারণ ঘড়িতে তখন ছ'টা বেজে গেছে।...প্রায় ছুটতে-ছুটতে মেট্রো স্টেশন। তনু রেগে বলল, তখনই বলেছিলাম, একা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বিশ্রী লাগে।...অমলের ক্ষমাপ্রার্থনা। মেলায় ঘোরাঘুরি আবার। আগের খাবারের দোকান, বাংলাদেশ স্টল এড়িয়ে। তনু বলল, ফ্রান্সের স্টলে যাব একবার।

অমল নির্ভয়ে বলে, চলো!

কিন্তু ভেতরে ঢুকতে অমলের সেই পরিচিত লোক বলে উঠল, আপনাকে যেন এর আগে একবার...বলতে-বলতে সে তনুর দিকে তাকাল তারপর রহস্যময় হাসি হেসে বলল, না, ভুল দেখেছি বোধহয়।

স্টল থেকে বেরিয়ে তনু অমলের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে জিগ্যেস করল, আমার সঙ্গে দ্যাখা হওয়ার আগে আর-কারও সঙ্গে মেলায় ঢুকে পড়েছিলে নাকি?

অম্লান বদনে অমল বলল, সে কী, আমি তো সোজা অফিস থেকে এলাম।

—অ, তা তোমার কবিরা কোথায়, চলো!

গিয়ে শোনা গেল, কবিরা খোলা মঞ্চে সাতটার পর আসবেন। তনু যেন আপনমনেই বলে উঠল, তা হলে?

ডুবিয়েছে তনু, যদি কবিতার আকর্ষণে সাতটার পর থেকে যেতে রাজি হয়ে যায় তবে তো সুদেষ্ণার সঙ্গে ওর চুলোচুলি বেঁধে যাবে।...কিন্তু না, তনু বলছে, তা হলে তোমার সঙ্গে আজ আর কবিদের দেখা হল না।

সাতটা বাজার মিনিট-দশেক আগেই তনু বলল, আমাকে তো এ-বার যেতে হবে।

অমলও ভাবল, এখন গেলেই ভাল। তা হলে সুদেষ্ণা আসার আগে কোথাও বসে একটু দম নেওয়া যাবে। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে হাঁটাহাটি করে এখন একটু ক্লান্তই লাগছে। কিন্তু মুখে বলতেই হয়, সে কী, এখনই যাবে! চা-টা কিছু খেলে না তো?

তনু বলল, আর-একদিন হবে। আমাকে একটু এগিয়ে দাও?

আবার এগিয়ে দিতেও হবে! কী আর করা যাবে, অমলকে বলতে হল, চলো।

তারা বেরোল ময়দানের দিকের গেট দিয়ে। অল্প দূরে গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তনু কি কোনও গাড়ি খুঁজছে? কে জানে? একটু আড়ালে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে তনু হঠাৎ অমলকে বড় করে চুমু খেল। তারপর বলল, শনিবার দুপুরের দিকে আমার বাড়িতে এসো। গুড নাইট...

অমল হেঁটে এগিয়ে গিয়ে আর-একটা গেট দিয়ে মেলায় ঢুকল। মনে হয়, তনুদের বাড়ির ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে বা এসেছে।...যাক গে, তনুকে নিয়ে আপাতত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এখন ভাবতে হবে সুদেষ্ণার কথা। তার আগে বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার। অমল পকেট থেকে মোবাইল বার করে মা-কে ফোনে জানাল, ফিরতে একটু দেরি হবে।

দেরি হতে পারে। সুদেষ্ণা কখন ছাড়বে জানা নেই। তা ছাড়া, অমলেরও এখন তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। সে ধীর-পায়ে কফি হাউজের দিকে এগোচ্ছে। সুদেষ্ণা তনুর মতো রাগী নয়, অভিমানী নয় রচনার মতো। তবে ও খেতে খুব ভালবাসে। ওকে ভাল করে খাওয়াতে হবে। অমলকেও কিছু খেতে হবে। খিদে পেয়েছে...দূর থেকে সুদেষ্ণাকে দেখে অমল নিজের পিঠ চাপড়িয়ে দেয়, বাহ্, বেশ চালিয়ে যাচ্ছ! চালাও!...কাছে যেতে সুদেষ্ণা আহ্লাদী গলায় বলে উঠল, দুর কচু, তখন থেকে অপেক্ষা করছি।

তারপর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমলের গালে হাত দিয়ে সে বলল, ঈস, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোমার অফিস খুব খাটাচ্ছে, না?

এ-বার অমলের জুতোর দিকে নজর পড়তে সুদেষ্ণা বলে উঠল, এ ম্যা, এত ধুলো কেন? তুমি আগে থেকেই মেলায় ঘুরছ না কি?

—না, মানে হ্যাঁ...।

—না, মানে হ্যাঁ?

—হ্যাঁ, তোমাকে বলেছিলাম না কাজ আছে? কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তাই...

সুদেষ্ণা দু-হাতে অমলের বাহু জড়িয়ে ধরে হাসতে-হাসতে বলল, তাই তুমি আমার আগেই মেলায় চলে এসেছ!

—তুমি কফি হাউজে ঢুকবে তো?

বুক দিয়ে অমলকে ঠেলতে-ঠেলতে সুদেষ্ণা বলল, কফি খাব কেন কচু। আমি বেনফিশের মাছ আর মাদার ডেয়ারির দই খাব।

সারা মেলায় অমল সুদেষ্ণার উষ্ণ বুকের ঠেলা খেতে-খেতে ঘুরলে লাগল। সুদেষ্ণা এর মধ্যে খেয়েছে বেশ কয়েকটা মাছভাজা আর তিনবাটি দই। কথা হয়েছে রবিবার সে আবার বইমেলায় আসবে। তারপর তারা অন্য-কোথাও যাবে। এক ফাঁকে অমল তাকে মেলার খোলা মঞ্চের কাছে নিয়ে গেল। ভিড় দেখে সুদেষ্ণার প্রশ্ন, এখানে কী হচ্ছে কচু?

—দেখছ না কবিবা...

—দুর কচুপোড়া কবিতা শুনলে আমার মাথা ধরে যায়।

—বেশিক্ষণ থাকব না। একটু দাঁড়াও!

বলতে-বলতে অমল টের পেল, সুদেষ্ণার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে না-এলেই ভাল হত। ওই যে, রচনা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে বাংলাদেশ-স্টলের সেই মেয়েটি। দু-জনে মন দিয়ে কবিতাপাঠ শুনছে। রচনা এতক্ষণ মেলায় আছে, অমলকে কি তার চোখে পড়েনি? আর আর ডানদিকের কোণে তনু এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

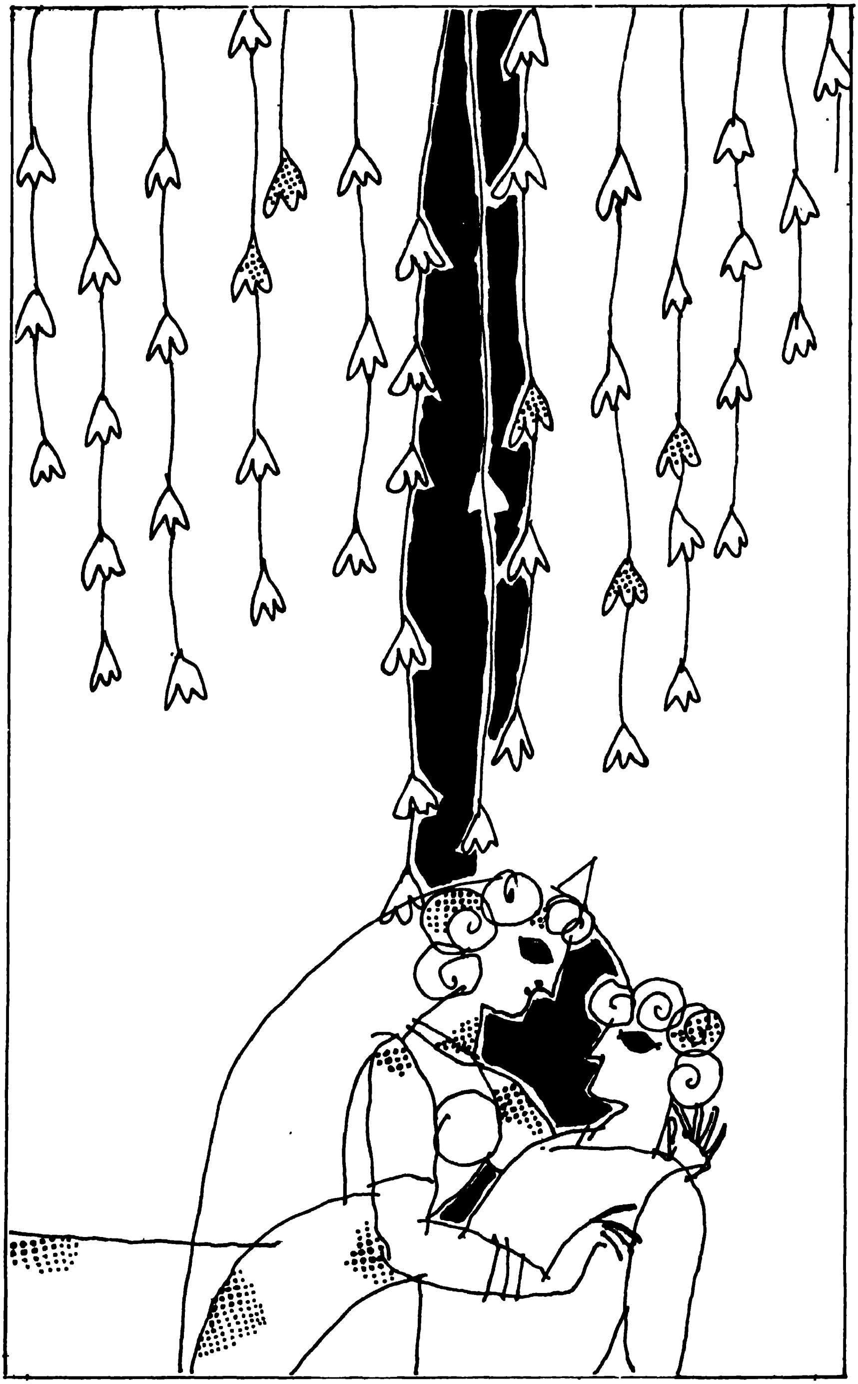
মেলার বাইরে বেরিয়ে এল অমল। সুদেষ্ণাকে নিতে এসেছে একজন। সে নাকি তার মাসতুতো ভাই। কে জানে, সত্যি কি না?...সুদেষ্ণা কানের কাছে 'তা হলে রবিবার'—বলে চলে গেল। অমল হাঁটতে-হাঁটতে গেল রাজভবনের দিকে। এখানে বাসে কম ভিড় হবে। হলও। অমল মিনিবাসে বসার জায়গাও পেয়ে গেল। সব ঠিক আছে। ঠিক-ই আছে তো! তবু এতক্ষণের ক্লান্তি ছাপিয়ে তার বুকের মধ্যে কীরকম কষ্ট হচ্ছে কেন? কষ্ট হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। আছে? সে একটু-একটু ভালবাসা দিয়েছে, পেয়েছেও একটু-একটু। তবে?

মিনিবাসে অমলের সামনে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। ম্লান-পোশাক, ম্লান-চেহারার। হঠাৎ সামনের-সিটে-বসা একজন বলে উঠল, সুরভি, তুমি!

যুবতীর মুখে যেন আলো জ্বলে উঠল, তুমি!

সামনের সিটের যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এসো, এসো। তুমি বোসো এখানে।

তার চোখ-মুখও আলোকিত। অমল নিজের অজান্তে নিজের বুকের ওপর হাত রাখে। এই আলো সে তো কখনও তনু বা সুদেষ্ণার মুখে দ্যাখেনি, রচনার চোখে-মুখেও না। কিন্তু ছোট্ট বা বিরাট পৃথিবীতে এখনও আছে এ-রকম আলোর উৎস! বুকের ভেতরটাও আলোকিত হয়ে ওঠে ভোরের অমল আকাশের মতো, এমন আলো এখনও আছে! আছে সত্যি! ●





কারাগার

ফুলশয্যার খাটের দিকে চেয়ে থমকায় প্রমিত। ফুলের শোয়ানো হাল্কা লম্বা মালা আর তোড়া এবং পাপড়ির গা-লাগা অলংকারের ছোট স্তূপ। গা থেকে সমস্তই খুলে ফেলেছে দীপিতা। প্রমিত ভাবল, অলংকারগুলি মিলনে বিঘ্ন হবে বলেই বউ খুলে ফেলেছে। কিন্তু বিছানার মাঝখানে এ-ভাবে না-রাখলেই পারত। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়।

প্রমিত অলংকারের দিকে হাত বাড়িয়েছে দেখে ঘোমটার আড়াল থেকে দীপিতা বলল...দেখে নিন, সব ঠিক আছে কি না। চাইলে গুনে নিতেও পারেন। আমি পাকা-দ্যাখার হিরের আংটিটাও খুলে দিয়েছি। সমস্ত বুঝে নিন। আর শুনুন, একসঙ্গে আমাদের শোওয়া হবে না।

দীপিতা ফুলে-ফুলে-সাজানো সাদা বিছানায় খাটের-প্রান্তে-পাতা জোড়া বালিশের কাছে ভারী নিতম্ব ঠেকিয়ে আলতো ভঙ্গিতে বসে কথাগুলি একনাগাড়ে বলে গেল। প্রমিতের দিকে মুখ ফেরাল না। অলংকারগুলি স্পর্শ করতে পারল না প্রমিত, যেন তার আগুনে হাত পুড়ে যাচ্ছিল, সে-ভাবে আঁতকে উঠে হাত গুটিয়ে নিয়ে বিছানার ধারে বসে পড়ল। সিল্কের ঘিয়ে পাঞ্জাবির উপর গলা থেকে ঝুলন্ত ভারী ফুলের মালাটা তাকে সহসা ব্যঙ্গ করে উঠল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, শুভদৃষ্টির সময় দীপিতা কিছুতেই তার সঙ্গে দৃষ্টি মেলায়নি। চরম ব্যহত সেই দৃষ্টি শূন্যে উঠে গিয়েছিল।

গভীর হতাশায় ভাঙা সুরে প্রমিত তার হাত-দুখানি পায়ের ফাঁকে কোলের উপর শিথিলভাবে ফেলে রেখে বলল—তুমি তা হলে এ-বিয়ে চাওনি?

কঠিন এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল দীপিতা—না।

কান্নার চেয়ে দ্রব একফালি হাসি কোথা থেকে উড়ে এসে প্রমিতের ঠোঁটের কোণে দেখা দিল, প্রমিত জানতে চাইল—কেন চাওনি?

দু-দণ্ড চুপ করে থেকে নিতান্তই আবেগশূন্য গলায় দীপিতা বলল—পাকা দেখার দিন আমাকে দেখে আপনারা যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন বাড়ির একজনের হাত দিয়ে আপনার কাছে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি আপনি পেয়ে থাকবেন।

দীপিতার কথা সমর্থন করে প্রমিত বলল—হ্যাঁ।

দীপিতা বলল—ওই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার কিছু বলবার আছে, খুবই জরুরি। কোথায় দেখা করব, তা-ও জানিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি অপেক্ষাও করেছি। আপনি আসেননি।

প্রমিত গলাটাকে একটুখানি শক্ত করে বলল—হ্যাঁ, যাইনি। তোমার সম্পর্কে সমস্ত কথা দিবাকর আমাকে বলেছে। একদিনে বলেনি। অনেকদিন ধরে বলেছে। দিবাকরই চায়নি আমি ওইভাবে দেখা করি। দিবাকর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, ও চেয়েছে এবং আমার ওপর চাপ দিয়েছে বলেই এ-বিয়ে হয়েছে। আমি তোমাকে চিনতামই না।

—আমার সম্পর্কে আপনি সব কথা জেনেছেন, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করলেন না? কেউ চাপ দিলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়?

—তুমি নিজেও তো তাই-ই করলে। কেন করলে?

—সংসারে একটি মেয়ে কতভাবেই না বাধ্য হয়, এ-যুগের মানুষ হয়ে আপনি বোঝেননি?

—দিবাকরের কাছ থেকে নানাভাবে আমি যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় না, আমি কোনও খারাপ কাজ করেছি। তোমাকে চিনতাম না, কিন্তু জানতাম না, তা নয়।

—শুনুন, আপনি খুবই খারাপ কাজ করেছেন। ভুল করেছেন। সেই ভুল আপনাকেই শোধরাতে হবে। আমি বরুণের বাগদত্তা। দিবাকর এবং আপনার চোখে সে খুব খারাপ ছেলে, অযোগ্য। কিন্তু সেই অযোগ্য, খারাপকেই আমি ভালবেসেছি। বরুণ একটা মাস্তান। দিবাকর ওকে মাস্তান ছাড়া কিছুই মনে করে না। বরুণের অনেক ঘাট, অনেক খামতি। কিন্তু সে আপনার মতো কারও গায়ে পড়ে উপকার করতে যায় না। বরুণের মাস্তানি সারাজীবন সহ্য করতে পারব, কিন্তু আপনার উপকার করাটা আমার আর এক-মুহূর্তও সহ্য হচ্ছে না। এই ঘরে পা দিয়েই মনে হল, আমার সব ভুল হয়ে গেছে। সমস্ত মাটি করলাম আমি! বলে ভেজা চোখ ঘাড় সামান্য বাঁকিয়ে প্রমিতের দিকে মেলে দিল দীপিতা। তার গলার তীব্র চাপা হাহাকার ঘরের বাতাসকে ভারী করে তুলল। দীর্ঘক্ষণ কথা বলে এ-বার আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল দীপিতা। দু-হাতে মুখ ঢেকে সারা অঙ্গ কান্নার আবেগে কাঁপাতে থাকল। সেই ধাক্কায় তার শরীর থেকে ফুলের পাপড়ি খসে পড়ল।

মেঝেয়-খসে-পড়া একটি পাপড়ি হাতে করে তুলে নেয় প্রমিত। বাঁ-হাতের তালুর উপর নেয়। বোকার মতো সেই পাপড়ির দিকে চেয়ে থাকে। সত্যি-সত্যিই কার জীবন মাটি হল সে ভেবে উঠতে পারে না। কেবলই তার মনের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা আছড়ে-আছড়ে পড়তে থাকল, ধোবার পাটায় যে-ভাবে ভেজা কাপড় আছড়ে পড়ে—কেন সে দিবাকরের কথায় এ-ভাবে বশ হয়ে পড়ল! কেন সে এই বিয়েতে রাজি হল!

দিবাকর সেই কবে থেকে দীপিতার কথা বলে আসছে। কীভাবে বরুণ মেয়েটার পিছনে লেগে পড়ে আছে, তা-ও বলেছে দিনের পর দিন। দীপিতা মাতৃপিতৃহীন বলে কড়া করে তারা শাসন করতেও পারে না।

ইলেভেন ক্লাস থেকে কলেজের শেষ বর্ষ পর্যন্ত দীপিতাকে পাড়ার মাস্তানটা অনুসরণ করে এসেছে। দীপিতা বরুণকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এমনকী অনেকদিন বাড়ি পর্যন্ত বরুণ চলে এসেছে দীপিতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে। তারা দু-জন যখন পাশাপাশি কথা বলতে-বলতে হেঁটে গেছে, সেই দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি দিবাকর। একটা অত্যন্ত বাজে ছেলে

এইভাবে নির্লজ্জের মতো চোখের উপর দিয়ে তার বোনের সঙ্গে ঘুরবে, কথা বলবে, অথচ চুপ করে থাকতে হবে—বলো প্রমিত, এ কি ঠিক হচ্ছে? বাবা-মা বোনকে কড়া করে কিছুই বলবে না, কারণ দীপিতা ওঁদের নিজের মেয়ে তো নয়। অথচ খারাপ কিছু হয়ে গেলে আমাকে দুষবে। বলবে, তুই দেখলি না! কী করা যায়, বলো তো!

প্রমিত শুনতে শুনতে একদিন বলে বসল—তুমিই ওর অভিভাবক। কারণ তুমি ওর জীবন সম্পর্কে যত শঙ্কিত, ওর মামা-মামি তার দশভাগের একভাগও নন। ওঁরা হয়তো ভাবছেন—

দিবাকর বলল—বাবা স্বভাব-আলগা মানুষ। মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে দেখেও দেখে না। দেখেও না-দেখার ভান কেন করে জানো! শুধু উদাসীন বলেই নয়, বরুণকে ভয়ও পায়। তা ছাড়া বরুণ বাবার পার্টির লোক। বাবা চিরকালের কমিউনিস্ট। আজ ওই পার্টিতে বরুণদের মতো অনেক লুম্পেন ঢুকেছে। এইরকম লুম্পেনরা বোল্ড ক্যাডার, পার্টির জন্য জান দিয়ে ফেলতে পারে। এদের যত্ন করে না-পুষলে চলবে কেন?

প্রমিত বলেছিল—এই অবস্থায় পার্টির উপর-নেতৃত্বকে তুমি বলতে পারো না?

দিবাকর হেসে ফেলে বলেছিল—বাবাই তো নেতা, আর কাকে বলতে যাব আমি! উপরের নেতারা তো বাবার কাছেই ঘটনার ডিটেলস চাইবে। বাবা বলবে, ও কিছু নয়।

প্রমিত প্রশ্ন করেছিল—তুমি সরাসরি দীপিতার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

দিবাকর গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল—বলেছি। বলেছি, পার্টি দুর্বৃত্ত পোষে তুমি জানো না? ও বললে কী জানো? বলল অদ্ভুত কথা। বরুণ নাকি বলেছে, ওর সঙ্গে কথা না-বললে ভোজালি মেরে দীপিতার গলা কেটে নামিয়ে দেবে। শুধু তাই-ই নয়, কোথায় কার গাল সে চিরে দিয়েছে, তা-ও বলেছে। এবং একখানা ভোজালি দীপিতাকে দিয়ে বলেছে, এটা দরকার হলে বাড়িতে দেখাবে, নিয়ে যাও। সেই বস্তুটা আমি দেখেছি, প্রমিত।

প্রমিত খুব আহত বিস্ময়ে দিবাকরের দিকে চোখ তুলল। ভোজালিটাকে কল্পনা করবার চেষ্টা করল। কল্পনার ভিতরে সে চমকে উঠে বলল—তুমি ওই জিনিসটা একদিন নিয়ে আসবে?

—কেন, তুমি কী করবে!

—ভেবো না, আমি বরুণকে ওটা হাতে করে তেড়ে যাব। সেই সাহসই আমার নেই। আমি খালি দেখব একবার।

—দেখে কী হবে!

—কিছুই হবে না। সব কিছুকে ডিটেলস-এ দেখা আমার অভ্যেস। কোনও-কিছু খুঁটিয়ে দেখতে আমার ভাল লাগে। ছবি আঁকি বলেই হয়তো আমার মনটা ওইরকম। তুমি আনবে তো?

বিষম আশ্চর্য হল দিবাকর। বলল—ভোজালিটা ডগার দিকে বাঁকা আর তীক্ষ্ণ, মাঝখানটাও একটা ফালি বাঁক খেয়ে রয়েছে, ধার দেখে বুকটা সিরসির করে। ডগাটা ঠেকিয়ে গালে টানলে দীপিতার চিরকালের মতো দাগ পড়ে যাবে। ওটার একটা খাপও আছে। খাপের গায়ে মোগলাই নকশা। আচ্ছা বেশ, তোমাকে আমি দেখাব জিনিসটা।

দিবাকর দীপিত, তীক্ষ্ণধার, নকশা-কাটা আশ্চর্য অস্ত্রটা সঙ্গে করে এনেছিল দু-দিন পরেই। একটা প্রায়-নির্জন রেস্টুরেন্টে দুপুরবেলা পর্দা ফেলে একটা বৃহদাকার থালার উপর ওটাকে শুইয়ে দিয়েছিল। থালাটা নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের, তীব্র একটা আলো ঝলসায়, খাপ-খোলা হয়ে অস্ত্রটা সেই আলোর তীব্রতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রমিত আলোর ঝলকানি চোখের ওপর হাত তুলে আড়াল করতে চায়। দিবাকর হেসে উঠে একটি ফোটো সামনে মেলে ধরে বলল—নাও, ডিটেলস দেখে নাও। এই আমার বোন, আর এই হচ্ছে মোগলাই ভোজালি। এত সুন্দর বোনটা লুম্পেনের হাতে পড়েছে, প্রমিত। দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো। খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয় তোমার ভাল লাগবে।

ফুঁপিয়ে চলেছে দীপিতা, ফোঁপানি চাপতে গিয়ে শরীরটা তার আরও কেঁপে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো খোঁপার মালা থেকে মাঝে-মাঝেই ঝরে পড়ছে একটি-দুটি পাপড়ি। কান্নার স্বরে যে-ধরনের হাহাকার ঘুলিয়ে উঠছে, তাতে দীপিতাকে মনে হচ্ছে, সত্যিই সে অকূল পাথারে পড়ে গিয়েছে। সত্যিই মাটি হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত জীবন। আর এইজন্য দায়ী মানুষটি ফুলশয্যার খাটের প্রান্তে মেঝেয় পা দু-খানি রেখে আলতো করে বসে হাতের তালুতে একটি পাপড়ি রেখে, সেটির দিকে বোকার মতো চেয়ে রয়েছে।

এই ঘরে পা দিয়েই দীপিতা বুঝেছে, মস্ত ভুল হয়ে গেল। তার আগে এই ভুলের মাত্রা বেচারি বুঝে উঠতে পারেনি। এখন সেই ভুল শোধরাতে হবে প্রমিতকে। সেই কারণেই ওই খাটে একসঙ্গে শোওয়া যাবে না। কথাটি স্পষ্ট স্বরে ঘোষণাও করে দিয়েছে দীপিতা। এই ধরনের সাংঘাতিক অকথ্য অপমানের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না প্রমিত। এ সে কী করল—জীবনের জন্য একটি হাস্যকর ফুলশয্যার আয়োজন করল! দিবাকরের কথায় এতখানি বশ হল কেন, ওই ভোজালিটাই কি তাকে বিভ্রান্ত করেনি?

একখানি সাদা-আলো-ঝলসিত নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের থালায় খাপ-খুলে-রাখা নগ্ন ভোজালি দেখে দীপিতার জন্য একটি তীব্র অব্যক্ত মায়া হয়েছিল। বরুণের স্পর্ধাকে প্রমিত কি মনে-মনে চ্যালেঞ্জ জানাতে চেয়েছিল! কিন্তু কোন যুক্তিতে? দিবাকরের প্ররোচনাই কি ওই-একটা নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জের প্রেরণা, নাকি ফোটোর দীপিতার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রমিত? খুঁটিয়ে দেখতে চাওয়াটাই কি তার একটি বৃহৎ দুর্বলতা?

খাটে নিতম্ব ঠেকানো, মেঝেয় পা, দু-হাতে-মুখ-ঢাকা ফোঁপানো কনেটিকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে প্রমিত এবং সজোরে ফুঁ দিয়ে হাতের তালুর পাপড়িটাকে উড়িয়ে দেয়। এবং গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—আমি গায়ে পড়ে কারও উপকার করতে যাইনি, দীপিতা। উপকার আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। বলে খুব দ্রুত প্রমিত ঘরের একটি কাঠের আলমারির কাছে চলে আসে। আলমারির চাবিটা বইয়ের সেলফের এক কোণ থেকে টেনে নেয়।

ভোজালিটা হাতে করে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে ফিরে আসে দীপিতার সম্মুখে।

খাপটা খুলে ফেলে এক-টানে। ঘরের উদ্ভাসিত আলোয় ঝলসে ওঠে হিংস্র অস্ত্রখানি, যেন তা মানুষের রক্তের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠল।

প্রমিত ভোজালির ডগা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দীপিতার ঘোমটা ঘাড়ের পিছনে ঠেলে দিল। চন্দন-ফোঁটায় বিষণ্ণ-মধুর মুখটা পুরোপুরি ফুটে বার হল প্রমিতের চোখের উপর। ফোটো নয়, এ এক রক্তমাংসের তীব্র যৌবন, বিশেষ-সুন্দর মানবী, যার তারিফ দিবাকরের মুখে সহস্রবার শুনেছে প্রমিত, এই মুহূর্তে তাকেই ভীষণ অধরা মনে হল প্রমিতের। যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়েও সম্পূর্ণই অধরা থাকতে চায়, সেই তাকে ঘিরে রহস্য-রচনা পুরুষের চিরকেলে ধাত, কিন্তু এ-রহস্য কোনও নারী-রহস্য নয়, প্রমিতের মনে হল, এই রহস্যের উৎস একটি বাস্তব-ভোজালি। এই ভোজালিটা ওই সুন্দর মুখে কেটে বসে যেতে পারে, সেই খেয়ে-ফেলা বিকৃত মুখটা একজন শিল্পী কীভাবে ছবিতে আঁকবে? অথচ এ-যুগে তাই-ই যে আঁকতে হয়! মুখটাকে তুলির ছুরি দিয়ে আপেলের মতো আধখানা কেটে ফেলতে পারে প্রমিত। কেটে ভাস্কর্যের মতো বর্তুলাকার দিয়ে তুলির আঁচড়ে বসাতে পারে ক্যানভাসে।

মানবীকে বিকৃত করে লুম্পেনের-থাবায়-ধরা পলিটিকস, শিল্পীর তুলির ভাষায় পাওয়া যাবে সেই বিকৃতির চরম বিশদ বিবরণ। আঁকার আগে, শিল্পী সেই মুখটাকে মনের মধ্যে পুরোপুরি এঁকে ফেলতে পারে। না-এঁকে সেটিকে মুখ বুজে বহন করার যন্ত্রণা, মুখটি যার, সে-ও বুঝবে না। শিল্প যারা একদম বোঝে না, তারাও কেউ-কেউ শিল্পীর জীবনে ঢুকে পড়ে অবুঝ মুখে বসে থাকে। দীপিতাও কি তেমনই অনড় প্রতিমা?

প্রমিত বলল—ধরো। দ্যাখো, চিনতে পারো কি না। বরুণ এ-জিনিস তোমার বাড়িকে দেখাতে বলেছিল। আমি মনে করেছি, আমাকেও দেখাতে বলেছে। সেটিই আমার ভুল, দীপিতা। তোমার ভালবাসার চেহারাটা আমি বুঝতে পারিনি। প্রেমের ছাঁচ যে কতরকম হতে পারে, আমরা তার কিছুই জানি না। শিল্পীর দোষ হচ্ছে, সে যা করে, নিজের ছাঁচে ফেলে করতে চায়, আসল মানুষটা সেই ছাঁচের বাইরেই হয়তো সত্য হয়ে রয়েছে, আমরা ঠিক ধরতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। এখন ভয় হচ্ছে, এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম! নাও, দ্যাখো, এটাই তো বরুণের ভোজালি? ভরতবর্ষের মূর্খ হিংসা আর নিষ্পাপ অবুঝের প্রেম। দ্যাখো, দ্যাখো, হাতে নিয়ে চুমু খেতেও পারো। তুমি তোমার মতো সুন্দর। যা-ই চাও, তা-ই হবে।

অসহায় বোকা ভঙ্গিতে দু-হাত অল্প ফাঁকের ব্যবধানে মেলে দীপিতা অস্ত্রটা দু-হাতে নেয়। ততধিক বোকা ভঙ্গিমায় প্রমিতের মুখের দিকে চেয়ে শিল্পীর কথা শুনতে থাকে। শোনে এবং আশ্চর্যও হয়, কিন্তু হঠাৎ অবুঝের গলাতেই সশব্দে অস্ত্রটাকে সত্যিই চুমু দিয়ে ডুকরে ওঠে—ওহ্, বরুণ। এ তুমি কী করলে! বলে কেঁদেই ফেলে দীপিতা।

প্রমিত এ-বার অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে, শিল্পের ভাষা কীভাবে ব্যর্থ করে মানুষ, ভোজালির চেয়ে তার তুলির ডগা নিশ্চয় অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং ধারালো, সেই স্পর্শে এ-নারী ধ্বনিত হওয়ার নয়। কী করে হবে, এ যে ছাঁচের-বাইরে-থাকা কোনও কামিনী, তা হয়তো অন্য কোনওভাবে সুন্দর, লুম্পেনের হিংসাকে পুজা দেওয়ার জন্যও তো নারীরা এ-

দেশে জন্মায়। একইসঙ্গে এই মুহূর্তে প্রমিতের মনে এই নারীর জন্য কামনা এবং ঘৃণা যমজ ইচ্ছার মতো জন্ম নেয়। দীপিতার কাছ থেকে সরে চলে আসে প্রমিত। আসার আগে দীপিতার শরীরের পাশে খাটের উপর ভোজালির খাপটা রেখে দিয়ে আসে।

ঘরের কোণে একটি বইভর্তি কাচের আলমারির সামনে এসে দাঁড়ায় এই গল্পের হতভাগ্য নায়ক। তার চোখে কেন-যেন খানিকটা জল এসে পড়ে। সে আলমারির প্রতিটি সৎ গ্রন্থকে মনে-মনে ধিক্কার দিতে থাকে। তার কেবলই মনে হয়, শিল্পের জ্ঞান একটি মস্ত অভিশাপ। বড়ই আশ্চর্য লাগছে, চুমু খেতে বলাতে, বাস্তবিকই দীপিতা অস্ত্রটার গায়ে সশব্দে চুমু খেল! এবং কাঁদল! প্রমিতের এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই সে অপরাধ করেছে। কেন সে ওই চন্দন-চর্চিত মুখখানাকে তুলির ছুরিকা দিয়ে কেটে মনের মধ্যে বিকৃত করে তুলে একটি তীব্র কাল্পনিক কষ্টে বার-বার এতক্ষণ আলোড়িত হচ্ছিল? বরুণ তো একদিন হঠাৎ দীপিতাকে বাগে পেলে গাল কেটে সত্যিই নামিয়ে দিতে পারে। ওই মোহময় শোভন-উদ্বেল মুখের বিষণ্ণ-মধুর রূপটা চির-বিকৃতির হিংসায় কদর্য হয়ে উঠবে। এমন সৌন্দর্য কদর্য রূপে কল্পনা করার জ্ঞানটাই প্রমিতের একটি অবাধ্য প্রবৃত্তির মতো—তাকে ক্রমাগত ছোবলাতে থাকে। তার সৌন্দর্য-লিপ্সার আবেগটাই এমন অকাট্য, দুর্মর এবং দুঃশাসনীয়। দীপিতার সত্যিই কী হবে, প্রমিত ভাবতে পারছে না। 'এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম!'—নিজেরই কথা আর একবার বিড়-বিড় করে উচ্চারণ করল প্রমিত।

বইয়ের আলমারির সামনে অনেকক্ষণ এইভাবে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের দিশেহারা চঞ্চল মনটাকে বাগে আনার চেষ্টা চালায় প্রমিত। মনে-মনে ভাবে, এই ঘরে পা দিয়েই দীপিতা উপলব্ধি করেছে, তার আগে নয়, যে, বেচারির জীবনটা মাটি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই সংবিত ঘরে পা দিয়েই হল কেন! ফুলশয্যার সজ্জিত খাটটা দেখেই কি দীপিতা তার ভুলকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছে? কোনও-কোনও ব্যাপারকে বোঝার জন্য কি চরম-কোনও মুহূর্তের সামনে এইভাবে দাঁড়াতে হয় মানুষকে? দীপিতা যেন ক্ষিপ্র তেজস্বিনী অশ্বের মতো খাদের কাছে পৌঁছে সম্মুখের দু-পা শূন্যে তুলে দিয়েছে, কোথাও তলিয়ে যাওয়ার আগে, অশ্বটি এ-ভাবেই শূন্যতার গায়ে পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর তীব্র আবেগে চিৎকার করে ওঠে। মানুষ এই অশ্বিনী-দৃশ্যে দেখতে পায় একটি বিমূঢ় রুদ্ধগতির অসহায় শূন্যতাকে, তলেও এক বিপুল গভীর গহ্বর।

কিন্তু এই মনটা কি সংসারে আর-এক মুহূর্তে বদলে গিয়ে ওই বিপুল গহ্বরকে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে না? সে কি ভাবে না খাদ পর্যন্ত এত দূর ছুটে যখন এসেছে, তা হলে এই পথটাই সত্য হোক, ওই খাদটাকেই পেরিয়ে যাই, ভুলটাকে এ-ভাবেই শুধরে নেওয়ার বেগ লাগুক অশ্বের শরীরে।

প্রমিতের শিল্পী-মন ছুটন্ত অশ্বের পিছনে উড়ন্ত একটি ভল্লকে দেখতে পায়, গহ্বর অতিক্রম করার আগেই কি ঘোড়াটা বিদ্ধ হয়ে খাদে তলিয়ে যাবে, শূন্যে-তোলা দুটি পা, ওই অবস্থায় ভল্ল গেঁথে ফেলবে অশ্বটিকে? কল্পিত এই দৃশ্যকে রচনা করে ভয়ে প্রমিত দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। ভাবে, 'এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম!'

আলমারির কাছ থেকে ধীর-পায়ে দীপিতার কাছে চলে আসে প্রমিত। দ্যাখে, অত্যন্ত শিথিল এক ভঙ্গিমায়, যেন মৃত সন্তানকে কোলে ফেলে শোকাহত মূক নারী বসে রয়েছে, কোন সুদূরে তার অন্যমনস্ক বিষণ্ণ দৃষ্টি ছড়ানো। তার কোল থেকে নগ্ন জ্বলন্ত অস্ত্রটা প্রমিত তুলে নিতেই আঁতকে উঠে ঝর-ঝর করে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল দীপিতা। আঙুল দিয়ে টেনে অশ্রু মুছল এবং কী-যেন বলে উঠতে চাইল, কিন্তু বলল না। তখন প্রমিতের মনে হল প্রেমে-ব্যর্থ দৃষ্টিও বুঝি এমনই শোকস্তব্ধ হয়ে থাকে। দীপিতাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাও প্রমিতের জানা ছিল না। তা ছাড়া, এ-মেয়ে তার কথা শুনতে পাবে বলেও মনে হল না। শুনলে ওই সুদূর দৃষ্টিতে ঘৃণা ছাড়া কিছুই জাগবে না।

অতঃপর প্রমিত দীপিতার-পাশে-পড়ে-থাকা খাপটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে সরে আসে। খাপে ঢোকায় নাঙা অস্ত্রটাকে। হঠাৎ কেন-যেন তার মনে হয়, বাসর-জাগা এই নির্ঘুম প্রহরণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত, নইলে বাসরকন্যাই একে তার নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারে।

খাট থেকে একটি বালিশ টেনে নেয় প্রমিত। ঘরের কোণে খাড়া করে রাখা গোটানো মাদুরটা নেয়। মেঝেয় পেতে বালিশের তলায় রেখে দ্যায় বরুণের ভোজালিটা। তারপর আবার ফিরে আসে খাটের কাছে। সমস্ত ফুল খাটের গা থেকে নামিয়ে ঘরের একটি কোণে স্তূপ করে রাখে। অলংকারগুলি তুলে এনে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দেয়। ফুলকে সরিয়ে দিলেই শয্যাটা আর ফুলশয্যা থাকে না। গলার মালাটাও নামিয়ে দেয়। বাথরুমে ঢুকে নিজের মুখের চন্দনের ছাপ ধুয়ে আসে প্রমিত।

তোয়ালেয় ভেজা মুখ মুছতে-মুছতে দীপিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। এবং প্রমিত বলে—তুমিও গলার মালা ফেলে দাও, আমি ফুলশয্যা ভেঙে দিলাম। বাথরুমে যাও, সব চিহ্ন ধুয়ে ফ্যালো। তারপর এই খাটেই শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ো। কষ্ট পেয়ো না, বিয়েটাকে খুবই সামান্য ভুল মনে করবে। আমি শুতে গেলাম। বলে মাদুরের কাছে চলে আসে। ঘরের উজ্জ্বল আলো নিবিয়ে দিয়ে একটি রাত-প্রহরী নিষ্প্রভ বাল্ব ঘরে জ্বেলে দেয়। বাথরুমে আলো আছে। সেইদিকে চেয়ে দ্যাখে দীপিতা। কিন্তু কোথাও নড়তে পারে না। মূর্তির মতোই খাটে বসে থাকে।

প্রমিত বালিশের তলায় অস্ত্র রেখে শুয়ে পড়ে। চোখও বন্ধ করে। ঘুম আসবে না জেনেও চোখ খোলে না। আধঘণ্টা বাদে চোখ মেলে দ্যাখে, মূর্তিটা খাটে সত্যিই শুয়ে পড়েছে। মাদুরের ওপর উঠে বসে প্রমিত। চুপ করে বসে থাকে। একসময় ঘরের রাত-জাগা আলো চোখে সয়ে গিয়ে দৃষ্টি অধিক পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। খাটের কাছে উঠে আসে প্রমিত। অবাক হয়ে দ্যাখে দীপিতা চন্দন মোছেনি, গলার মালাও ফেলে দ্যায়নি। অক্ষয় সজ্জায় কনে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের শ্বাসে তার বুকের ওঠা-পড়া দেখে প্রমিত। পেটের কাছে শাড়ি কিছুটা সরে গিয়ে মদির ত্বক প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মাথায় ঘোমটা নেই, মুখ উদ্ভাসিত, পায়ের গোছ দ্যাখা যাচ্ছে। শাড়ি কিছু অসংবৃত। মনে ভারি লোভ জন্মায় প্রমিতের।

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করতে সাধ জাগে প্রমিতের। স্ত্রীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তেও বাসনা হয়। কিন্তু ফুলশয্যায় স্ত্রী-ধর্ষণের প্রবৃত্তি তার ছিল না। ফুলবিহীন বিছানার দিকে চেয়ে স্ত্রীর বালিশের কাছে মাত্র একটি সাদা পাপড়ি অবশেষে পড়ে থাকতে দেখে লোভার্ত হাতটা সে-দিকে বাড়িয়ে বসে এবং ঠিক তখনই দীপিতার ঘুম চটে যায়। চোখ মেলেই ভয়ে বিছানায় ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে এবং বলে ওঠে—আপনি কী করছেন? এখানে কেন?

থতমত গলায় প্রমিত বলে ওঠে—আমি খারাপ উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি, দীপিতা। বালিশের ওখানে একটা সাদা পাপড়ি দেখে লোভ হল। ভুল বুঝো না আমাকে! তুমি ঘুমোতে পারলে কি না, তাই এ-ভাবে...আর কথা সাজাতে পারল না প্রমিত। বোকার মতো পাপড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে মনে হল, একটা নয়, একজোড়া পাপড়ি।

কিছু বুঝে-ওঠার আগেই জোড়া-পাপড়ি ডানা মেলে ঘরের মধ্যে উড়তে লাগল। প্রমিতের আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। ঘরে সাদা সিসেরঙের উজ্জ্বলতায় উড়ছে একটি বিমূঢ় প্রজাপতি, এই প্রাণের সংকেত প্রমিতকে পরিহাস করতে থাকলেও, তার ভারি আনন্দ হচ্ছিল। জোড়া পাপড়িকে শূন্যে অনুসরণ কারে খাটের কাছ থেকে চলে এল প্রমিত। প্রজাপতিটা উড়তে-উড়তে এসে লাগল বুক-সেলফের মাথায়। বসে রইল।

প্রমিতের আনন্দ দেখে দীপিতা আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু সে আর ঘুমোতে পারেনি। রাতটা পার করার পক্ষে একটি অদ্ভুত প্রজাপতিই শিল্পী প্রমিতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার ওড়া আর বসা দেখতে-দেখতেই এক সময় ভোর হয়ে এসেছিল। জানলা খুলে প্রজাপতিটাকে শুদ্ধ ভোরের বাতাসে চলে যেতে দিয়েছিল প্রমিত। সবই লক্ষ করেছিল দীপিতা। কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

সকালেই এ-বাড়িতে জিনসের ধুলোধুলো প্যান্ট, কোমরে ভারী বেল্ট, একটি চকরাবকরা গাঢ় রঙের শার্ট পরা, ঝোলা গোঁফ এবং পাতলা করে কামানো কিন্তু গাল-অবদি-টানা জুলফি, একহাতে বালা-পরা বরুণ এসে উপস্থিত হয়েছিল। চোখের দৃষ্টি মদ্যপের মতো উগ্র, মাথার চুল এলোমেলো, মুখে অল্প খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ঠোঁটের কাছে কাটা গালের দাগ চকচক করছে দাড়ির খোঁচা ছাপিয়ে।

বাইরে বৈঠকখানায় বরুণ বসে আছে শুনে দীপিতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। লক্ষ করে প্রমিত, খাপে-আঁটা ভোজালিটা হাতে করে বাইরে চলে গেল। দ্রুতই পিছু-পিছু ছুটে আসে দীপিতা। এসে সামান্য পর্দা ঠেলে দরজার মুখটায় দাঁড়ায়।

মুখোমুখি দু-খানি নিচু সোফা, মাঝখানে কাচের সামান্য উঁচু একটি লম্বা টি-টেবিল। তার ওপর ভোরের খবরের কাগজ পড়ে আছে। এখন সকাল সাড়ে-দশটা বেজে গিয়েছে।

ভোজালিটা টেবিলটার উপর খবরের কাগজের পাশে আস্তে করে রেখে প্রমিত বরুণকে বলল—আগে কখনও দেখিনি। তবে তোমাকে আমি জানি। এই ভোজালিটা তুমি চিনতে পারো? বলেই হাসিমুখে ঘাড় বেঁকিয়ে তুলে দরজার কাছ পর্দা ঠেলে দাঁড়ানো দীপিতাকে একবার দেখে নেয় প্রমিত। বাইরে বেশ চড়া রোদ। বরুণ ঘামে ভিজে গেছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে।

এইরকম অপ্রত্যাশিত কঠিন আপ্যায়ন সত্ত্বেও বরুণ খুব-কিছু বিচলিত হল না। সামান্য মুহূর্ত বোকার মতো হেসে সামলে নিল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় দীপিতাকে বলল—ফ্যানের পয়েন্ট দু-ঘাট বাড়িয়ে দাও না, দীপিতা। বড্ড গরম।

দীপিতা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল এবং দেওয়ালে নব ঘুরিয়ে পাখার গতি বাড়িয়ে দিল। আবার পর্দার কাছেই ঘেঁষে গেল। বরুণ ঠাণ্ডা গলায় বলল—তোমার শ্বশুরবাড়ি দেখতে এলাম, আমাকে এক-গেলাস গন্ধ শরবত দাও, দীপিতা। আর-কিছু চাইব না। যাও, নিয়ে এসো।

নির্দেশ শুনেও দীপিতা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বরুণ অবাক গলায় বলল—এক-রাতেই তোমাদের এত প্রেম হয়েছে যে, স্বামীকে পাহারা দিয়ে থাকতে হচ্ছে! যাও, ভয় কোরো না, আমি এখনই চলে যাব। যাওয়ার সময় আমার ভোজালিটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনি ভাববেন না, মাস্টার।

মাস্টার! বিস্মিত হয়ে প্রমিত বলে—আমি কোনও মাস্টার নই, বরুণ!

বরুণ হাল্কা হেসে বলল—আঁকার স্কুলে আপনি মাস্টারি করেন না? বলেই ভোজালিটা হাতে উঠিয়ে নেয়। খাপ-খোলা মাত্রই সকালের আলোয় অস্ত্রটা ঝলসে ওঠে।

ঝলসানো অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ ধারের দিকে চেয়ে শঙ্কিত ভীত দীপিতা নড়তে পারছিল না। ভোজালিটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল বরুণ, যেন-বা ধার পড়ে গেছে কি না পরখ করছিল।

প্রমিত বরুণের পাঁয়তাড়া দেখে একটুও কাঁপল না। দীপিতার দিকে সরল দৃষ্টি ফেলে বলল—যাও, শরবত নিয়ে এসো। বলে বরুণের ভাবভঙ্গি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে থাকে। রোমশ হাতের বালাটাও লক্ষ করে। তারপর বলে—শোনো, বরুণ, ওটা তোমার পার্টিকে নিয়ে গিয়ে দ্যাখাও। মানুষকে এ-ভাবে আর ভয় দ্যাখাবে না। খাপে ঢুকিয়ে রেখে দাও। আমি আসছি। বলেই দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে আসে গল্পের নায়ক।

দীপিতার হাত থেকে শরবতের সুগন্ধি গেলাসটা কেড়ে নিয়ে প্রমিত বলল—তুমি আর বাইরে যেয়ো না। আমিই ওকে বিদেয় করে দিচ্ছি। তোমাকে দেখলে ওর রোখ আরও বেড়ে যাবে।

শরবত হাতে প্রমিতকে সামনে উপস্থিত হতে দেখেই বরুণের দুই চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। ভয়ানক অপমানিত বোধ করল সে। কড়া গলায় বলল—আপনি কেন আনলেন? আমি তো দীপিতার হাতে শরবত চাইলাম। ওকে আসতে বলুন।

—না, ও আসবে না। আমি দিচ্ছি খাও, খেয়ে বিদেয় হও।

—ও, তাই নাকি! বেশ, দ্যান তা হলে। কিন্তু পার্টিকে জিনিসটা শুধু দেখানো যায় না, খানিকটা রক্ত মাখাতে হয়। বলে শরবতের গেলাস প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সমস্ত শরবত প্রমিতের মুখে ছুড়ে মারে বরুণ মাস্তান। তারপরই প্রমিতের ভেজা গালের দিকে চেয়ে উৎকট শব্দে হেসে ওঠে।

বরুণের হিংস্র উল্লসিত হাসির শব্দ কানে আসে দীপিতার। ফুলশয্যার ঘর থেকে ছুটে বৈঠকখানায় আসতে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে যায় একটি ফুলের মালা। মালাটিকে পা থেকে ছাড়াতে-ছাড়াতে প্রমিতের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার শুনতে পায়। একবারই সেই নিরবলম্ব উচ্চকিত ধ্বনি ফেটে উঠে থেমে যায়। বৈঠকখানায় ছুটে আসে দীপিতা।

গালে হাত চেপে বসে রয়েছে প্রমিত। গাল থেকে হাত বেয়ে টেবিলের কাচে টুপিয়ে পড়ছে সুগন্ধিত মিষ্টি রক্ত, সেই শোণিত-ঘ্রাণে দীপিতার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে চাইছে। স্বামীকে সে পাগলের মতো স্পর্শ করে বলে ওঠে—এ তুমি কী করলে, বরুণ! আমি যে তোমার কাছেই ফিরে যেতাম!

সুতীব্র কষ্টের মধ্যেও রাজ্যের বিস্ময় দু-চোখে জড়ো করে প্রমিত স্ত্রীর অসহায় মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার মনে হয়েছিল, প্রেম একটি বীভৎস শক্তি এবং সে আদি দুর্বৃত্ত।

গালে ডাক্তারি সেলাই পড়ল প্রমিতের এবং চিরস্থায়ী দাগ পড়ে গেল। সেই কলঙ্কিত চিহ্নকে ঢাকবার জন্য দাড়ি রাখল সে। সমাজের দুর্বৃত্তায়ন সম্বন্ধে কাগুজে নিবন্ধ পাঠ করা, মঞ্চবদ্ধ লেকচার শোনা আর গালে দাড়ির আড়ালে পলিটিক্সের রক্তমাখা ভোজালির চিহ্ন বহন করা এক জিনিস নয়, যাকে বইতে হয় সে জানে, তার রক্তের মধ্যে একটি সাদা প্রজাপতি মরে গিয়েছে, এই সমাজকে কখনও সে ভালবাসতে পারবে না। প্রমিত রাজনৈতিক যে-কোনও বক্তৃতায় এবং স্লোগানে কুঁকড়ে যায়, যে-কোনও নেতার মুখ দেখে আঁতকে ওঠে। একটি মহা-আতঙ্ক তার রক্তে বোবার মতো ঢুকে পড়ে।

প্রমিতের বাবা-মা দীপিতাকে আর রাখতে চাইলেন না। ঘটনার এক-সপ্তাহের মধ্যেই ঠেলে তার মামার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিদায়ের দিন অতি তৃষ্ণার্ত চোখে দীপিতা আহত এবং শায়িত প্রমিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল, প্রমিত কিছুতেই চোখ তুলল না। দীপিতা শুভদৃষ্টি চায়নি, তাই প্রমিত কি বিদায়ক্ষণে অশুভ দৃষ্টির ভয়ে চোখ তুলল না?

প্রমিত তার ছবিতে খাদের ধারে এনে একটি ঘোড়াকে শূন্যে দু-পা তুলে অর্পিত করল বাতাসে, তাকে বিদ্ধ করল ভয়াল বর্শা, কাত হয়ে চিত্রার্পিত বাদামি অশ্ব গহ্বরে টলে পড়ছে, দেখা গেল। প্রত্যেক ছবিতে জেগে উঠল অস্পষ্ট একটি ঘাতকমুখ, সর্পসদৃশ একটি ভোজালি বেঁকেচুরে গলে যাচ্ছিল মহাশূন্যে এবং কারা-যেন মঞ্চে পৃথিবীর ক্রমমুক্তির চিবনো বক্তৃতা করে চলেছে।

২.

দিবাকরের মুখের দিকে ঠাণ্ডা নাতিপ্রসন্ন দৃষ্টি চাইল প্রমিত। দেখল বন্ধুর চোখদুটি অদ্ভুত কষ্টে ছলছল করছে। সেই অশ্রুর দিকে আলতো বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—আমি দাড়ি রেখেছি কেন, পাড়ার লোক জানে। আমি রাস্তায় হেঁটে গেলে, আমার দুর্ভাগ্যের কথা লোকে ফিসফিসিয়ে বলে। মানুষের এই ধরনের দুর্ভাগ্যের ঘটনা লোকে উপভোগ করবার জন্য একটা কাহিনী গুছিয়ে তৈরি করে নেয়। যা ঘটেছে তা-ও বলে, যা

ঘটেনি তা-ও বলে। আমার মুখের দাড়ি লক্ষ করে বলবার সময় বক্তার দৃষ্টি চকমক করে, আমি তখন পাগলের মতো ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু এ আর সহ্য হয় না, দিবাকর। একদৃষ্টে কেউ আমাকে দেখে যখন ভাবি...

—এ-ভাবে ভেবো না, প্রমিত। তুমি ক্ষমা করো।

—করেছি। আমার কারও উপর রাগ নেই। শুধু ভাবি, কোনওকিছুকে আর ডিটেলসে দেখতে যাব না, বিশেষ করে মানুষকে। এই মনটাকে নিয়ে কোথাও আমাকে পালাতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। আমার দুর্ভাগ্যের কথা যেখানে কেউ ফিস-ফিস করে বলবে না। এমন-একটা জায়গা, যেখানে বাচ্চাদের জন্য একটি চমৎকার আঁকার স্কুল খুলতে পারব। খুব গরিবের মতো থাকব, আমার অস্তিত্ব যেখানে মানুষের বাড়তি মনোযোগ দাবি করবে না। তোমার সঙ্গে আর দ্যাখা হবে না, দিবাকর।

চোখ থেকে এ-বার নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ল দিবাকরের। সে এরপর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

গলাটা ধরে এসেছিল দিবাকরের। সেই ধরা গলাতেই সে বলে উঠল—মানুষ একদিন তোমার সম্পর্কে গল্প থামাবে, গাওনা বন্ধ করবে। তুমি দু-দিন সহ্য করো, প্রমিত।

প্রমিত এ-বার নিঃশব্দে হেসে ফেলে বলল—আমি যদি পাগল হয়ে যাই, সেই ভয় আমার আছে, তা হলে মানুষ রাস্তায় বা স্টেশনে পাগলটাকে দেখেই গল্পটা বলবে। গল্পটা প্রসিদ্ধ হবে, ওটা আর থামবে না। এখানে আর থাকা যায় না, দিবাকর।

একটি খাবারের দোকানে একটি টেবিলকে ঘিরে মুখোমুখি বসেছিল ওরা। প্রমিতের একটা হাত টেবিলের উপর পড়ে ছিল। সহসা সেই হাত খপ করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল দিবাকর। কুণ্ঠিত গলায় বলে উঠল—আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো, প্রমিত। আমি বুঝতে পারিনি। আমি তোমার ওপর জোর করেছিলাম।

প্রমিত শুকনো গলায় বলল—ভোজালিটা আমার গালে চালানোর আগে, গেলাসের শরবত মুখে ছুঁড়ে মেরে গালটাকে ভিজিয়ে নরম করে নিয়েছিল বরুণ, তারপর আচমকা চালিয়ে দিল। আমি বলছি তোমাকে, এত সত্ত্বেও ভোজালির সুন্দর নকশা ভোলা যাবে না। এ-দেশে শিল্প দিয়ে হিংসাকে ঢাকবার ব্যবস্থা চিরকাল আছে। কষ্ট হচ্ছে এ-কথা ভেবে যে, অমন সুন্দর নকশা কেন। গালটা ও-ভাবে ভিজিয়ে নিল বরুণ, তা-ও খুব আশ্চর্যের, কখনও ভুলব না। অথচ আমি দীপিতাকে কখনও নিভৃতে একা কাঁদতে দেখলাম না। মনে হচ্ছিল, যেন সে জয়ী হয়েছে।

প্রমিতের কথার মুখেই দিবাকর দুম করে ঘোষণা করল—দীপিতা বরুণের কাছেই ফিরে যেতে চাইছে। আমি আর ভাবতে পারি না।

—আমি পারি! বলে ওঠে প্রমিত। তা শুনে ঈষৎ চমকে দিবাকর প্রমিতের মুখের দিকে চায়। তখন প্রমিত হেসে উঠে বলে—আমি এখন সমস্তই ঠিক-ঠিক ভাবতে পারি। আমার

কল্পনা আর আমার শত্রুতা করবে না। দীপিতাকে যেতে দাও, বাধা দিয়ো না। ওর পক্ষে যা স্বাভাবিক, তাই করতে দাও।

—তুমি তা হলে চলে যাবে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—কাউকে আমি বলে যাব না, দিবাকর।

—আমি বলছিলাম...

প্রমিত সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিল। অবাক হয়ে বলল—বুঝতে পারছি। তুমি ডিভোর্সের কথা বলছ। আমাদের মিউচুয়াল ডিভোর্সই হবে। উকিল দ্যাখো।

দিবাকর বলল—অত তাড়াতাড়ি তো হবে না। ফাইল স্যুট করার আগে তোমাদের দু-জনের অন্তত একবছর আলাদা থাকতে হবে।

—তুমি সবই জেনেছ তা হলে! বেশ তো, আলাদাই তো আছি। একবছর কেন, আরও সময় লাগলে নাও। যা হয় করো...আমার আর সত্যিই ভাল লাগে না, দিবাকর। তবে সময় যত দীর্ঘ হবে, আমার অস্বস্তি আর যন্ত্রণা তত বাড়বে। আমি সবকিছু খুব দ্রুত ভুলতে চাই। বলে এক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রমিত কী-একটা চিন্তা করে বলল—শোনো, একবছর পরই তা হলে আমাদের দেখা হচ্ছে। অত ভেবো না, আমি কথা দিচ্ছি, যথাসময়ে আমি আসব।

—আমি তোমার ঠিকানা পাব না? দিবাকর অসহায় গলায় জানতে চাইল।

প্রমিত কড়া গলায় বলল—না। বলেই খাবারের দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে উদভ্রান্তের গতিতে পথে নেমে ছুটতে লাগল। দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে দিবাকর বন্ধুর ছুটে যাওয়ার উদ্‌ভ্রান্তি লক্ষ করে মনে-মনে অত্যন্ত কষ্ট পেল এবং বিমর্ষ বিস্ময়ে পথের দিকে চেয়ে রইল।

অতঃপর প্রমিত এক অদ্ভুত পৃথিবীতে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করতে থাকল। সে পেরিয়ে এল তার নিজস্ব পরগনা, নিজস্ব জেলা—তার সমস্ত পরিচিত পরিবেশ। এসে পৌঁছল কোনও-এক নদীর ধারের আশ্রমের পাশে। সেখানে টালির চালের কঞ্চির বেড়ায় মাটি-লেপা একটি ক্ষুদ্র কুটির পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়ায় থাকার জন্য বন্দোবস্ত করে নিল। ঘরের হাল্কা কাঠের দরজায় আলকাতরা লাগানো। ঘরে কোনও পাল্লা-লাগানো জানলা না-থাকলেও বেশ ক্ষুদ্র মাপের কঞ্চি-গাঁথা ফোকর আছে, সেটির গায়ে চটের ঢাকনা ফেলা। চট তুলে উপরে গুঁজে রাখার গোঁজ আছে, চট তুললে হাতের কাছেই নদী দেখা যায়। এটি একটি বিড়িপট্টি। উঁচু হাইওয়ের গায়ে এখানকার বসতি অনেকখানি নিচু, মনে হয় প্রশস্ত খাদে বস্তিটা পড়ে আছে। নদীতে বান হলে প্রত্যেক বছর কিছুদিনের জন্য বসত ভেসে যায়। বান নামলে ফাট লেগে মাটির দেওয়াল পড়ে যায়। তখন গেঁথে তুলতে হয়। নতুন দেওয়াল গাঁথালেপা হলে মাসিক ভাড়া পাঁচ-দশটাকা বাড়াতে হয়।

এখানে বিড়ির মেয়ে-কারিগরই বেশি। পুরুষদের অনেকে রিকশা টানে, কুলিগিরি করে। একমাইল দূরে শহর। এখান থেকে অনেক মেয়ে ঝি খাটতে শহরে যায়। থাকে ওরা চালে-মাথা-ঠেকে-যাওয়া মাটির তালু-সমান ঘরে। ছাগল মুরগি পালে।

প্রমিত গভীর রাতেও এখানে মেয়েতে-মেয়েতে ঝগড়া বেধে উঠতে দেখেছে। বচসা বেধেছে দিন-দ্বিপ্রহরে। কার যেন মুরগি অন্য কার খুলায় ডিম দিয়েছে, অথচ সেই ডিম ব্যাপারির কাছে বেচে দিতে গিয়ে ধরা পড়ল বউটা। কীভাবে ধরা পড়ল? ডিমের সাইজ আর রং-ই বলে দিল এ কার মুরগির আণ্ডা। তখনই বিশ্বায়নগ্রস্ত অর্থনীতি এবং দুর্বৃত্তের ভল্ল-বিক্ষত প্রমিত ভাবল, বিপুলা এ-পৃথিবীর কতটুকু জানি! সামান্য একটি আংরা ডিম্বের বিতণ্ডা বিশ্ব-অর্থনীতির প্রাঙ্গণে একটি মুরগির সুতীব্র তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়া প্রমিতকে কিছুই শোনাতে পারল না। লালঝুটি-রাঙা মোরগের ডাকে নদীতে এখানে ভোর হয়। এখানে কারও হাতেই কোনও ভোজালি ছিল না, মেয়েদের হাতে ধরা ছিল বিড়ি বাঁধবার রঙিন সুতো।

এখানে নূরান সাঁইয়ের আশ্রম। তাঁরই চেষ্টায় শহরের একেবারে কোলে একটি স্কুল-বাড়িতে সকালবেলায় আঁকার স্কুল খোলা গেল। নূরানকে দেখে অত্যন্ত অবাক হল প্রমিত। শহরে শিক্ষিত মহলেও মানুষটার প্রভাব আছে। তাঁর আশ্রমে বিদ্বানের আনাগোনাও লক্ষ করা গেল। এখানে এসে কলকাতার অনেক বিদুষীও পড়ে থেকেছেন। দেখা গেছে দু-একটি বিদেশিনীকেও, তাঁরা এসেছেন বাংলায় লোকন্তরের সংস্কৃতিকে গবেষণার কাজে লাগানোর জন্য। নূরানের মুখের ভাষা প্রায় শিক্ষিত মানুষের মতোই সচ্ছল।

নূরান প্রমিতকে কোনও ওজর ছাড়াই সাহায্য করলেন। এমনভাবে কথা বললেন, যেন সে সাঁইজির কতকালের চেনা। বললেন—তোমারও কি গবেষণার কাজ, বাপু?

প্রমিত বলল—আজ্ঞে না। আমি আপনার ড-ফোঁটার প্রত্যাশী নই। আমি আসলে পলাতক। খুন করিনি, খুন হয়ে এখানে চলে এসেছি, বাবা।

নূরান বললেন—এ তো আউলের আখড়া জীবানন্দ। আউল মানে পাগল।

—জীবানন্দ?

—হ্যাঁ, জীবেন। তুমি জীব ছাড়া কী-ই বা! আশ্বিনের কুক্কুরী তোমাকে কামড়েছে।

শুনেই হতভম্ব প্রমিত আপাদমস্তক চমকে উঠল। তখন থেকেই সামুদ্রিক জল-গর্তের মতো প্রমিতকে নূরান টানতে থাকলেন সবেগে নিজের দিকে।

একদিন প্রমিত নূরানের সামনে বলে উঠল—আমি যে তাকে ভুলতে পারি না, বাবা।

—কী ভুলতে পারো না? তার অঙ্গ, না তার মন?

—মুখটা, সাঁইজি। চন্দনের ফোঁটায় আঁকা একটা মুখ। আমি বিছানায় পেয়েও তাকে ভোগ করতে পারিনি। আমার দাড়ির আড়ালে একটা কাটা দাগ আছে, ওটাকে তুমি মুছে দাও, ফকির সাহেব।

—ওহ্, দাড়িটা তা হলে তোমার প্রচ্ছদ? বিষয়ের সঙ্গে তোর প্রচ্ছদের মিল নেই, হতভাগা। এই জন্যেই পুরনো লেবাস তোমাকে ফেলে দিতে হবে। লেবাস বোঝ?

—আজ্ঞে না।

—লেবাস হচ্ছে পোশাক। লেবাস ফেলে দেবে, নাম ফেলে দেবে। কিন্তু ভেক ধরবে না। অঙ্গ ফেলে দাও।

—অঙ্গ ফেলে দেব!

নূরান এ-বার হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নানান সুন্দর লয়ে মগ্ন হয়ে হেসে চললেন। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি ভোগ করনি, আমি তোমার ভোগের বন্দোবস্ত করতে পারি। তা হলে অঙ্গ না-পার, খোলস ফেলতে হবে। মনে রাখবা, সাপ খোলস ফেলে অঙ্গ নতুন করে নেয়। শোনো, তুমি যে-আগুনে পুড়ছ, তার নাম স্মৃতি। ওই আগুন হাতায় করে বয়ে বেড়ায় ইবলিস। স্মৃতির বিষ থেকে অঙ্গ রক্ষা করার নাম তপস্যা। আমি তোমাকে ধ্যান দেব। তোমার লাগবে উল্টা পাক।

ভেক ধরল না প্রমিত। কিন্তু নাম ফেলে দিল। তার নতুন নাম হল জীবানন্দ ফকির। গভীর রাতে চাপা ভারী গলায় নূরান একদিন প্রমিতকে জানালেন—আমার একটা পৈতৃক নাম ছিল, ভাই জীবানন্দ। প্রমথেশ। অনেককাল বাদে হঠাৎ তোমার নাম দিতে গিয়ে মনে পড়ে গেল। স্মৃতির কয়েদ খাটা কি ভাল? তুমি বিশ্বাস করতে পার, স্মৃতি মুছে ফেলা যায়।

স্মৃতি মুছে ফেলা যায় শুনে আশ্চর্য আকুলতা অনুভব করল জীবানন্দ। বলল—আপনার তা হলে অতীত-নামটা মনে পড়ল কেন?

—পড়ে। কিন্তু কষ্ট হয় না। মনে হচ্ছে, আমার নাম ছিল অরুণেশ। মায়ের নাম নির্মলা কিংবা সাবিত্রী। বাবা ব্রিজেশ বা ওইরকম কী-একটা। আমি জন্ম মানি না। তোমার দাড়ির শিকড়ে আমি লোক-ঔষধি লেপে দেব। দাগ মুছে যাবে। আমি জন্মদাগ মুছে ফেলেছি।

—কী ছিল জন্মদাগ?

—একটা লাল জড়ুল। ওটাকে কেটেছিলাম বাদামি ঘোড়ার বেলেচি অর্থাৎ লেজের চুল দিয়ে বেঁধে। তারপর ওষুধ দিই, আউলে ওষুধ। দাগ নেই। মনে রাখবা, অঙ্গ সবকিছু ধরে না, ফেলে দিতেও পারে।

—কিন্তু আমি যে ছবি আঁকি, সংসারের সবকিছু ফেলে দেব কী করে?

—তুমি সেটিই ফেলে দিতে চাইছ, যেটি ফেলে দিতে হয়। বৈরাগ্যের দৃষ্টি তো খারাপ নয়। ওই দৃষ্টিতেও ছবি আসে। তোমার জন্য পরমান্ন নিয়ে পথে কোনও নারী দাঁড়িয়ে নেই, জীবানন্দ। আছে?

—না।

—সেই নেইটুকুনই আঁকতে পার? বুদ্ধের খালি হাত, খালি চিত্ত, অপূর্ণতা। খিদে। তেষ্টা।

—আপনি এইসব বলছেন কী করে—আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন?

—ফকির লালনের পাঠশালা পর্যন্ত। যাও, এখন ধ্যানে বসতে হবে। উল্টা পাক লাগাতে হবে তোমাকে। কাজটি কঠিন।

নূরানের অতীত অস্পষ্ট। কিন্তু এই ব্যক্তি বিদ্বান, গোপনচারী এবং সমাজ-শ্রেণীভ্রষ্ট

ফকির। পালিয়ে এসেছেন আর ফিরে যাননি। তাঁর জন্যও কি নারী পরমান্ন সাজিয়ে অপেক্ষা করেনি! এখান থেকে মানুষ ফিরতে পারে না কেন?

উল্টা পাকের ধ্যানে বসেই কিছু টের পেল প্রমিত। পদ্মাসনে বসতে হল তাকে। দুই হাঁটুতে রাখা সটান দৃঢ় হাত। দাঁড়া টান-করা। মাথাটি এ-বার সামনে ঠেলে দিয়ে ঝোলাতে হবে, যেন সে পাত্রে-রাখা জল খেতে অনেকটাই ঝুঁকেছে। মাথাটাকে ওই অবস্থায় বাঁ-দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দুলে-দুলে পাকে তুলে ডাইনে ঝোঁক দিয়ে টেনে এনে ফেলতে হবে। এইভাবে ডান থেকে সামনে সটান ঝুলিয়ে টানতে হবে বাঁয়ে। এইভাবেই পাকিয়ে তুলতে হবে মাথা এবং মোচড়াতে হবে শরীর। মাথাটা যেন পাগলের মতো 'না না' করতে থাকে। কারণ মানুষের অন্তর-গহনে পথ আছে, মস্তিষ্কে রয়েছে সুড়ঙ্গ, একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে নেতির সর্পজিহ্বা চলে গিয়ে চেটে চলেছে বিস্মৃতির চরম অন্ধকার। একফোঁটা পিঙ্গল আলোও পড়ে না।

—বলো, জীবানন্দ, নাই। কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বলে উঠলেন নূরান সাঁই।

—নাই? খুবই চমৎকৃত হল প্রমিত।

—হ্যাঁ, বলো। নাই।

—কী নাই বাবা?

—নাম নাই। মুখ নাই। বুক নাই, পা নাই, উরু নাই, উরুসন্ধি নাই। বলো, বাহু নাই, বাহুমূল নাই। নাভি নাই। দৃষ্টি নাই।

—কী বলছেন, সাঁইজি!

—নাম ভুলেছ, অঙ্গ ভুলতে কতক্ষণ! তুমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করো। এখানেই কিছুক্ষণ বাস করো তুমি। তারপর এখানে খোলস ফেলে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। বলো, বিস্মৃতিই সুখ। বলো, অন্ধকারেই আনন্দ। যে-জীব অন্ধকারে থাকে, সে কি সুখহীন? মস্তিষ্কের যে-কোটরে এখনও জগতের আলো পড়েনি, সে কি নিরানন্দ? মস্তিষ্ককোষের কচি কিশলয় ফুটে উঠুক।

—আমি কি সরীসৃপ?

—না, তুমি যেখানে এখন এসেছ, তা এক অন্য কক্ষ, এখানে চেরাজিহ্বা অন্ধকার লেহন করে না। এখানে এসে নবজন্ম হল তোমার। খোলস পড়ে রইল অন্য কোটরে। বলো, শব্দ নাই, খোলস নাই, নাম নাই।

প্রমিত ঘেমে নেয়ে উঠেছিল, কাঁপা এবং ধরা গলায় কোনও প্রকারে বলে উঠল—নাই।

তারপর ক্লান্ত গলায় অস্ফুট বলল—আমি কি বাঁচব। বলে সে ধ্যানের ভঙ্গি ছেড়ে মেঝেয় কাত হয়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ তার জ্ঞান রইল না। জ্ঞান ফিরে পেলে নূরান প্রশ্ন করলেন—কার মুখ মনে পড়ে?

ভয়ার্ত গলায় প্রমিত বলল—পড়ে না।

নূরান জানতে চাইলেন—নাম মনে পড়ে?

প্রমিত বলল—এখনও পড়ে।

নূরানের প্রশ্ন—কী নাম?

প্রমিত বলল—আলো।

'দীপিতা' শব্দটি ভুলে গেল জীবানন্দ।

কঠিন গলায় নূরান বললেন—ধ্যানে আরও মন দাও, জীবানন্দ। মনে রাখবে, রাজনীতির তমসা এবং মানুষের যৌনহিংসার চেয়ে এই অন্ধকার সুন্দর। যে-ভোজালি তোমাকে কেটেছে সে এই বিস্মৃত কোটরে ঢুকতে পারে না। এ মাতৃস্নেহের চেয়ে ঘন এবং পবিত্র।

ধ্যানে আরও মন দিল প্রমিত। এইভাবে তার একটা বছর কেটে গেল। একদিন অতি প্রত্যুষে নদীতে স্নানে নেমে জলের গভীরে পা হড়কে চলে এল। জলের তলায় চোখ খুলে চাইল, কী ভীষণ আলো! সেই আলো আর সহ্য করতে পারল না সে। জলের উপরে ভেসে উঠে দেখল, সূর্য উঠছে। তখনই সে দিবাকরের নামটা মনে করবার চেষ্টা করে বুঝল, বন্ধুর নাম হয়তো দিনমণি মজুমদার, তবে ওটা সঠিক নাম নয়। 'আলো'-ও কারও নাম নয়।

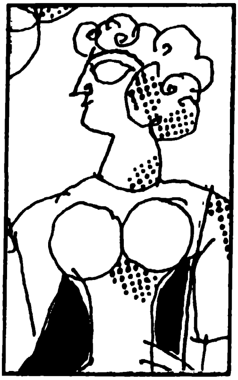
অসম্ভব হাঁসফাঁস করে উঠল বুকটা। অনেকরকমের লোক-ঔষধি তাকে খাওয়ানো হয়েছে। মাথাটা সবসময় ঘোর। একটি তমসাবিন্দুতে সে আছে। বাইরের চোখ নয়, ভেতরের দৃষ্টিতে সে কী-একটা দেখে। এই অবস্থাতে নূরান তাকে এক অমাবস্যার রাতে নারীভোগ দিলেন।

ঘরের মধ্যে পাথরে-খোদাই-করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ একটি মেয়ে এল, গায়ে তার সুতো নেই। চৌকির উপর শুয়েছিল প্রমিত। নিচে পায়ার-ইটে-রাখা অতি ক্ষীণশিখায় জ্বলছে একটা কুপি। এখানে কেরোসিন সামর্থ্যের তুলনায় ভীষণই আক্রা। সেই আলোয় নগ্ন নারীকে দেখে চমকে উঠল প্রমিত।

—আমাকে সাঁইজি পাঠালেন। আমি তোমার প্রকৃতি। সাধন-সঙ্গী হব। রাখবে না আমাকে? আমার দিকে তাকিয়ে বলো, নাই। প্রত্যেক অঙ্গের নাম ধরে বলো, নাই। আমি উপগত হব। যার অঙ্গ ভোল নাই, তার অঙ্গ আড়াল করব আমি। আমি তোমার। দ্যাখো, এই তো দেহ। ভয় কোরো না। এ-বার দ্যাখো, বলেই মেয়েটা গায়ে একটা কালো অদ্ভুত আবরণ চাপাল এবং কঙ্কালে পরিণত হল। এই সেই বীভৎস কামনা-মূর্তি।

তীব্র ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল প্রমিত—দীপিতা! এ আমি কোথায়, বউ? আমাকে বাঁচতে দে, বরুণ! বলে হাহাকার-মথিত আবেগে শব্দ করে কেঁদে উঠল পাগল জীবানন্দ। তার কান্না কোনও বাঁধ মানছিল না। সেই অন্ধকারে তার মস্তিষ্কে নবীন এক আলোকপর্ণ কোষ জেগে ফুটে উঠছিল। দিবাকরের নামটিও তার মনে পড়ে গিয়েছিল।

মাংসল ছায়া-কঙ্কালটি নিঃশব্দে সরে যাচ্ছিল তার সম্মুখ থেকে বাইরের নিবিড়কৃষ্ণ অন্ধকারে। ●



অনুভব

জলের হাতা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন প্রতিমা। এখনও নির্মাল্যির শুক্তোপর্ব চলছে। পাতে-লেগে-থাকা ঝোলটুকু কাচিয়ে নিচ্ছেন নির্মাল্য, এক-মনে আঙুল চাটছেন।

এক-মনে, না আনমনে? এ-বার বেয়াইমশাইয়ের ধরন-ধারণ অন্যরকম, লক্ষ করছেন প্রতিমা। বড় শান্ত চুপচাপ-ধরনের হয়ে গেছেন নির্মাল্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রাক্তন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যেন এখন অতীতের মলিন ছায়া। আগের মতো গমগম হাসি নেই, হঠাৎ-রসিকতা নেই, তিনবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়, পাঁচ-দশমিনিট আগের কথা বেমালুম ভুলে যান, সাধারণ প্রশ্ন করলে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। বুড়ো বয়সে বউ মরে গেলে পুরুষমানুষের কি এই দশাই হয়?

প্রতিমা গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন—শুক্তোটা ভাল হয়েছে, বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য নড়েচড়ে উঠলেন—অতি উত্তম। আহা, যেন অমৃত।

—দেব আর-একটু?

—না, থাক। ভাল জিনিস অল্পই ভাল। বেশি খেলে ভালর স্বাদ মরে যায়।

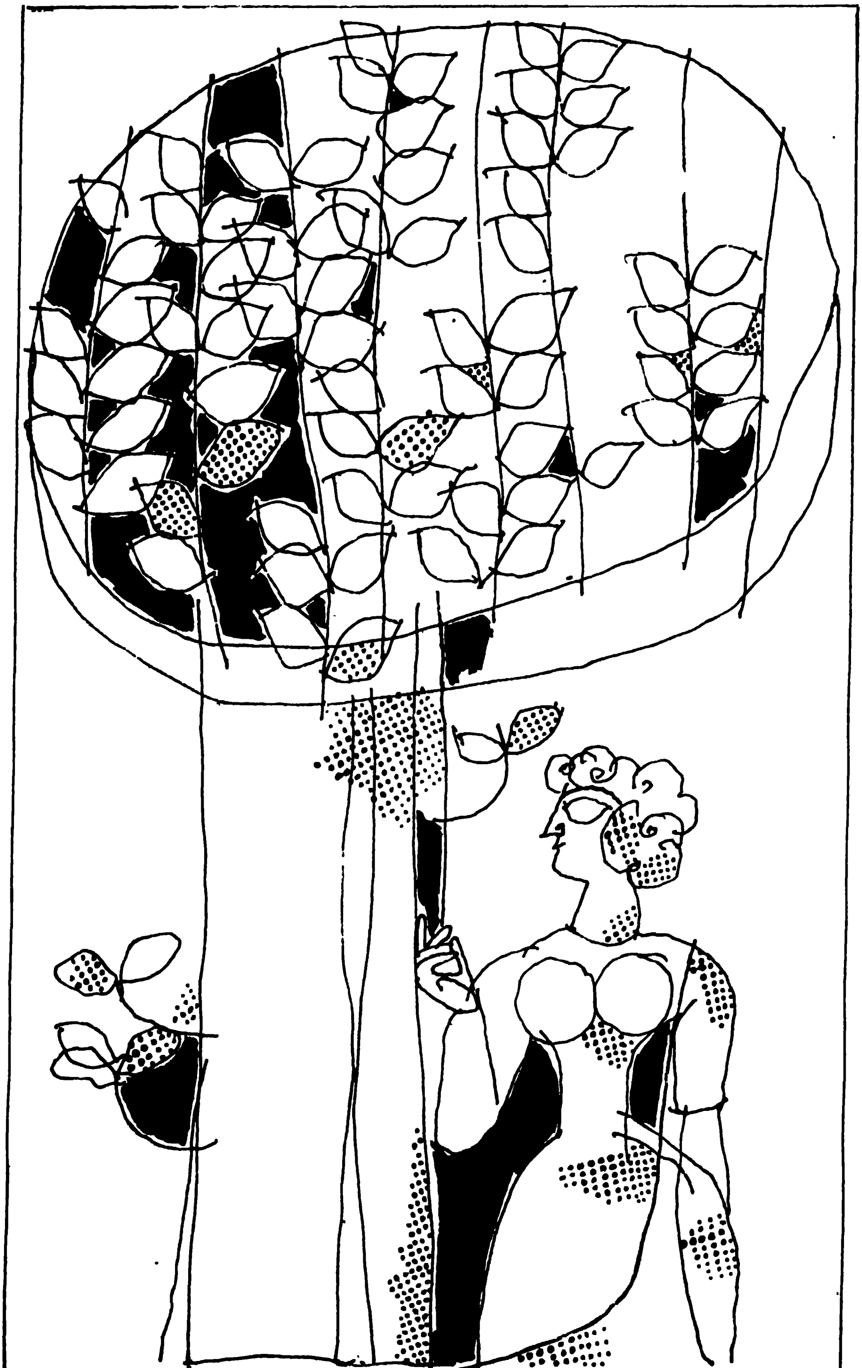
উল্টোদিকের চেয়ারে সিতাংশু ডালের প্রতীক্ষায় ভাত ভেঙে বসে। টেরচা চোখে বেয়াইকে দেখতে-দেখতে তিনি বলে উঠলেন, এত ভাল লাগল? আমার তো মনে হল, তেতো একটু-বেশি হয়ে গেছে।

—তাই কি? না না। একেবারে মাপা তেতো, মাপা নুন, মাপা মিষ্টি...

—সবই মাপা? সিতাংশু বাঁকা হাসলেন, তা হলে বোধহয় আমারই জিভের দোষ।

বটেই তো, বটেই তো। সারাটা জীবন যে-লোক বউয়ের ত্রুটি খুঁজে বেড়ান, তাঁর আর এ-ছাড়া কী-ই বা মনে হবে! সাধে কি প্রতিমা রান্নাঘরে যাওয়া ছেড়েছেন! এই, পোস্ত একেবারে আলুনি করে ফেলেছ, বাঁধাকপিতে মনখানেক চিনি ঢালার কী দরকার ছিল, নাদা-নাদা আলু দিলেই কি তরকারি ভাল হয়—এই তো সব মন্তব্যের ছিরি! কতকাল পর মাত্র কটা দিনের জন্য ছেলের শ্বশুর এসেছেন বাড়িতে, পোলাও মাংস কালিয়া কাবাব নয়, রোজ একটা কি দুটো নিরামিষ পদ স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন প্রতিমা। সামান্য নারকেল কুমড়ি কি মোচার ঘণ্ট কি শুক্তুনি, তাই সোনামুখ করে খেয়ে স্ত্রী-হারা মানুষটা এক-আধটা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছেন, অমনি টিপ্পনি শুরু হয়ে গেল।

প্রতিমা হড়াস করে স্বামীর পাতে ডাল ঢেলে দিলেন। গোমড়া মুখে বললেন—বেগুনভাজা দেব?



—প্রাণ চাইলে দেবে।

—তোমার তো আবার শতেক প্যাখনা। লম্বা ফালি চলবে না, কালো হয়ে গেলে মুখ ভ্যাটকাবে...। সিতাংশুর থালায় অবহেলাভরে ভাজা বেগুন ফেলে আবার নির্মাল্যর প্রতি মনোযোগী হলেন প্রতিমা। কানে-লেগে-থাকা ক্ষণ-পূর্বের স্তুতির রেশটুকু ফেরাতে চাইছেন। মুখ হাসি-হাসি করে বললেন—আপনার আবার বেশি-বেশি। ওই কচুঘেঁচু শুক্তোকে কেউ অমৃত বলে না।

—আমি বলি। নির্মাল্যর সরল উত্তর, আপনার বেয়ান চলে যাওয়ার পর থেকে এ-সব রান্না আর জোটে কই!

—কোথায় বেয়ানের রান্না, কোথায় আমার!

—অমন করে বলছেন কেন? আপনার বেয়ানের হাত একরকম ছিল, আপনার আর-একরকম। দুটোই ভাল, দু-রকমভাবে।

—হ্যাঁ, একজনেরটা চিনি, অন্যজনেরটা গুড়। দুটোই মিষ্টি, কী বলেন?

কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন প্রতিমা। টুকুস চিমটি কেটে সিতাংশু নির্বিকার, হ্যা হ্যা হাসছেন। সামনের মানুষটা তাঁর ব্যঙ্গে ব্যথিত না উদাস, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে এসে সিতাংশুকে ধরলেন প্রতিমা—তোমার কী আক্কেল গো? অভাগা মানুষটাকে অমন হুল ফোটাও কেন?

সিতাংশু হাই তুলতে-তুলতে দিবানিদ্রাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। অলসভাবে বললেন—খারাপ কী বলেছি? আগেও তো কতবার এ-বাড়ি এসেছেন, এমন গদ-গদ প্রশংসা তো কখনও শুনিনি। কেন, তখন বউ পাশে থাকত বলে?

—ছি ছি, কী ভাষা! বেচারার বউ মারা গেছে এখনও বছর ঘোরেনি...

—তো? তার জন্য তোমার রান্না নিয়ে আদিখ্যেতা মেনে নিতে হবে?

প্রতিমা চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠলেন—আমার রান্না নিয়ে দুটো ভাল কথা বলা মানে আদিখ্যেতা? নিজের মুখে মধু নেই বলে...

—মধুবাক্যেই গলে গেলে, গিন্নি? সিতাংশু বিছানায় গড়ালেন—শোনো, নির্মাল্য দস্তিদার মহা ধূর্ত চিজ। ওটা তোমার প্রশংসা নয়, ঘুরিয়ে নিজের ছেলের বউয়ের নিন্দে করা। আরে বাবা, সে বেটি আজকালকার মেয়ে, কেন বসে-বসে শ্বশুরের জন্য শুক্তো ঘণ্ট রান্না করতে যাবে? ওঁর নিজের মেয়ে রাঁধে? জন্মে কোনওদিন শ্বশুর-শাশুড়িকে তাঁদের পছন্দের পদ করে খাইয়েছে?

কী প্যাঁচ, কী প্যাঁচ! জিলিপির ঠাকুরদাদা অমৃতি। এমন প্যাঁচোয়া লোককে সামলে কী করে যে চল্লিশটা বছর ঘর করলেন প্রতিমা! এ-দিকে কুটকুট করে ছেলের বউয়ের নিন্দে করবেন, ও-দিকে তার সামনে একেবারে আদর্শ শ্বশুরটি! বাবুসোনা হওয়ার পর চাকরি করা নিয়ে নূপুরের সঙ্গে প্রতিমার যখন খটাখটি বেধে গেল, অমনি উনি রামমোহন বিদ্যাসাগর সেজে গেলেন। লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ঘরে বসে শুধু সংসার আর বাচ্চা সামলাবে নাকি! করবে, নিশ্চয়ই চাকরি করবে! বাবুসোনাকে দুম করে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে

ফেলল নূপুর, বেচারা প্রতিমার নাতির জন্য মন পোড়ে, একা-একা দিন কাটতেই চায় না। দোষের মধ্যে দোষ, ফস করে একদিন নূপুরকে বলে ফেলেছিলেন, একটা-মাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে বিদায় না-করে দিলে কি চলছিল না! বাপ রে, সঙ্গে-সঙ্গে কী মেজাজ! ও ছেলের মা, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে, তুমি কথা বলার কে হে!

এই বেয়াইমশায়ের কথাই ধরা যাক না। পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, দুর্গাপুরে অনেক ডাক্তারবদ্যি করেছেন, আসানসোলে গিয়ে বড় অর্থোপেডিক দেখিয়ে এসেছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, মেয়ে বাবাকে কলকাতায় এনে স্পেশালিস্ট দেখাবে—এ তো ভাল কথা। কিন্তু প্রতিমা জানলেন কখন? না, বেয়াইমশাই কলকাতায় পা দেওয়ার পর। এর জন্য একবার অভিমান প্রকাশ করতেই কর্তার কী ধমক! বলি, বাপটা কার। তোমার, না নূপুরের? তার বাপকে ডাক্তার দেখানোর আগে তোমার অনুমতি নিতে হবে! সেই লোক ঘরের কোণে বসে এখন ছেলের বউয়ের কুচ্ছো গাইছে! প্রতিমা যদি একবার মুখ ফুটে নূপুরকে কিছু রাঁধতে বলেন, অমনি তো খিঁচিয়ে উঠবেন, সারাদিন অফিসে খাটাখুটি করে মেয়েটা, আবার হেঁশেলেও ঢুকবে! লোক বটে একখানা! একজনকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যায়।

প্রতিমা মনে-মনে জুতসই জবাব তৈরি করছিলেন, আবার সিতাংশুর গলা কানে উড়ে এল—কী ধ্যান করছ বসে-বসে? বেয়াইয়ের সার্টিফিকেটটা কোথায় ঝোলাবে? ওটাকে মাদুলি করে 'পরে থেকো।...আপাতত একটু গড়িয়ে নাও। অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছ, এরপর তো আবার কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা করে তড়পাবে।

প্রতিমা ঝেঁঝে উঠলেন—হ্যাঁ, বেয়াইমশাই পাশের ঘরে, আর আমরা এখানে জোড়ে শুয়ে নিদ্রা দিই! লজ্জাশরম তো কিছু নেই! ছোঃ!

—লজ্জাশরম? আমরা দুর্গাপুর গেলে বেয়াই-বেয়ান বুঝি সারাক্ষণ আমাদের মুখের সামনে মুখ লাগিয়ে বসে থাকতেন?

—ভুলে যেয়ো না, তখন বেয়ান ছিলেন।

—তবে আর কী! যাও, বেয়াইয়ের সামনে গিয়ে তা থি য়া তা থিয়া নাচো।

—নিজে ঘুমোও না। আমাকে নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ কেন?

ড্রেসিং-টেবিল থেকে চশমা নিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাটের কোণটিতে এসে বসলেন প্রতিমা। উল্টোচ্ছেন এ-পাতা সে-পাতা, হেডিংগুলো দেখছেন। হিমালয়ের কোন-এক শৃঙ্গে উঠেছে বাংলার কয়েকটি মেয়ে। বাহ্, বাহ্। সরষের তেলের দাম আবার চড়ল। কোনও মানে হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার যুগলে আত্মহত্যা। মরণ, বেঁচেছিলি কেন অ্যাদ্দিন। বধূহত্যার দায়ে শাশুড়ি হাজতে। সব্বোনাশ, কোন প্রতিমার কপাল পুড়ল। প্রতিমা ঝুঁকলেন কাগজে, মন দিয়ে খবরটা পড়ছেন। চশমার পাওয়ারটা ঠিক নেই, ঘরের অল্প আলোয় ভালমতো ঠাহর হচ্ছে না লেখাগুলো। উঠে আলো জ্বালতে গিয়েও নিরস্ত হলেন। চোখে সামান্যতম আলো পড়লেই ঘুম ভেঙে যাবে সিতাংশুর, অনর্থ শুরু করে দেবেন।

কাগজ হাতে ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রতিমা। ফরর ফরর নাক

ডাকছে সিতাংশুর, দ্যাখ না দ্যাখ গভীর ঘুমে চলে গেছেন মানুষটা। কার্তিকের শেষ, উত্তরের জানলা দিয়ে শিরশিরে বাতাস ঢুকছে, প্রতিমা জানলার পাল্লাটা টেনে দিলেন। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ঘুরন্ত ফ্যান পুট-পুট দু-পয়েন্টে কমিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়।

পুবমুখো বারান্দায় খানদুয়েক বেতের চেয়ার, ছোট একটা টেবিল। অতনু আর নূপুরের শৌখিন বসার আয়োজন। এক ধারে সিতাংশুর ইজিচেয়ারও আছে। হেমন্তের দুপুরে এ-বারান্দা ভারি আরামের।

একটা চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে হঠাৎই নিচের কাঁচা উঠোন-মতো জায়গাটায় প্রতিমার দৃষ্টি আটকে গেল। নির্মাল্য। উবু হয়ে বসে নিরীক্ষণ করছেন কী-যেন। কখন নেমে গেলেন দোতলা থেকে?

প্রতিমা গলা ওঠালেন—ওখানে কী করছেন বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য ঘাড় তুললেন—আপনার বাগান দেখছি।

—কোথায় বাগান! সবই তো আগাছা।

—কেন, কটা ফুলের চারাও তো বেরিয়েছে।

—তাই বুঝি?

প্রতিমার মন প্রসন্ন হয়ে গেল। এ-বাড়ির কেউই তেমন গাছ-অন্ত প্রাণ নয়। একমাত্র তাঁরই যা একসময়ে অল্পস্বল্প উৎসাহ ছিল। টগর শিউলি গন্ধরাজের চারা লাগিয়েছিলেন কয়েকটা। গাছগুলোয় এখনও ফুল ফোটে, তবে আর তেমন যত্নআত্তি করা হয় না। সে-শক্তিও নেই, সে-উদ্যমও নেই। এখন শুধু ফি-বছর পুজোর পর কিছু মরসুমি ফুলের বীজ এনে ছড়িয়ে দ্যান উঠোনের ওদিকটায়। পুরনো অভ্যেসের মতো। অযত্নে অবহেলায় বেশিরভাগই সূর্যের মুখ দেখতে পায় না, দুটো-চারটে গাঁদা বেঁচে যায় ক্বচিৎ কখনও। হিলহিলে শরীর নিয়ে লিকলিক বেড়ে ওঠে, নবীন সোনালি ফুলে উঠোন আলো হয়ে যায়। বেশ লাগে দেখতে। এ-বছরও তবে ফুটবে কয়েকটা?

পায়ে-পায়ে প্রতিমা একতলায় নেমে এলেন। নির্মাল্যর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অভিভাবকের সুরে বললেন—দুপুরে না-শুয়ে এ-সব হচ্ছে?

নির্মাল্য যেন শুনতেই পেলেন না। আপনমনে বললেন—চারাগুলোর এই হাল কেন? মাটি না-তৈরি করলে হয়!

—ও-সব ঝঞ্ঝাটে কে যায়! প্রতিমা ঠোঁট ওল্টালেন, নিজে থেকে যা হয়, হোক না।

—তা বললে হয়? পৃথিবীতে নতুন প্রাণ আসছে, তাদের একটু খাতিরদারি করতে হবে না?

প্রতিমার বুকে টুং করে বাজল কথাটা। অচেনা পাখির ডাকের মতো। কোমল দুপুরটার মতো। হাসলেন—কী করতে হবে শুনি?

—খুরপিটুরপি কিছু-একটা দিন। মাটি ঝুরো করি, আগাছা সাফ করি...

—খুরপি কোথায় পাব?

—নেই? তা হলে একটা লোহার শিক-গোছের কিছু...

সেকেন্ডের জন্য প্রতিমা ভাবলেন, আছে কি? হুঁউ, আছে তো। বাথরুমে। চৌবাচ্চার মুখ চেপে আটকানোর জন্য। আনতে গিয়ে খুঁজে পেলেন না। বাসন্তীর মা কোথায় যে রেখেছে!

রান্নাঘর হাতড়ে শেষে স্টিলের খুন্তিটা নিয়ে এলেন প্রতিমা। সঙ্গে একখানা কাটারিও। গভীর মনোযোগে মাটি-খোঁড়ায় নেমে পড়েছেন নির্মাল্য। দেখতে-দেখতে বেশ-খানিকটা মাটি গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রতিমাও কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন, হাতে ঘষে-ঘষে ঝুরো করছেন মাটি। সেই মাটি ফুলগাছের গোড়ায় চেপে-চেপে দিচ্ছেন নির্মাল্য, কাটারি দিয়ে ছেঁটে-ছেঁটে দিচ্ছেন আগাছা।

কাজ করতে-করতে কথা চলছে দু-জনের। গাছের কথা। ফুলের কথা। এলোমেলো কথা।

নির্মাল্য—এ তো বেশ ভাল জাতের গাঁদা। ফুল প্রায় টেনিস বলের সাইজে হবে।

প্রতিমা—কই হয়! আমি তো এইটুকু-টুকুই দেখি।

নির্মাল্য—ফুলের জন্য খাটতে হবে। সার দিতে হবে, জল দিতে হবে। জানেন তো, গাছ কক্ষনো বিট্রে করে না। আপনি গাছের কথা ভাবুন, গাছও আপনার কথা ভাববে।

প্রতিমা—ছিলেন তো ইঞ্জিনিয়ার, গাছগাছালির খবর এত জানলেন কী করে? নেশাটা কি নতুন?

নির্মাল্য—নেশা বলছেন? গাছ কত ভাল সঙ্গী জানেন?

প্রতিমা—তা বটে। যা ইচ্ছে কথা শোনাতে পারেন, জবাবটি দেবে না।

নির্মাল্য কাটারি চালানো থামিয়ে বিচিত্র চোখে তাকালেন প্রতিমার দিকে। চশমার আড়ালে মণিদুটো যেন ঝিক-ঝিক করে উঠল। হাসি, অথচ যেন হাসি নয়। অন্যমনস্ক স্বরে বললেন—নীরব থেকেও তো অনেক কথা বলা যায়। আপনার বেয়ানকে তো চিনতেন, দিনে-রাতে কটা কথা বলত সে?...আমি তো একাই বকে মরতুম।

কাছেই ট্রেন-লাইন। ঝম-ঝম শব্দ বাজিয়ে একটা ট্রেন শহর থেকে শহরতলির দিকে চলে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। শীতের হাওয়ার মতো।

প্রতিমা অস্ফুটে বললেন—বেয়ান বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অসময়ে।

—মৃত্যুর কি সময়-অসময় আছে? নির্মাল্য ছোট্ট শ্বাস ফেললেন—পৃথিবীতে তার কাল ফুরিয়েছিল, সো শি হ্যাড টু ডিপার্ট। আফসোস শুধু একটাই। চিকিৎসা করানোর সুযোগ দিল না। টিভি দেখতে-দেখতে একটা উঃ শব্দ করল, ব্যস, দি এন্ড। সেরিব্রাল হয়েও তো কতজন বেঁচে যায়। যায় না, বলুন?

প্রতিমা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কথার মোড় ফেরাতে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—এহে, আপনার সর্বাঙ্গ যে একেবারে মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেল!

নির্মাল্য কাটারি রেখে উঠে দাঁড়ালেন। হাত ঝাড়ছেন, পাঞ্জাবি ঝাড়ছেন, হাতের পিঠ দিয়ে কপাল মুছছেন। বাড়ির এ-দিকটা থেকে অনেকক্ষণ রোদ সরে গেছে, তবু ঘেমেছেন বেশ। শেষ-কার্তিকের দুপুরেও।

মানুষটাকে দেখে প্রতিমার ভারি মায়া জাগছিল। কেমন আলাভোলা-ধরনের হয়ে

গেছেন, আত্মমগ্ন। আঁচলে আলগা হাত মুছে নিয়ে নির্মাল্যর পাঞ্জাবির পিঠ ঝেড়ে দিলেন প্রতিমা।

তখনই দোতলায় চোখ চলে গেল।

সিতাংশু।

চারটের সময় চা না-দিলে সিতাংশুর দিবানিদ্রা ভাঙে না, আজ উঠে পড়েছেন যে বড়!

সন্ধে নামার মুখে-মুখে ফিটফাট বাবুটি সেজে সিতাংশু তৈরি। ঘর থেকেই হাঁক দিলেন—বেয়াইমশাই, রেডি তো?

নির্মাল্য দোতলার বারান্দায়, সিতাংশুর ইজিচেয়ারে। বসে-বসেই সাড়া দিলেন—আজ আর বেরোব না ভাবছি।

—সে কী! ক্লাবে যাবেন না?

—ইচ্ছে করছে না।

—আরে, চলুন চলুন, চব্বিশ ডিল খেলেই ফিরে আসব। সিতাংশু ছড়ি-হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—সুরেন পরিমলদের সঙ্গে তো আপনার ভাল ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। দেখবেন, গল্প শুরু করতে-না-করতেই সন্ধে কাবার।

—আজ ছেড়ে দিন, বেয়াইমশাই। কাল ডাক্তারের কাছে যাব, আজ একটু রেস্ট নিই।

প্রতিমা ঘরে সন্ধে দিচ্ছিলেন। ঠাকুরের সামনে ধূপ দোলাতে-দোলাতে গলা ওঠালেন—ওঁর যখন ইচ্ছে করছে না, জোর করছ কেন? তুমি তাসুড়ে মানুষ, তুমি ঘুরে এসো।

মুখে বিদঘুটে-এক ধ্বনি তুলে ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে বেরিয়ে গেলেন সিতাংশু।

এ-অঞ্চলে মশা খুব। গোটা জায়গাটা এক সময়ে জলাভূমি ছিল। এখন অবশ্য অগুন্তি বাড়ি হয়ে গেছে। তবু জলাভূমির স্মৃতি ভুলতে দ্যায় না মশারা, সন্ধে হলেই হানা দেয় ঝাঁকে-ঝাঁকে।

দোতলার ঘরগুলোতে মসকিউটো রিপেলেন্ট জ্বালিয়ে জানলা-দরজা সব ভেজিয়ে দিলেন প্রতিমা। বারান্দায় এসে বাতি জ্বেলে দিলেন—এক-কাপ চা খাবেন নাকি, বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর উত্তর নেই। সামনের তরল আঁধারে দৃষ্টি হারিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্রতিমা সিঁড়ির দিকে এগোলেন। বাসন্তীর মা বিকেলের রান্না করতে এসে গেছে, দু-কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন তাকে। ফিরে চেয়ারে বসেছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—শরীরটা কি খারাপ লাগছে, বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর মৃদু স্বর শোনা গেল—নাহ্, ঠিকই আছি।

—পিঠের ব্যথাটা আবার হচ্ছে না তো?

—সামান্য। বলার মতো কিছু নয়।

প্রতিমা অনুযোগের সুরে বললেন—মিছিমিছি তখন মাটি কোপাতে গেলেন, অমন ঝুঁকে-

ঝুঁকে কাজ করা আপনার একদম উচিত নয়।

—দুর, ও-জন্য কিছু হয়নি। বরং গাছের পরিচর্যা করলেই আমি বেশ থাকি। নির্মাল্যর দুই হাত ইজিচেয়ারের দুই হাতলে—আমার যন্ত্রণাটার মূল অনেক গভীরে। প্ল্যান্টে কাজ করার সময়ে একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। বছর-পঁচিশ আগে। লোহার সিঁড়ির সাত-আট ধাপ ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।

—ও মা, কী সব্বোনেশে কথা! আগে শুনিনি তো?

—না, চোট তখন তেমন লাগেনি কিছু। হাড়গোড়ও ভাঙেনি, রক্তপাতও হয়নি...তবে তারপর থেকে ঠায় বসে থাকলেই... রিটায়ারমেন্টের পর থেকে তো হাঁটা-চলা কমেই গেছে। বসেই থাকি। আর সেই সুযোগ বুঝেই ব্যথা আবার চড়াও হয়েছে।

—বসে থেকেই যখন ব্যায়রাম, বসে রইলেন কেন? ওঁর সঙ্গে হেঁটে এলেই পারতেন।

—তাস-পাশা আমার ভাল লাগে না, বেয়ান। জম্মে কখনও খেলিনি তো। স্পেড হার্ট নো ট্রাম্প শুনলে কেমন চমকে-চমকে উঠি। নিজেকে বেশ ইডিয়টিক লাগে। তবে, হ্যাঁ, বেয়াইমশায়ের বন্ধুরা সজ্জন ব্যক্তি, গল্পগুজব করাই যায়। কিন্তু মুশকিল হল, ওঁদের টপিক একটাই। পলিটিক্স। মিস্ত্রি-মজুর-খাটানো মানুষ তো, ভোঁতাবুদ্ধি। ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধির শাস্ত্রটি আমার পছন্দ হয় না।

শেষ বাক্যটির মর্মার্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না প্রতিমা। অপাঙ্গে দেখলেন, বেয়াইমশাই একটু-যেন কাত হয়ে গেছেন, মুখ চোখ কুঁচকোনো। ব্যথাটা যত কম বলছেন, তত লঘু নয় বোধহয়।

নরম স্বরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলেন—পিঠের ঠিক কোনখানে হচ্ছে ব্যথাটা?

—শিরদাঁড়ার ডানদিকে। বেয়ে-বেয়ে কাঁধ-অব্দি চিত্তির, একেবারে বিছানায় আছড়ে ফেলে দেবে।

—আগে কি এতটা বাড়াবাড়ি ছিল?

—ছিল না। আবার ছিলও। আপনার বেয়ান গরম তেলে কী-সব মিশিয়ে মালিশ করে দিত, বাড়তে পারত না।

—কী মালিশ। নূপুর জানে?

—নাহ্। ও-সব ছিল আপনার বেয়ানের নিজস্ব তুকতাক।

—আমার একটা বেদনার মলম আছে। মালিশ করতে হয় না, আলগা বোলালেই কাজ হয়। দেব?

হ্যাঁ না কিছুই শোনা গেল না। চরাচরে এখন গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। মিহি কুয়াশার চারপাশের বাড়ির আলো কেমন অস্পষ্ট দেখায়। প্রবল প্রতিযোগী দুই রিকশা তীক্ষ্ণ হর্ন বাজাতে-বাজাতে সামনে দিয়ে ছুটে গেল। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। এলোমেলো, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

বাসন্তীর মা চা রেখে গেছে। ভাল করে আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কাপে চুমুক দিলেন প্রতিমা। আলগা বললেন—এ-বছর শীতটা ভালই পড়বে মনে হয়। সবে নভেম্বরের দশ

তারিখ, এখনই বাতাস কী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

নির্মাল্য বললেন—হুঁ।

—আপনাদের ও-দিকে তো অনেক বেশি শীত পড়ে।

—হ্যাঁ, ডিসেম্বরে বেশ টেম্পারেচার নেমে যায়। কথাটা বলেই নির্মাল্য একটুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন—আপনার বেয়ান বড্ড শীতকাতুরে ছিল। দুটো মাস তো একেবারে জবুথবু হয়ে থাকত। প্রতি বছরই বলত, এ-শীতটা আর কাটবে না। গতবছর কথাটা ফলে গেল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, সেরিব্রালের সঙ্গে শীতের কী সম্পর্ক! হয়তো নির্মাল্য বলবেন, মৃত্যুভয়ই সেরিব্রাল টেনে এনেছে। কোনও কথা বলাই এখন বিপদ। নির্মাল্যর সব কথাই এখন ঘুরে-ফিরে স্ত্রীতে চলে যায়।

কথা ঘোরানোর জন্য প্রতিমা বলে উঠলেন—তা, আপনি এখন একটা পাতলা পাঞ্জাবি পরে আছেন কেন? গায়ে একটা চাদর-আলোয়ান কিছু জড়ান।

—কিছু লাগবে না। ঠাণ্ডা আমার বেশ লাগে।

—লাগুক। তবু একটা-কিছু গায়ে দিন। হিম পড়ছে। এ-সময়টাই অসুখবিসুখ হয় বেশি।

ইজিচেয়ার আবার নীরব।

প্রতিমা চা শেষ করে উঠে পড়লেন। নির্মাল্যর ঘরে গিয়ে চাদর আনতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল, এসেছেন নিজেদের ঘরে। সিতাংশুর তুষের চাদরখানা হাতে নিয়ে এক-সেকেন্ড ভাবলেন কী-যেন। তারপর ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজ থেকে মলমটাও নিয়ে ফিরে এলেন বারান্দায়।

টিউব আরামকেদারার হাতলে রেখে বললেন—লাগিয়ে নিন। চাদরটা তারপর জড়িয়ে নেবেন গায়ে।

কথা শেষ হতে-না-হতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ছড়ি হাতে আবির্ভূত হলেন সিতাংশু।

প্রতিমা অবাক হয়ে বললেন—এর মধ্যে তোমার চব্বিশ ডিল হয়ে গেল?

—ধুস, কেউ আসেনি। ছড়ি টেবিলে শুইয়ে চেয়ারে বসলেন সিতাংশু—একা-একা কতক্ষণ মাছি মারব?

—আশ্চর্য। তোমার তাস-বন্ধুরা ডুব মেরেছে! সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছিল গো?

সিতাংশু দুম করে চটে গেলেন—কেন, তারা কি একদিন বাড়িতে রেস্ট নিতে পারে না?

—তুমি না বলো, তাস খেলাই তোমাদের বিশ্রাম? প্রতিমা খোঁচালেন।

সিতাংশু গুম হয়ে গেলেন।

মুখ খুললেন সেই রাতে। শোওয়ার সময়ে। মশারি গুঁজতে-গুঁজতে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন—টিউব শেষ?

প্রতিমা গ্লাস উঁচু করে জল খাচ্ছিলেন। হালকা বিষম খেলেন—কীসের টিউব?

—ন্যাকা সেজো না। আমার কি চোখ নেই? গোটা মলমটাই কি বেয়াইয়ের পিঠে ঘষা হয়ে গেল?

—গোটা মলম কোথায়? একটুখানি তো পড়ে ছিল।

—বললেই হল? পুজোর পর ওটা কেনা হয়েছে। পাক্কা দু-মাস চলে, আমার হিসেব আছে।

—কী ছোট মন গো তোমার!

—হ্যাঁহ্, আমারই তো ছোট মন। ন্যাজাল ড্রপের শিশি খুলে নাসিকাগহ্বরে ফোঁটা-ফোঁটা তরল ঢালছেন সিতাংশু। জোরে নাক টানলেন কয়েকবার। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটাও বিকৃত হয়ে গেল—নিজের মন তো খুব বড়। আমি মানুষটা ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে গেলাম, তাকে একটা শাল-কম্ফর্টার দেওয়ার কথা মনে পড়ল না, আর তিনি আমারই ইজিচেয়ারে শুয়ে আমার চাদরে ওম নিচ্ছেন। দুর্ভাগা অভাগা হওয়ায় ভারি মজা, অ্যাঁ?

রাগে ঘেন্নায় প্রতিমার সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। এক-পা ঘাটে বাড়িয়ে বসে আছেন, এখনও কুচুটেপনা, হিংসুটেপনা গেল না। বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল প্রতিমার, এখনও তাঁকে সন্দেহ করা। ছি ছি ছি ছি।

বিছানায় এসে বেড-সুইচ নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন প্রতিমা। অন্ধকারে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। এই জন্যই দুপুরে বারান্দা থেকে উঁকি মারছিল? তাসের আসর থেকে ফিরে এসেছে? টিকিটিকিপনা?

প্রাণ থাকতে এই মানুষটার সঙ্গে আর কথা বলবেন না প্রতিমা।

পরদিন রাত আটটা-নাগাদ ডাক্তার দেখিয়ে ফিরলেন নির্মাল্য। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে। মেয়ের ডাক্তারও তেমন-কিছু আশার কথা শোনায়নি। কটা ব্যথার ওষুধ লিখে দিয়েছে, সঙ্গে ফিজিওথেরাপির নির্দেশ। আর টেস্ট দিয়েছে এককাঁড়ি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবেরই একবার পরীক্ষা চায় ডাক্তার। সমস্ত করেটরে আবার মাসখানেক পর হাজির হতে হবে তাঁর চেম্বারে, তখন তিনি উপযুক্ত বিধান দেবেন।

বাড়ি এসে নির্মাল্য খানিকক্ষণ মনমরা হয়ে বসে রইলেন।

নূপুর অতনু নানা রঙ্গ-রসিকতা জুড়ে তাঁকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করছে, তা-ও তাঁর মুখে হাসি নেই। অবশেষে ম্লান-মুখে ঘোষণা করলেন, কালই ভোরে তিনি দুর্গাপুর ফিরতে চান। বাড়ির জন্য তাঁর মন কেমন করছে।

প্রতিমা ভেতর থেকে সিঁটিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সংশয় উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কাল রাতে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ কি কানে গেছে নির্মাল্যর? যেতেই পারে। বেআক্কেলে লোকটার তো মাত্রাজ্ঞান নেই, সব কথাই উঁচু পরদায় বলতে ভালবাসে। নাকি সিতাংশুর ব্যবহারে আহত হয়েছেন নির্মাল্য? এ-ও সম্ভব। সিতাংশুর যা চ্যাটাং-চ্যাটাং কথার বহর। কিংবা নির্মাল্য নজর করেছেন সিতাংশু প্রতিমার বাক্য-বিনিময় বন্ধ হয়ে গেছে? বেয়াইমশাই নিজেকে যতই ভোঁতা-মস্তিষ্ক বলুন, তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর। আলাভোলা হতে পারেন, শিশু তো নন। কুটুমের কাছে মান-সম্মান কিছু রইল না। কী লজ্জা, কী লজ্জা।

অনেক রাত-অবধি প্রতিমা দু-চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পাশের মানুষটা দিব্যি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, নাক ডাকছে ফরর-ফুস। প্রতিমার হাত নিষপিষ করছে। ধাক্কা দিয়ে

জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে সিতাংশুকে। এক্ষুনি ও-ঘরে গিয়ে বেয়াইমশায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুক।

কিন্তু কিছুই পারলেন না প্রতিমা। শেষ ট্রেনের ভোঁ চোখে নিদালি বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কাকভোরে ছোটখাটো হইচই শুরু হয়ে গেল বাড়িতে। উঠে পড়েছেন প্রতিমা, জেগে উঠেছেন সীতাংশু, তৈরি হয়ে নিচ্ছে নূপুর। চা হচ্ছে, মালপত্র গোছগাছ চলছে। বাথরুমের দরজা খোলা-বন্ধ হচ্ছে ঘনঘন। অতনু ট্যাক্সি ডেকে আনল। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে স্টেশন রওনা হলেন নির্মাল্য।

প্রতিমা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আলো ফুটে গেছে বেশ, ঘন কুয়াশার পরদা সরিয়ে ধীরে-ধীরে উঁকি দিচ্ছে পৃথিবী। কাগজওলার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শোনা যায় মাঝে-মাঝে। বিকট শব্দ করে মোড়ের বুথে দুধের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

সহসা ভীষণ জোর নাড়া খেয়ে গেলেন প্রতিমা। নিচের উঠোনে সিতাংশু। মগে করে জল দিচ্ছেন ফুলগাছের চারায়। গাছের গোড়াগুলো খোঁচাচ্ছেন কাঠি দিয়ে, আবার চেপে-চেপে দিচ্ছেন মাটি।

প্রতিমা ফিক করে হেসে ফেললেন। ঈর্ষার উত্তাপই বুঝি বেঁচে থাকাটা আজও রঙিন করে দ্যায়। পাগল, লোকটা একেবারে পাগল! ●